উদ্ধব-সন্দেশ

ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী

উদ্ধব-সন্দেশ

শ্রীরাধিকার ভাব যৈছে উদ্ধব দর্শনে।
এইমত প্রলাপ চেষ্টা প্রভুর রাত্রি দিনে॥

চৈতন্যচরিতামৃত

মহানামব্রত ব্রহ্মচারী

উৎসর্গ

প্রেমিক রসিক কবি দ্বিজেন্দ্রলালের আত্মজ
ঋষিবর্য্য শ্রীঅরবিন্দের মানসজ
গোপীমাধুর্য্যাবগাহী
ভাগবতী-কথার ডুবুরী
মীরারূপী ইন্দিরার দিশারী
সত্য-সন্ধ সুহৃদ্বর
স্বনামধন্য শ্রীদিলীপ কুমার রায়
করকমলে প্রীতি-উপহার ।

গুণমুগ্ধ—স্নেহলুব্ধ

মহানামব্রত ব্রহ্মচারী

ভূমিকা

জয় গুরু

ভগবানের কথা সন্দেশ রসগোল্লা অপেক্ষাও মিষ্টি—সরস। আবার ভক্তমুখে যদি তাহা শ্রবণ করার সৌভাগ্য লাভ হয় তবে আরও মধুর লাগে। ভক্তমুখে ভগবানের সন্দেশ রসকদম্ব-তুল্য, কিম্বা বলা যায় অনির্বচনীয়—মূকাস্বাদনবৎ।

ভাগবতে উদ্ধব-সন্দেশ পড়িয়াছি, কিন্তু তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি নাই। না বুঝাইলে, বুঝিবই বা কেমন করিয়া? এতদিন পর স্বয়ং ভগবানের কৃপাশক্তিই ভক্তের মাধ্যমে "উদ্ধব-সন্দেশের" তাৎপর্য্য বিশ্লেষণ করিলেন সহজ-সরল ভাষায়। অভিনব উদ্ধব-সন্দেশের আরম্ভ অভিনব। বুঝিলাম, বৃন্দাবনের চিরকিশোর নবীন মদনমোহনের কৃপা হইয়াছে ভক্তের উপর। মরমের কথা, মরমী ভক্ত পাইয়া প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছেন ভগবান্। কৃপাধন্য পরমভাগবত মহানামব্রত ব্রহ্মচারী লেখনী-মুখে গোপনীয় সেই রহস্য-কথাই ব্যক্ত করিয়া ফেলিয়াছেন জগৎসমক্ষে। উদ্ধবকে বৃন্দাবনে প্রেরণ করিয়া শুধু তাঁহাকেই লাভবান করেন নাই ভগবান্, আজ বুঝিতেছি এ লাভ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের, মথুরাবাসীর, শ্রীশুকমুনির, সঙ্গে সঙ্গে জগজ্জীব আমাদেরও। সাধারণের পক্ষে উদ্ধব-সন্দেশকে আরও সহজ-বোধ্য, সহজপ্রাপ্য করিয়া তুলিয়াছেন ব্রহ্মচারী মহোদয়।

ব্রজধাম অপ্রাকৃত মাধুর্য্যের ভূমি। মথুরা হইতে, ঐশ্বর্য্যের ভূমি হইতে এই ধামের মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম হয় না। ব্রজের গোপগোপীর প্রেমভক্তির নিকট শ্রীকৃষ্ণের অভিন্নকলেবর জ্ঞানে গুণে সমৃদ্ধ উদ্ধবের অনেক শিক্ষার বস্তু আছে। তাঁহাকে বৃন্দাবনে প্রেরণ করিয়া একসঙ্গে ভক্ত ও ভগবানের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইল। ভক্তই শুধু ভগবানকে চাহেন না—স্বয়ং ভগবানেরও একটা প্রাণের সাধ বা আকাঙ্ক্ষা আছে! ভগবানের জন্য ভক্ত ব্যাকুল, তদপেক্ষাও ব্যাকুল ভগবান্ স্বয়ং ভক্তের জন্য।

ভক্তগণের মস্তকে ভক্তিদেবীর পদরেণু নিপতিত না হইলে ভক্তগণও ধন্য হন না। জ্ঞানী উদ্ধবের পরজন্মে শ্রীবৃন্দাবনের পথিপার্শ্বে গুল্মলতা হইয়া জন্মিবার সাধই ভাগবতের অভিনব বার্ত্তা। জ্ঞানী, ভক্তের পদধূলি সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া হইতে চায় ধন্য। পরমপুরুষার্থের ইহাই অভিনব তাৎপর্য্য। ভাগবত রচনা না করা পর্য্যন্ত বেদান্তদর্শনপ্রণেতা ব্যাসদেবেরও অন্তরের অভাব মিটে নাই। স্বয়ং ভগবানের পর্য্যন্ত দেখি এই পরম ব্যাকুলতা। ভক্তের অন্বেষণে ভগবানের হয় অবতরণ, আর ভগবানের অন্বেষণে হয় ভক্তের ব্রজলোকে উন্নয়ন। অপ্রাকৃত মহামিলনভূমি এই ব্রজধাম। বিস্মৃতিতেই দুঃখ, স্মরণেই আনন্দ। উদ্ধব-সন্দেশে এই স্মরণ-লীলাই প্রমূর্ত্ত। বৃন্দাবন ছাড়িয়া আসিতেছেন বটে কিন্তু প্রাণপ্রিয়তম ভক্তের মুখগুলি কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছেন না শ্রীকৃষ্ণ। মথুরাবাসীর বৃন্দাবন-চিন্তা, বৃন্দাবনবাসীর মথুরাচিন্তা—ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যভাবের চলিয়াছে এই যুগল মিলন। বৃন্দাবন-প্রত্যাগত উদ্ধবের

মুখে গোপ-গোপীর ব্যাকুলতার কথা, উৎকণ্ঠার কথা শুনিয়া স্বপ্নের বৃন্দাবন বাস্তব বৃন্দাবনরূপে চোখের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিল। স্বপ্ন জাগ্রতের হইল ভেদ বিমোচন। বিরহের তীব্র জ্বালার ভিতর দিয়া ফুটিয়া উঠিল মিলনের স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না।

জ্ঞানের অভিমান লইয়া বৃন্দাবনে যাওয়া চলে না। সেখানে মুনি ঋষি, জ্ঞানী গুণীরও পরিবর্ত্তন করিতে হয় বেশ-ভূষার। আনুগত্যের সাধনাই একমাত্র সাধনা সেখানে। গোপীর অনুগত না হইয়া, স্বাধীনভাবে অপ্রাকৃত ব্রজধামের মাহাত্ম্য কেহই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে না—ইহাই ব্রজধামের প্রবেশ পথে সতর্ক-বাণী। আনুগত্যের সাধনায় চক্ষু উন্মীলিত হইল উদ্ধবের, লাভ করিলেন দিব্য দৃষ্টি—তবে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন বৃন্দাবনের নিত্যসিদ্ধ গোপ-গোপীর মাহাত্ম্য। হৃদয়ঙ্গমের পর পদরজে গড়াগড়ি দেওয়ার সাধই অবশিষ্ট থাকে। মহা-ভাবের রাজ্য শ্রীবৃন্দাবনে। দশমাস ব্রজে বাস করিয়া মহাভাবময়ী গোপীদের অবস্থা স্বচক্ষে দর্শন করিয়া নিজের জ্ঞানকে কেবলই ধিক্কার দিতে লাগিলেন উদ্ধব। ভক্তির রাজ্যে জ্ঞানের সকল গর্ব্বই এইভাবে চূর্ণ হইয়া যায়। উদ্ধব রূপবান্ ছিলেনই, ভক্তির রাজ্য হইতে ফিরিয়া আসায় তাঁহার রূপ হইল আরও অপরূপ। জ্ঞানের রাজ্য হইতে তাঁহাকে ভক্তির রাজ্যে প্রেরণ —ইহাই নিগূঢ় উদ্দেশ্য।

পরমভাগবত গ্রন্থকার শ্রীগুরু স্মরণ করিয়া ভূমিকা লিখিতে অনুরোধ করিয়াছেন, আমায়। গুরুধ্যান করিয়া লিখিতে বসিয়া দেখিলাম, গুরুর মধ্যে উক্ত ভগবানের অপূর্ব মিলন।

ভগবানকে পাইবার পথ স্বয়ং ভগবান্ আচার্য্য মূর্ত্তিতে প্রদর্শন করিলেন। পরমগুরু পরমেশ্বরই ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া শ্রীগুরুরূপে ধরা দিয়াছেন। ভক্তমহাজনশিরোমণি শ্রীগুরু। ভক্তির পথে, ভক্তের পথেই ভগবান্ লাভ হয়।

উদ্ধব-সন্দেশের ভূমিকা লিখিবার সামর্থ্য আমার নাই। পরম ভাগবতের অনুরোধ অমান্য করিলে অপরাধী হইব ভাবিয়া দুই চারিটি কথা নিবেদন করিলাম। উদ্ধব-সন্দেশ নিজেই নিজের পরিচয় প্রদানে সুদক্ষ। ভূমিকার কোনই প্রয়োজন ছিল না বা নাই। মূল গ্রন্থে সকল রহস্যের অপূর্ব—অনবদ্য বিশ্লেষণ রহিয়াছে। পাঠকমণ্ডলীকে ভূমিকা পাঠে কাল হরণ না করিয়া মূল গ্রন্থে প্রবেশ করানোতেই আমার সবিশেষ আগ্রহ। ভাগবতের প্রতিপদে রহিয়াছে যেমন রসের আস্বাদন, তেমনি তাৎপর্য্যবিশ্লেষণের প্রতিপদেও রহিয়াছে আস্বাদনচমৎকারিতা। ভাগবতের সার বা সর এই উদ্ধব-সন্দেশ। অভিনব বিশ্লেষণ ক্ষমতা লেখকের, এমন প্রাঞ্জলভাষাও বড় দেখা যায় না। ভাগবতরস পরিবেশকের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করিলে ত্রুটি থাকিয়া যাইবে। শ্রীগুরু-ভগবচ্চরণে পরিবেশকের অকুণ্ঠ প্রকাশশক্তি কামনা করিয়া উদ্ধব-সন্দেশের মত আরও সন্দেশের আশায় উদ্গ্রীব রহিলাম।

দক্ষিণ বাংলা
সারস্বত আশ্রম

শ্রীগুরুচরণাশ্রিত
স্বামী সত্যানন্দ

আমাদের কথা

ডক্টর মহানামব্রত ব্রহ্মচারিজী মহারাজের "উদ্ধব-সন্দেশ" নামক গ্রন্থটি অতুলনীয় গোপীপ্রেমের নয়নাভিরাম উজ্জ্বল লিপি-চিত্র। ভাববস্তু অপরোক্ষ অনুভূতির দ্বারাই মানসনয়নে ফুটিয়া উঠে। এই অনুভূতি সাধন-সাপেক্ষ—সাধনার সিদ্ধিতেই ভগবদ্‌ভাবের—সাধ্যবস্তুর স্বরূপ দর্শন হয়।

গ্রন্থপাঠে প্রেমিক ভক্ত ও মরমী পাঠক দেখিতে পাইবেন, "উদ্ধব-সন্দেশ" পরম শ্রদ্ধাস্পদ গ্রন্থকারের সাধনার ধন—সিদ্ধির অপূর্ব ফল। তাই গ্রন্থের এই অপূর্বতা—যাহা বলিয়া কহিয়া বুঝান যায় না। আস্বাদ্য বস্তু, বক্তব্য নহে। গ্রন্থাস্বাদনে আস্বাদক "স্বাদু স্বাদু পদে পদে" বাক্যের সত্যতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া তৃপ্ত হইবেন—বিস্মিত হইবেন।

শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন ছাড়িয়া আসিয়াছেন অনেকদিন। শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন ছাড়ার পর হইতে ব্রজগোপিকাগণের প্রতিটি ক্ষণ যুগযুগান্তের দীর্ঘতা লইয়া দুর্ব্বিসহ বিরহবেদনায় তাঁহাদিগকে আপনহারা পাগলিনীপারা করিয়া তুলিয়াছে। বাঁচিয়াও যেন তাঁহারা বাঁচিয়া নাই—জীবন্মৃত তাঁহাদের অবস্থা।

এই বিরহ-ব্যথা কি কেবল গোপীরাই ভোগ করিতেছেন? না, তাহা নহে, শ্রীকৃষ্ণেরও গোপীদের সহিত মিলনাকাঙ্ক্ষায় হৃদয় উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে—বিরহবেদনা অসহনীয় হইয়া তাঁহাকেও পাগল করিয়াছে—তাই না ভক্ত-শ্রেষ্ঠ উদ্ধবকে

ব্রজে না পাঠাইয়া তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। ষড়ৈশ্বর্য্যশালী ভগবানের মানুষী-লীলার এই অপূর্ব্ব মাধুর্য্যই, উদ্ধব-সন্দেশের মর্ম কথা।

দয়িতার বিরহব্যাকুল হৃদয়ের সাক্ষাৎ পরিচয়ের সুযোগ না ঘটিলে আপনজনের মাধ্যমে সে অবস্থার খবর পাইলেও কিয়ৎপরিমাণে সান্ত্বনা লাভ করা যায়। অতএব, গোপীপ্রেমে পাগলপারা হইয়া তাঁহাদের আসল অবস্থাটি কী তাহা জানিবার জন্যই যে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে ব্রজে পাঠাইয়াছিলেন, মাত্র এই কথাটি বুঝিলেই শ্রীকৃষ্ণ গোপীকাগণের প্রেম-সম্বন্ধ উপলব্ধি করা সম্ভব হইবে না। প্রধান কারণ ইহা হইলেও কারণান্তরও এখানে রহিয়াছে। তাহা হইল, গোপীপ্রেমের পরাকাষ্ঠা উদ্ধবকে প্রদর্শন করান। ভক্তশ্রেষ্ঠ উদ্ধবই তাহা অনুভব করার যোগ্য পাত্র। এই যোগ্যতাই তাঁহাকে ব্রজধামে ব্রজসুন্দরীগণের সমীপে উপস্থিত করিয়াছে। দর্শন ও অনুভবকর্ত্তার দর্শনে অনুভবে যে ভাবান্তর হইয়া থাকে,—তাহাই অন্যকে শিক্ষাদানের শ্রেষ্ঠ উপায়।

সেই উপায়রূপে জগদ্‌বাসীকে গোপীপ্রেমের শিক্ষা দিবার অপূর্ব্ব মাধ্যমই হইলেন ভক্তশ্রেষ্ঠ উদ্ধব মহাশয়।

দিনমণি অস্তগমনোন্মুখ—প্রকৃতি দেবী দিনমানের কর্ম মুখরতা ত্যাগ করিয়া বিশ্রান্তির শান্ত পরিবেশ ধারণ করিতে চলিয়াছেন। ক্রমে সন্ধ্যা ধীরে ধীরে ব্রজভূমির দিগ্‌দেশ ছাইয়া ফেলিতে আরম্ভ করিয়াছে,—এমনি সমাগত—সন্ধ্যার অন্ধকার ও মধুময় শান্তপরিবেশে উদ্ধব ব্রজধামে পৌঁছিলেন—পৌঁছিলেন

গোপীপদরেণুপূত তীর্থভূমিতে। পৌছিয়াই প্রথম সাক্ষাৎ নন্দরাজের সহিত। দীর্ঘ অদর্শনের পর প্রাণপ্রিয় পুত্রের সম্বন্ধে নন্দরাজের কথিত অকথিক কত প্রশ্ন—সে প্রশ্নের কি আর শেষ আছে? উদ্ধব যাহা শুনিলেন তাহা বুঝিলেন,—যাহা অনুক্ত—শুনিলেন না তাহাও বুঝিলেন,—বুঝিবেনই ত তাহা না হইলে তাঁহাকেই বা শ্রীকৃষ্ণ পাঠাইবেন কেন খবর লইতে এবং দিতে। কথার পৃষ্ঠে কথা, প্রাণপ্রিয় পুত্রেব কথা শ্রবণ করিতে করিতে নন্দরাজ দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করিলেন। তবুও আশা মিটে কি? অতৃপ্ত বাসনা লইয়াই নন্দরাজকে উঠিতে হইল, উদ্ধবকে বিশ্রাম করিবার সুযোগ দিতে হইল।

রজনী প্রভাতে গোপীকাদের সঙ্গে উদ্ধবের মিলন ঘটিল। এ মিলন মহামিলন। তারই অমৃতময় ফল উদ্ধব-সন্দেশ, যাহা গ্রন্থকার ব্রহ্মচারী মহারাজ মুক্তহস্তে আমাদিগকে দান কবিয়াছেন। এইরূপ দাতাকেই শাস্ত্র "ভুরিদা" নামে আখ্যাত করিয়া থাকেন।

উদ্ধব ব্রজগোপিকাদের প্রেমোন্মাদিনী অবস্থা দর্শন করিলেন, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহাদের মনোভাবের পরিচয় পাইলেন, তাঁহাদের কথা শুনিয়া বুঝিলেন এর তুলনা নাই, শুধু জগতে নয়—কোথাও নাই।

ভাববস্তু অসীম—ধরা ছোঁয়ার বাইরে। বলিয়া কহিয়া তা বুঝান যায় না,—তাই গোপীকাদের প্রেমের এক মহাভাব দর্শনে উদ্ধব ধন্য হইলেন কৃতার্থ হইলেন—প্রকাশের কোন ভাষা

তাঁহার মুখে যোগাইল না। সে বৃথা প্রয়াস না করিয়া নিজের মনের আর্ত্তি ও প্রার্থনা এই ভাবে প্রকাশ করিলেন—

বন্দে নন্দব্রজস্ত্রীণাং পাদরেণুমভীক্ষ্ণশঃ।
যাসাং হরিকথোদগীতং পুনাতি ভুবনত্রয়ম্॥

(ভাঃ ১০।৪৭।৬৩)

যাঁহাদের হরিকথা বিষয়ক গান ত্রিভুবন পবিত্র করিয়াছে আমি সেই নন্দব্রজের রমণীগণের পাদরেণু পুনঃ পুনঃ বন্দনা করি। এ হেন অমৃত ভাষণ, "উদ্ধব-সন্দেশ" নামক গ্রন্থ প্রকাশ করিতে পাইয়া নিজেকে ধন্য মনে করিতেছি।

শ্রীমৎ স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী মহারাজের আর্থিক সাহায্য, আন্তরিক সহানুভূতি এবং বিশেষ উৎসাহই যে এই গ্রন্থ-প্রকাশকে ত্বরান্বিত করিয়াছে, এই পুণ্য স্বীকৃতির দ্বারাই আমরা আমাদের বক্তব্য শেষ করিলাম।

কৃপাপ্রার্থী
ব্রহ্মচারী শিশিরকুমার

বিষয়-সঞ্চয়ন

বিষয়— পৃষ্ঠা

উদ্ধব-সন্দেশ

॥ এক ॥

মানুষ দুঃখী জীব। অশেষ দুঃখে জীবন ভরা তার। এমন মানুষটি জগতে নাই যে কখনও করে নাই কোন দুঃখ ভোগ। দুঃখ-কাতর জীব নিরন্তরই করে সুখাভিলাষ। "সুখং মে ভূয়াদ্ দুঃখং মে মা ভূৎ"---উপনিষদের এই মন্ত্রই হইল জপমালা, বিশ্বের সকল মানুষের।

সুখ চায় মানুষ, দুঃখী বলিয়াই ত। সুখ যে মানুষ একেবারেই পায় না তাহা নহে। মাঝে মাঝে পায় ক্ষণিক সুখ। সাময়িক সুখ টেঁকে না। সেই নশ্বর সুখে হয় না কাহারও পরিতৃপ্তি। মানুষ খোঁজে অন্তরে অন্তরে সেই সুখ—যে সুখ নিরবচ্ছিন্ন, শাশ্বত, অনাবিল। যে সুখ দুঃখ সংস্পর্শবর্জিত, নিত্য-নিরতিশয়, আত্যন্তিক। সেই সুখেরই নামান্তর ব্রহ্মানন্দ। জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে মানুষ যাহা কামনা করে তাহা ব্রহ্মবস্তুই। নিত্যকাল প্রতিক্ষণে শ্রীভগবান্‌কেই খুঁজিয়া বেড়ায় প্রতিটি জীব।

মানুষ অনুসন্ধান করে তাঁহাকে, কিন্তু জানে না পথের সন্ধান। শাস্ত্রসমূহ জীবকে নির্দ্দেশ দেন সেই পথেরই স্পষ্টভাবে। শাস্ত্রকারগণ বলেন---নিত্যসুখকর আনন্দঘন বস্তু শ্রীভগবান্‌কে অনুসন্ধান কর এই পথ ধরিয়া। তাঁহাকে ভজনা কর, ধ্যান

কর এই উপায় অবলম্বনে। চিরশান্তি পাইবে তাঁহাকে পাইলেই। শ্রীভগবান্‌কে ভজন করিবার উপদেশ ও উপাসনা করিবার পথনির্দ্দেশ আছে সকল শাস্ত্র ভরিয়া। শাস্ত্রবিধিমত ভগবদুপাসনা করিয়া শাশ্বত শান্তির অধিকারী হন ভাগ্যবান্ জীব যাঁহারা।

যাহারা ভাগ্যহত তাহারা ভজন-সাধন করিতে পারে না, কেবল দুঃখের পাথারে ভাসে তাহারা। এইরূপ জীবের সংখ্যা সর্ব্বাধিক এই কলিযুগে। তাই শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র জগতে প্রকটিত হইয়াছেন কলিযুগ আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই। শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র এক অভিনব বার্ত্তা বহন করিয়া আনিয়াছেন কলিহত জীবনিবহের দুয়ারে। সকল শাস্ত্র, জীবকে বলিয়াছেন ভগবান্‌কে ভজিতে। ভাগবতশাস্ত্র কেবল তাহাই করেন নাই। তাঁহার সন্দেশ অঘোষিত-পূর্ব্ব।

শ্রীভাগবত বলিয়াছেন,—"হে জীব, তোমার ত সামর্থ্য নাই ভজিবার, যোগ্যতা নাই ডাকিবার। গ্রহণ কর তুমি আমার কথা। থাক তুমি শুধু কান পাতিয়া নীরবে, তুমি আর তাঁহাকে কী ডাকিবে, শোন তিনিই তোমায় ডাকিতেছেন। তোমার আর তাঁহার জন্য কতটুকু আর্ত্তি! তোমা অপেক্ষা কোটি গুণ অধিক আর্ত্তি লইয়া তিনি তোমায় আহ্বান করিতেছেন।" ভাগবতের দেবতা মুরলীধারী নিরন্তর মুরলী করে ধরিয়া সবাইকে তাঁহার নিকটে ডাকিতেছেন "সর্ব্বভূত-মনোহরং" নিনাদ ছড়াইয়া দিয়া। তুমি পার না তাঁহাকে ডাকিতে তাই ডাকিতেছেন তিনিই তোমাকে। মানুষ ভগবানের কাছে যাইতে পারে না, তাই ভগবান্ নামিয়া আসিয়াছেন মানুষের কাছে। ডাকিতে

জানে না। অজ্ঞ জীব, তাই ডাকিতেছেন বাঁশরিয়া মোহন-বাঁশরীতে। ইহাই বিশ্বের বাজারে ভাগবত শাস্ত্রের অভিনব অবদান। এই নূতন ঘোষণাই শ্রেষ্ঠত্বের পরিচায়ক জগতের দরবারে শ্রীমদ্ভাগবতীয় শাস্ত্রগ্রন্থের। ভাগবত আত্ম-পরিচয়ে বলিয়াছেন—"নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলম্" আমি ভাগবত, আমি বেদকল্পবৃক্ষের বিগলিত ফল। গলিয়া পড়িয়াছি কৃপায়। নামিয়া আসিয়াছেন আমার দেবতা অসীম করুণায় গোলোকধাম হইতে গোকুল-ভূমিতে কালিন্দীর পুলিনাঙ্গনে।

শ্রীভগবানের এই কৃপার সংবাদ ছড়ান আছে শ্রীমদ্ভাগবতের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায়। "কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেম" ইহা ভাগবত উদ্‌ঘোষণা করিয়া, ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছেন জগতের সকল শাস্ত্র ইতিহাসকে। এমন দয়াল ঠাকুর আর কে আছে? আর কাহার শরণ লইব? পূতনা হেন মহা পাপীয়সীকেও পাঠাইয়াছেন যিনি বৈকুণ্ঠে ধাত্রীগতি দিয়া, তাঁহার মত করুণা-নিধির আর কি দেখাইতে পার তোমরা কোনও দেশে, কোনও কালে? পূতনা-গতিদাতা করুণাঘন ঠাকুরকে ছাড়িয়া আর কাহার আশ্রয় লইবে কলিতাপদগ্ধ ক্ষুদ্র কীটাণুকীট জীবনিবহ? ইহাই শ্রীমদ্ভাগবতের মর্ম্মস্পর্শী আশ্বাসবাণী।

মানুষ চায় ভগবান্‌কে। ইহা অপেক্ষাও বড় কথা ভাগবতের, ভগবান চান মানুষকে। ভক্ত ব্যাকুল ভগবানের জন্য। ইহা অপেক্ষাও মনোরম ভাগবতের অন্তরের কথা—ভগবান্ ব্যাকুল ভক্তের জন্য। স্তন্য পিপাসায় গোপাল কাঁদিতেছেন যশোদার জন্য, বৎস হারাইয়া কানাই তাহাদের খুঁজিয়া খুঁজিয়া কাতর

হইয়াছেন বনে বনে, ব্রজ-ললনার মন হরণ করিয়া নিকটে আনিবার জন্য বাঁশরীতে কলধ্বনি করিয়াছেন গোপীজনবল্লভ—ইহাই ভাগবতীয় লীলার মধুরিমা।

ব্রজ ছাড়িয়া ব্রজ-জীবন গিয়াছেন মথুরায়। ব্রজবাসিনী গোপবালারা বিরহে হইয়াছেন পরম কাতরা। দূতী পাঠাইয়াছেন তাঁহারা বৃন্দাদেবীকে প্রাণকান্তের নিকটে—এই কথা আস্বাদন করিয়াছেন বৈষ্ণব মহাজন পদকর্ত্তাগণ। কোন কোন পুরাণও দিয়াছেন এমত বর্ণনা। কিন্তু ভাগবত শাস্ত্র এই খবর দেন নাই।

ভক্ত কাতর ভগবানের জন্য। ইহা অপেক্ষা ভাগবতের আগ্রহ, ভগবান্ কত কাতর ভক্তের জন্য এই কথাটি কহিতে। তাই ব্রজ হইতে মথুরায় দূতী প্রেরণের সংবাদ না দিয়া ভাগবত বলিয়াছেন—মথুরা হইতে বৃন্দাবনে দূত প্রেরণের মধুময় কাহিনী। ভাগবত বর্ণনা করিয়াছেন—শ্রীরাধার দূতী বৃন্দার কথা নয়, শ্রীকৃষ্ণের দূত শ্রীউদ্ধবের কথা। এই দূত প্রেরণের সংবাদ শ্রীমদ্ভাগবত আস্বাদন করিয়াছেন দশম স্কন্ধের ছেচল্লিশ ও সাতচল্লিশ এই দুইটি অধ্যায়ে। এই অধ্যায়-যুগল অবলম্বনে আলোচনা করিব "উদ্ধব-সন্দেশ" এই শিরোনামায়। একাদশ স্কন্ধের উদ্ধবের প্রতি শ্রীভগবানের অমূল্য উপদেশ-পরিপূর্ণ অধ্যায়গুলির নামকরণ "উদ্ধব-সংবাদ"।

॥ দুই ॥

ব্রজেন্দ্রনন্দন নন্দালয়ে প্রকটিত হইয়া ব্রজমণ্ডলে ছিলেন দশ বৎসর আট মাস পর্য্যন্ত। তৎপরে মথুরায় আসিয়া করেন কংসবধ। কংসবধানন্তর তাঁহার পিতা উগ্রসেনকে রাজসিংহাসনে বসান অভিষেক করিয়া। তদনন্তর কৃষ্ণবলরামের হয় ক্ষত্রিয়াচারে উপনয়ন। উপনয়নের পর গুরুগৃহে বাস, তপশ্চর্য্যা ও অধ্যয়ন করেন শাস্ত্রবিধিমত। যমালয় হইতে মৃত পুত্র ফিরাইয়া আনিয়া দেন গুরুদক্ষিণা। তারপর প্রত্যাবর্ত্তন করেন মথুরায়। প্রাসাদের চন্দ্রশালিকায় দাঁড়াইয়া অনেক দিন পর দর্শন করেন প্রবাহিণী যমুনা। কলনাদিনীর কলতান ব্রজবল্লভের অন্তরে জাগাইয়া তোলে ব্রজবনের যত খেলার স্মৃতি। অতীব কাতর হইয়া পড়েন ব্রজবিরহে ব্রজনাথ। নিজ বিরহিগণের সংবাদ লইতে, তাঁহাদের দুইটি সান্ত্বনা বাক্য বলিতে, শ্রীমান্ উদ্ধবকে পাঠাইয়া দেন শ্রীবৃন্দাবনে।

শ্রীউদ্ধব মহারাজের ব্রজযাত্রা বর্ণনের পূর্ব্বে আলোচনীয় আছে ক'টি কথা। পরম প্রেমময়-ভূমি ব্রজ ছাড়িয়া মথুরায় গেলেন কেন আদৌ ব্রজ-প্রাণ? গেলেন যদি বা প্রয়োজনে, ফিরেন নাই কেন কংস নিধন করিয়াই? একেবারে না-ই বা ফিরিলেন, আসেন না কেন মাঝে মাঝে? আজ নিজে যাইতেছেন না কেন, দূত না পাঠাইয়া? যদি না যাওয়ার সঙ্গত কারণ থাকে, না-ই বা গেলেন, নিকটে রাখেন না কেন ব্রজের প্রিয়জনদের মথুরায় আনিয়া? উদ্ধব-প্রেরণের তাৎপর্য্যটি

সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিতে প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে ঐ সকল বিষয় সম্বন্ধে সুস্পষ্ট অনুভূতির। অতএব আগে উত্তর দেওয়া যাউক ঐ সমুদয় প্রশ্নের যথাসম্ভব সংক্ষেপে।

যেখানে প্রীতি-ভালবাসা পায়, সেইখানেই থাকিতে চায় মানুষ। কম ভালবাসার স্থানে যাইতে চায় না মানুষ বেশী ভালবাসার ক্ষেত্র ছাড়িয়া। ইহা মানবের স্বভাব বটে। কিন্তু এরূপ স্বভাব নহে শ্রীভগবানের। যে তাঁহাকে ভালবাসে তিনি তাহাকেই ভালবাসেন। যাহার প্রীতি যতখানি গভীর, তিনি তাহার প্রতি ততখানি গভীর ভাবের প্রীতি বিনিময় করেন।

গীতায় আছে শ্রীমুখবাণী—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্"। ৪।১১

—যে ভক্ত যেভাবে আশ্রয় চায় তাঁহার, তিনি সেই ভক্তকে ভজনা করেন সেই ভাবে। মহা মহা ভক্ত আছেন বলিয়া ভগবান্ ক্ষুদ্র ভক্তকে উপেক্ষা করিতে পারেন না। বৃন্দাবনের পরম প্রেমাস্পদগণের সঙ্গে রসাস্বাদনে মজিয়া থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণ উপেক্ষা করিয়া ভুলিয়া থাকিতে পারেন না মথুরাধামের প্রিয় ভক্তদের। তাহা করিলে জগতে কলঙ্ক রটে তাঁহার ভক্তবৎসল এই নামে।

শ্রীবৃন্দাবনের প্রিয়জনদের প্রীতির তুলনা নাই জগতে কোথাও একথা সত্য বটে। কিন্তু মথুরার ভক্তেরাও ছোট নহেন। শ্রীকৃষ্ণকে পুত্ররূপে পাইবেন—এইজন্য কি কঠোর সাধনাই না করিয়াছেন বসুদেব-দেবকী! বিবাহের দিন হইতে দুঃখের আরম্ভ। সুদীর্ঘকাল আছেন কারাকক্ষের দেউলাভ্যন্তরে। কৃষ্ণ

ভূমিষ্ঠ হইবার পরেও অতীত হইয়াছে কত বেদনাভরা দশ বৎসর আট মাস কাল। প্রতিটি ক্ষণ কাটিতেছে এই বেদনাহত দম্পতির শুধু কৃষ্ণ চিন্তায়। বংশীবট, যমুনাতট যত সুখময় স্থানই হউক না কেন—মথুরার শ্বাস-তপ্ত কারাকক্ষ ভুলিতে পারেন না দেবকী-নন্দন। পিতামাতা ছাড়া আরও অনেক ভক্ত আছেন মথুরায়, যাঁহারা আছেন মথুরায় অনেক কষ্ট সহ্য করিয়া, কৃষ্ণ আসিবেন এই আশায় বুক বাঁধিয়া। তাঁহাদিগের জন্য আনন্দ রসভূমি ব্রজকে চিরত্যাগ করিয়া মথুরার পথে চলিতে হইল ভক্তবৎসল শ্রীহরির। কংসকে বধ করিয়া মুক্তি দিলেন গোবিন্দ কারাক্লিষ্ট বসুদেব-দেবকীকে। রাজাসনে বসাইলেন কংসপিতা উগ্রসেনকে। পিতামাতার কারামুক্তি-কার্য্যেই শেষ হইল না পুত্রের কর্ত্তব্য। তাঁহাদের সঙ্গে থাকিয়া কক্ষে বক্ষে উঠিয়া আস্বাদন করিতে হইবে তাঁহাদের অতৃপ্ত বাৎসল্য-স্নেহধারাকে। রাজকার্য্য পরিচালনা করিবার যোগ্যতা নাই বৃদ্ধ উগ্রসেনের। সমুদয় কার্য্যভার বহিতে হইবে শ্রীকৃষ্ণকেই, সুতরাং কংস বধ করিয়াই প্রত্যাবর্ত্তন করা শোভা পায় না শ্রীকৃষ্ণের ব্রজের ধীরসমীরে। শৃঙ্খলাহীন রাজ্যের পুনর্গঠনের গুরুদায়ত্ব শ্রীকৃষ্ণের মাথায়। ভক্ত-দরদী লোকশিক্ষা গুরু শ্রীকৃষ্ণ মথুরা ছাড়িয়া ব্রজে যাইতে পারেন না।

কংসরাজের পত্নী ছিল দুই জন—নাম ছিল তাহাদের অস্তি আর প্রাপ্তি। চলিয়া গিয়াছে তাহারা পিত্রালয়ে বিধবা হইবার পর। তাহাদের পিতা হইল অত্যাচারী রাজা জরাসন্ধ। ক্ষেপিয়া উঠিল জরাসন্ধ জামাতার বধকারী শ্রীকৃষ্ণের উপর। দুই ভগ্নী পিতার কাছে অবতারণা করিয়াছে বহু মিথ্যা কথা শ্রীকৃষ্ণের

বিরুদ্ধে। নির্দ্দোষ কংসকে বহু ষড়যন্ত্র করিয়া কৃষ্ণ মারিয়াছে এরূপ বহু তৈয়ারী করা অলীক কথা বিধবা কন্যারা বলিয়াছে পিতার কাছে চোখের জলে। ইহাতে ক্রুদ্ধ না হইয়া পারে কোন রক্ত-মাংসের মানুষ? জরাসন্ধ মথুরা আক্রমণ করিয়াছে বহুবার শ্রীকৃষ্ণকে উচিত শিক্ষা দিবার জন্য। জরাসন্ধ যে মথুরা আক্রমণের উদ্যোগে আছে তাহা শ্রীকৃষ্ণের অবিদিত রহে নাই। মথুরা রাজধানী। বহু সৈন্য-সামন্ত ও দুর্গাদি আছে বিপদকে প্রতিরোধ করিবার জন্য। বৃন্দাবন পল্লীগ্রাম, নাই কোন সৈন্য, নাই কোন দুর্গ সেখানে। কৃষ্ণ বৃন্দাবনে গেলে জরাসন্ধ যদি মথুরা ছাড়িয়া ব্রজ আক্রমণ করে তাহা হইলে অসম্ভব হইয়া উঠিবে তাহাকে ঠেকান। ফলে হইবে গোপ-পল্লী ছারখার। এই দুঃখময় পরিণামের বিষয় সম্যক্ জ্ঞাত হইয়া কি প্রকারে কৃষ্ণ চলিতে পারেন ব্রজবনের অভিমুখে? কিন্তু যদি মাঝে মাঝে যান আসেন তবে কি ক্ষতি হয়?

ঘন ঘন যাতায়াতের ফলে জরাসন্ধ যদি বুঝিতে পারে যে, বৃন্দাবন শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় স্থান, তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই সেখানে গিয়া আক্রমণ চালাইবে শুধু কৃষ্ণকে দুঃখ দিবার জন্য। সুতরাং ব্রজধাম যে কৃষ্ণের আদরের ভূমি ইহা যতটা অপ্রকাশিত থাকে ততই ভাল। নন্দরাজাও পরিজ্ঞাত আছেন যে, জরাসন্ধ কুপিত হইয়াছে কৃষ্ণের উপর। কৃষ্ণ ব্রজে আসিলে জরাসন্ধের কোপ হইতে তাঁহাদের রক্ষা করা যে কত সুকঠিন কার্য্য তাহা নন্দরাজ অনুভব করিতে পারেন না, এমন নহে। মথুরায় যাদ-বেরা যোদ্ধা, বৃন্দাবনের গোয়ালারা নিরীহ—নন্দ মহারাজ ইহা

ভালই জানেন। অধিকন্তু, বসুদেব-দেবকীর আদেশ না লইয়া শ্রীকৃষ্ণ কোথাও যাইতে পারেন না। এতকাল পরে প্রাণ-পুতুলিকে পাইয়া তাঁহারা তাঁহাকে অঙ্কছাড়া করিতে চাহেন না, শ্রীকৃষ্ণ কার্য্য প্রয়োজনে অন্য কোথাও যাইতে চাহিলে, শীঘ্রই ফিরিবে জানিয়া কষ্ট সহ্য করিয়াও তাঁহারা তাঁহাকে বিদায় দেন, কিন্তু বৃন্দাবনে যাইবার কথা উঠিলে বসুদেব-দেবকী কখনও আদেশ দেন না। কেবল অশ্রু বিসর্জ্জন করেন। তাঁহারা জানেন ওখানে গেলে আর ফিরিবে না। যাহা কার্য্য তাহার শেষ আছে। মানুষ কোথাও কাজে গেলে, কাজ শেষ করিয়া ফিরিতে পারে। যাহা কার্য্য নয়, শুধু প্রীতিরসের আস্বাদন, তাহার ত শেষ নাই। সেই আস্বাদনে কেহ মজিলে, কোন দিনই ত তাহার ফেরা সম্ভবে না। ব্রজ কৃষ্ণের কর্মভূমি নয়—রসভূমি, সুতরাং বসুদেব-দেবকীর আশঙ্কা অমূলক নয়।

পিতৃ-মাতৃ-আদেশ না লইয়া বৃন্দাবনে গেলে তাহাতে নন্দ-যশোদাও সুখী হইবেন না, কারণ কৃষ্ণ বলিয়া যদি দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করেন বসুদেব-দেবকী, তাহা হইলে তাহাতে অকল্যাণ হইবে নন্দনের, এই আশঙ্কায় অতি কাতর হইবেন নন্দ-যশোদা। ব্রজের জন কেবল কৃষ্ণ চাহেন না, তাঁহারা চাহেন কৃষ্ণের কল্যাণ।

তবে গোপনে দুই একদিন ব্রজে গিয়া ব্রজবাসীদের একটু চোখের দেখা দিয়া আসিলে ক্ষতি কি?

ক্ষতি অনেক। ঐরূপ দেখা পাওয়ায় তাঁহাদের বিরহাগ্নি অধিকতর প্রজ্বলিত হইবে, কমিবে না। ক্ষুদ্র প্রদীপ বাতাসে নিভে—বড় আগুন বাতাসে বাড়ে।

ব্রজবাসীদের মথুরার রাজধানীতে লইয়া আসিয়া দুই সংসার একত্র করিয়া বাস করিলে কেমন হয় ?

তাহাতে এক অদ্ভুত রস-সঙ্কট উপস্থিত হয়। মথুরায় শ্রীকৃষ্ণের ক্ষত্রিয়াবেশ ও ক্ষত্রিয়বেশ। বৃন্দাবনে তাঁহার গোপাবেশ ও গোপবেশ। মথুরায় বৃষ্ণিগণের তিনি "পরদেবতা"— "বৃষ্ণীনাং পরদেবতা" ; বৃন্দাবনের গোপগণের তিনি "স্বজন" —'গোপানাং স্বজনঃ।' যাদবেরা কৃষ্ণের পদধূলি শিরে ধরে, গোপবালকেরা তাঁহার স্কন্ধে উঠিয়া "হারে, ওরে" বলিয়া চলিবার জন্য তাড়া করে। দেবকীজননী কৃষ্ণের প্রণাম নিতে ভয় পান। জননী যশোদা রজ্জু দিয়া বন্ধন করিয়া কঠোর ভৎসনা বাক্য বলেন। পিতা বসুদেব শঙ্কাযুক্ত চিত্তে পুত্রকে আলিঙ্গন করিতে সাহসী হন না। বাবা নন্দ তাঁহার পায়ের পাদুকা কৃষ্ণের মাথায় দিয়া নিশ্চিন্তে বনপথে গোচারণ করেন। মথুরার জন, কৃষ্ণের পদতলে বসিয়া প্রসাদ পাইয়া ধন্য হয়। ব্রজের জন তাঁহার কণ্ঠ ধরিয়া উচ্ছিষ্ট খাওয়াইয়া আনন্দে নাচে। এই ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য অবগাহী দুইটি প্রীতিরসের ধারাকে একই ভূমিকায় আনিয়া তাহাদের রস-মর্য্যাদা রক্ষা করা রসরাজের পক্ষেও অসম্ভব। পুষ্প বনেই সুন্দর, বৃন্তচ্যুত করিয়া গৃহে আনিলেই মলিন। ব্রজরস ব্রজকুঞ্জেই মধুময়, রাজধানীতে আসিলেই আহত, শ্রীহীন।

॥ তিন ॥

ব্রজবাসী সব শ্রীকৃষ্ণবিরহে কাতর। শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবিরহে মর্মাহত, ব্রজজনের কাতরতার কথা ভাবিয়া অধিকতর ব্যথাহত। যাহাতে এই বিরহ-বেদনা বিন্দুমাত্র ঘুচিতে পারে এমন কোন সুষ্ঠু উপায় পরিদৃষ্ট হইতেছে না। যদুনাথের এখন মথুরা ছাড়া সম্ভব নয়। ব্রজজনেরও ব্রজের বাতাবরণ ছাড়া সম্ভব নয়। এই দুই অসম্ভবতার মধ্যে মুক্ত কেবল একটি বিকল্প—মাঝে মাঝে সংবাদ পাঠান। এটি অতি মন্দের মধ্যে একটু ভাল। মরুভূমির মধ্যে পান্থপাদপ। সংবাদ লইতে ও পাঠাইতে যোগ্য ব্যক্তির প্রয়োজন। মথুরার কৃষ্ণপ্রিয়দের শিরোমণি শ্রীমান্ উদ্ধব। তাই যোগ্যতম ব্যক্তিকেই প্রেরণ করা হইতেছে।

শ্রীকৃষ্ণের খুল্লতাত দেবভাগের আত্মজ শ্রীমান্ উদ্ধব। বাল্যাবধি উদ্ধব কৃষ্ণভক্ত। বয়স তার যখন মাত্র পাঁচ, তখন হইতে সে কৃষ্ণপূজায় নিবিষ্টচিত্ত। কৃষ্ণকে না খাওয়াইয়া সে অন্ন পান মুখে তুলে না। বাল্যে যখন কৃষ্ণের ধ্যানে বসিত সেই বালক, তখন লুপ্ত হইয়া যাইত তার বাহ্যস্মৃতি। আহারের জন্য তাহার মা ডাকিতেন, সাড়া মিলিত না। ভক্তগণ উদ্ধবকে আখ্যা দিয়াছেন 'হরিদাসবর্য্য'। শ্রীশুকদেব উদ্ধবকে "বুদ্ধিসত্তম" বলিয়াছেন। মনুষ্যসমাজে উদ্ধব রত্ন। সাক্ষাৎ বৃহস্পতির শিষ্য, সুতরাং পাণ্ডিত্যে তুলনাবিহীন। শ্রীকৃষ্ণের তিনি একাধারে মন্ত্রী, সখা, দয়িত,। যাদবেরা সকলেই গভীর শ্রদ্ধা করেন উদ্ধবকে, তাঁহার কথার উপরে কেহ কথাটি কয় না। সকলেই

জানেন উদ্ধব কখনও ভুল করেন না। ভ্রম প্রমাদ নাই উদ্ধব মহারাজের সমগ্রজীবনের মধ্যে কোনও জায়গায়। অতি সুতীক্ষ্ণ বিচারকৌশল উদ্ধবের, অতি সুনিপুণ তাঁহার শাস্ত্রানুশীলন। কত উদার উদ্ধবের হৃদয়, কত গভীর তাঁহার কৃষ্ণভক্তি। উদ্ধবের জুড়ি নাই। উদ্ধবের দেহের বর্ণ, অঙ্গের সৌষ্ঠব, অঙ্গের চেষ্টা গতিবিধি, মুদ্রাভঙ্গী প্রত্যেকটি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের অনুরূপ, সর্ব্বতো-ভাবেই সাদৃশ্যপূর্ণ। শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদী দ্রব্য ছাড়া অন্য দ্রব্য উদ্ধব গ্রহণই করেন না। তাঁহার দেহের বসন ভূষণ, মাল্য চন্দন সকলই পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক গৃহীত, পরে পরিত্যক্ত অর্থাৎ তাঁহার প্রসাদীকৃত। প্রসাদী বস্ত্রালঙ্কারে বিভূষিত উদ্ধবকে হঠাৎ দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া ভ্রান্তি জন্মে। যেখানে শ্রীকৃষ্ণেরই যাওয়া একান্ত প্রয়োজন, সেখানে প্রতিনিধি স্বরূপ অপর কাহাকেও যাইতে হইলে একমাত্র উদ্ধবই সর্ব্বতোভাবে যোগ্য ব্যক্তি।

কংসবধের পর উপবীত ধারণ করিয়া গুরুগৃহে গমন করিয়া-ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ। গুরুগৃহে চৌষট্টি প্রকার বিদ্যা অতি অল্পকালে আয়ত্ত করিয়া সবেমাত্র ফিরিয়াছেন মথুরায়। পূর্ব্বে প্রত্যহ শ্রীবৃন্দাবনের সংবাদ পাইতেন ও পাঠাইতেন। নন্দরাজ ভৃত্যের হাতে দিয়া নিত্য ক্ষীর নবনী পাঠাইতেন গোপালের জন্য। ঐ ভৃত্যের মাধ্যমে ব্রজের সংবাদ মথুরায় ও মথুরার সংবাদ ব্রজে একটু একটু পৌঁছিত। এই সংবাদটুকুরও আদান প্রদান বন্ধ হইয়া গিয়াছে শ্রীকৃষ্ণের গুরুগৃহে যাইবার পর।

গুরুগৃহ হইতে ফিরিয়া আসা অবধি বৃন্দাবনের ভাবনা অস্থির করিয়া তুলিয়াছে শ্রীকৃষ্ণকে। ঐ বেদনা শতগুণ বর্দ্ধিত

হইয়াছে প্রভাতে যমুনায় অবগাহন করিতে গিয়া। রাজকার্য্য করিতে পারিতেছেন না শ্রীকৃষ্ণ রাজসভায় বসিয়া। উঠিয়া গেলেন রাজকার্য্য অসমাপ্ত অবস্থায় রাখিয়া। ইসারায় ডাকিলেন প্রিয় উদ্ধবকে অন্দরের দিকে। নিজ গোপন প্রকোষ্ঠে গিয়া বসিলেন উদ্ধবের হাতে হাত দিয়া "গৃহীত্বা পাণিনা পাণিম্।" বেদনাহত কৃষ্ণ কহিতে লাগিলেন গদ-গদ-কণ্ঠে। শ্রীকৃষ্ণের মুখচ্ছবি বর্ষণোন্মুখ জলধরের মত। এমন দৃশ্যটি উদ্ধব কখনও দেখেন নাই। ভগবানের জন্য ব্যাকুল সকল সংসার। ভগবানের এত ব্যাকুলতা কাহাদের জন্য? শ্রীমান উদ্ধবকে ব্রজে প্রেরণ করিবার পক্ষে আর একটি গূঢ় হেতু আছে শ্রীকৃষ্ণের অন্তরে।

বর্ষায় যখন নদীতে জল বাড়ে, তখন নদী তাহার খানিকটা তীরে তুলিয়া দেয়। ইহাতে কিছুটা লাঘব হয় ভারের। বিরহ-ব্যথায় বুক ফুলিয়া উঠিলে মানুষ উহা কিঞ্চিৎ উপশমিত করিতে প্রয়াসী হয় পার্শ্বস্থ দরদীজনের কাছে ব্যক্ত করিয়া। শ্রীকৃষ্ণ ব্রজের জন্য বিরহকাতর, কিন্তু ব্রজের কথা বলিবার উপায় নাই। কারণ, সারা মথুরায় নাই ব্রজের কথা অনুভব করিবার মত লোক। তাই উদ্ধব ব্রজে গিয়া দিনকতক থাকিয়া ব্রজভাবে কিঞ্চিৎ ভাবিত হইয়া যদি মথুরায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তাঁহার সঙ্গে প্রাণের ব্যথার কথা কহিতে পারিবেন শ্রীকৃষ্ণ। তাহাতে বিরহ-বেদনা কিঞ্চিৎ লঘুতা প্রাপ্ত হইবে।

পরে ক্রমে উদ্ধবের সংস্পর্শে ও প্রভাবে মথুরার অন্যান্য ভক্তেরাও হইয়া উঠিবেন ব্রজ সম্বন্ধে কিছুটা অনুভবী। ফলে

শেষে অনেক সুযোগ সুবিধা হইবে মথুরায় ব্রজকথা আলাপন ও আলোচনা করিবার। অধিকন্তু, উদ্ধবেরও প্রয়াজন বৃন্দাবন দর্শন করা। ব্রজ দর্শন না করিলে লাভ হয় না ভক্তজীবনের চরম সার্থকতা। ব্রজের বাহিরে জগৎ-মধ্যে আর নাই উদ্ধবের মত কৃষ্ণভক্ত। এ কথা ঠিক, তথাপি ব্রজজনের প্রেমভক্তির তুলনায় উদ্ধব যে কত ছোট তাহা উদ্ধবেরও বুঝা দরকার, উদ্ধবের মাধ্যমে জগজ্জীবেরও জানা প্রয়োজন।

বক্তা লীলারসিক শ্রীশুকদেব ব্রজের বর্ণনা শেষ করিয়া আসিয়াছেন মথুরায়। এখন কহিতেছেন মথুরার কথা। ব্রজের কথা বলিয়াছেন ব্রজে থাকিয়া। এখন আর একবার মথুরার চক্ষে ব্রজদর্শন করা শ্রীশুকেরও প্রয়োজন। ভাগবত-শ্রোতৃগণের প্রয়োজন। উদ্ধবকে ব্রজে পাঠাইবার অর্থই হইল মথুরাভূমির ব্রজ দর্শন।

কোন কোন বস্তু ভাল দৃশ্যমান হয় না অতি সন্নিকট হইতে। একটু দূর হইতেই পরিব্যক্ত হয় তাহার প্রকৃত রূপ। এই হেতু প্রায়শঃ মহদ্ব্যক্তিদের মহিমা সমসাময়িক লোকেরা অনুভব করিতে পারে না। মরণান্তে জীবন-কথা প্রকাশিত হয়। কখনও বা শতাব্দীর পরে মানুষ দৃষ্টিপাত করে তাঁহাদিগের প্রতি—বিস্ময়াবিষ্ট দৃষ্টি লইয়া। কালগত দূরত্ব সম্বন্ধে যে কথা, স্থানগত ও ভাবগত দূরত্ব সম্বন্ধেও সেই কথা বলা চলে। অনেক সময় লোক স্বদেশকে চেনে বিদেশে গিয়া। বৃন্দাবন হইতে মথুরার স্থানগত ও কালগত দূরত্ব বেশী কিছু নয়। কিন্তু ভাবগত দূরত্ব অনেকখানি।

ব্রজধাম মাধুর্য্যের ভূমি ! মথুরাধাম ঐশ্বর্য্যের দেশ । মথুরা হইতে ব্রজ দেখিবেন আজ ভাগবতকার শ্রীশুকমুনি । ঐশ্বর্য্যভূমি হইতে মাধুর্য্য ভোগ করিবেন । ব্রজের ভাব আস্বাদন করিবেন উদ্ধবের নয়ন ও মন দিয়া । ইহাই উদ্ধব-সন্দেশের গূঢ় মর্ম্ম । সুতরাং আজ ব্রজবনে উদ্ধবকে প্রেরণে শ্রীকৃষ্ণের লাভ, উদ্ধবের লাভ, মথুরাবাসীর লাভ, শ্রীশুকমুনির লাভ, জগজ্জীবের লাভ । শুনিতেই হইবে এই মহালাভের কথা ।

॥ চার ॥

নিজ ক্রোড়ের নিকট উদ্ধবকে টানিয়া বসাইয়া নিজের শ্রীহস্তদ্বয়ের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া উদ্ধবের দক্ষিণ কর, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কহিতে লাগিলেন অতি করুণকণ্ঠে—

গচ্ছোদ্ধব ! ব্রজং সৌম্য ! পিত্রোর্নঃ প্রীতিমাবহ ।
গোপীনাং মদ্বিয়োগাধিং মৎসন্দেশৈঃ বিমোচয় ॥

ভাঃ ১০।৪৬।৩

শ্রীউদ্ধবকে ভগবান্ 'সৌম্য' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন । তাঁহার মূর্ত্তিখানিই শান্তরসময় স্নিগ্ধতায় ভরা । বহু অশান্তির মধ্যেও কেহ উদ্ধবকে দর্শন করিলে তাহার চিত্তে উদয় হয় বিপুল

শান্তি। দুঃখে, আপদে অপরকে সান্ত্বনা দিবার সর্ব্বতোভাবে যোগ্যজন এই প্রকার ব্যক্তিই।

"সৌম্য" সম্বোধন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ আদেশ করিলেন উদ্ধবকে ব্রজে যাইতে। "উদ্ধব, তুমি ব্রজে যাও, তথায় গিয়া আমাদের পিতামাতা ব্রজেশ্বর ব্রজেশ্বরীর প্রীতিবিধান কর।" পিতামাতার কথা বলিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন "আমাদের পিতামাতা" (পিত্রোঃ নঃ); বস্তুতঃ নন্দযশোদা উদ্ধবের পিতামাতা নহেন। তথাপি এরূপ শব্দ প্রয়োগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিতে চাহিতেছেন যে, উদ্ধব, তুমি যখন আমার প্রিয়সখা, তখন আমার পিতামাতা তোমারও পিতামাতা। এই কথায় শ্রীকৃষ্ণের ব্রজের পিতামাতার প্রতি গভীরতর হইয়া উঠিল উদ্ধবের শ্রদ্ধা।

বৃন্দাবনের পিতামাতার বাৎসল্যস্নেহের উপমা নাই অনন্ত-বিশ্বে। শ্রীকৃষ্ণের মহা মহা ঐশ্বর্য্যেরও ক্ষমতা নাই তাঁহাদের হৃদয়ে কৃষ্ণসম্বন্ধী পুত্র-বুদ্ধি ক্ষুণ্ণ করিয়া ঈশ্বরবুদ্ধি জাগায়। ঐশ্বর্য্যই ভগবত্ত্ব। সেই ভগবত্ত্বও ছোট হইয়া যায় নন্দযশোদার প্রেম-মহত্ত্বের দুয়ারে। তাঁহারা কেবল পুত্রকে লালন-পালনই করেন নাই, তাড়ন, ভর্ৎসন, বন্ধন পর্য্যন্ত করিয়াছেন। ঈশ্বরত্ব হইতেও গরীয়সী এই স্নেহগাঢ়তা তুলনারহিত।

একটি মুহূর্ত্ত শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ তাঁহারা সহ্য করিতে পারেন না। একথা শ্রীকৃষ্ণ জানেন। তবু আজ এতদিন আছেন তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া মথুরায়। তাঁহাদের নিদারুণ অবস্থা স্মরণ করিয়া অন্তরে মর্ম্মঘাতী বেদনার অনুভবে তাই কহিলেন উদ্ধবকে, তাঁহাদের অন্তরে কিঞ্চিৎ সুখের বিধান কর, কোনও প্রকারে

(প্রীতিমাবহ)। শ্রীকৃষ্ণ যখন মথুরায় আসেন, তখন পিতা নন্দ তাঁহার অনুসরণ করিয়াছিলেন। কংসাদি বধের পর শ্রীকৃষ্ণ পিতাকে বিদায় দেন এই কথা বলিয়া—

"জ্ঞাতীন্ বো দ্রষ্টুমেষ্যামো বিধায় সুহৃদাং সুখম্"

১০।৪৫।১৭

হে পিতঃ! আমার সুহৃদ্ যাদবগণের সুখসম্পাদন করিয়া আবার ব্রজের আত্মীয়স্বজনদের দেখিতে যাইব। পুত্রের এই প্রতিশ্রুতি-বাক্য হৃদয়ে ধরিয়া নন্দযশোদা মহাদুঃখের মধ্যেও ধৈর্য্যে বুক বাঁধিয়া আছেন। শ্রীকৃষ্ণের ত' এখন উপায় নাই ব্রজে যাইবার—তাই বলিতেছেন উদ্ধবকে এমন প্রবোধবাক্য তাঁহাদিগকে কহিবার জন্য, যাহাতে তাঁহাদের বেদনাহত চিত্তে কিঞ্চিৎ সুখোদয় হয়।

পিতা-মাতার কথা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ ব্রজের গোপিকাদের কথা বলিতেছেন উদ্ধবকে। গোপীদের হৃদয়ভরা তীব্র পীড়া আমার বিরহজনিত "মদ্‌বিয়োগাধিং", তাহা দূর করিবে আমার বার্ত্তা দিয়া। "মৎসন্দেশৈঃ"—'আমার সন্দেশ' কথাটির নানাবিধ হার্দ্দ হইতে পারে। আমিই তোমাকে দিয়া এই সংবাদ পাঠাইতেছি, ইহা আমার সন্দেশ। অথবা আমি সুস্থ আছি ইহা আমার সন্দেশ। অথবা আমি এদিককার কার্য্য সমাধানান্তে শীঘ্র ব্রজে আসিব ইহা আমার সন্দেশ। অথবা তাঁহারা যেমন আমার জন্য, আমিও সেইরূপ ব্যাকুল তাঁহাদের জন্য ইহা আমার সন্দেশ। ব্রজের বিরহী প্রিয়গণের পক্ষে আমার সন্দেশই পরম সান্ত্বনা-বাক্য।

ব্রজের পিতা মাতার স্নেহের সংবাদ অনেকেই অল্পবিস্তর জানেন। উদ্ধবও নিশ্চয়ই অবগত আছেন। ব্রজদেবীদের কথা কিন্তু অনেকেই জানেন না, তাই একটু সবিস্তারে বলিতেছেন তাঁহাদের কথা উদ্ধবের কাছে নিজ শ্রীমুখেই। এই সুযোগে শ্রীশুকদেবেরও শুনিবার ও শোনাইবার অবকাশ হইতেছে গোপীদের কৃষ্ণানুরাগের কথা প্রাণবল্লভের নিজ শ্রীকণ্ঠ হইতেই।

তা মন্মনস্কা মৎপ্রাণা মদর্থে ত্যক্তদৈহিকাঃ।
মামেব দয়িতং প্রেষ্ঠমাত্মানং মনসাগতাঃ॥

ভাঃ ১০।৪৬।৪

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায় শ্রীঅর্জ্জুনকে কহিয়াছেন সর্ব্বগুহ্যতম মন্ত্রে —"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু"। সমস্ত মনটি যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিয়াছেন, নিজের মন যাঁহাদের আর নাই, তাঁহারা মন্মনা। ইহার দৃষ্টান্ত সংসারে খুঁজিয়া পাওয়া সুদুর্লভ—'সুদুর্লভা ভাগবতা হি লোকে।' গীতায় চরম পরম শ্লোকের দৃষ্টান্ত মূর্ত্ত হয় নাই। হয় নাই বলিয়াই নারদোপদেশে ব্যাসের সাধনায় ভাগবত প্রকটিত হন। গীতায় যে সব ভক্তের লক্ষণ আছে ভাগবতে তাহারই রূপায়ণ। 'মন্মনাঃ' ভক্ত কাঁহারা. আজ নিজ শ্রীমুখেই উদ্ধবকে কহিতেছেন শ্রীহরি স্বয়ং।

কৃষ্ণের গোপীজনেরাই—মন্মনস্কা ও মৎপ্রাণা। শ্রীকৃষ্ণই তাঁহাদের প্রাণ। তাঁহাদের যাবতীয় মানস-সঙ্কল্প শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিসম্পাদনেই পর্য্যাপ্ত। এই হেতুই তাঁহারা তাঁহাদের সর্ব্বপ্রকার দেহ ও দৈহিক বস্তু সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিতে সমর্থ কৃষ্ণের জন্য—'ত্যক্তদৈহিকাঃ'। সুতরাং ব্রজদেবীগণেই

গীতার সর্ব্বগুহ্যতম জীবন্ত বার্ত্তা হইয়াছে একথার সাক্ষ্য গীতার বক্তা আজ নিজেই দিলেন।

মন্মনস্কা ও মৎপ্রাণা পদদ্বয়ের আরও গভীরার্থব্যঞ্জনা আছে। যে ব্রজদেবীগণে আমার মনটি সর্ব্বদা স্থিত, তাঁহারা মন্মনস্কা আর যাঁহারা আমার প্রাণ—আমার অন্তরে যাঁহাদের প্রাণ স্থিত তাঁহারা মৎপ্রাণা। কৃষ্ণ যাঁহাদের প্রাণ, তাঁহারাও কৃষ্ণের প্রাণ হইবেন। গীতায় বলা আছে—

যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বং চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি॥ ৬।৩০

আমাকে যে সর্ব্বত্র দেখে এবং আমার মধ্যেই সকল দেখে, আমি তার অদৃশ্য হই না, সেও আমার অদৃশ্য হয় না। 'মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি।' আমা ছাড়াও তাহারা জানে না, তাহাদের ছাড়াও আমি জানি না।

শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে যাহা বলিতেছেন তাহার দৃঢ় ব্যঞ্জনা এই যে, ব্রজরামাগণ আমার প্রাণ। আমি তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যে মথুরায় আছি এই থাকাই মাত্র। কোন কার্য্যে আমার উৎসাহ বা আনন্দ পাই না। কেবল করণীয়বোধে কর্ম্মগুলি করিতেছি শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ-ত্যাগের মত। মনপ্রাণ আমার পড়িয়া রহিয়াছে ব্রজেই। যদি বল এরূপ অবস্থা তোমার তাহাদের জন্য কি হেতু—তবে তাহার কারণ বলি শোন।—

"যে ত্যক্তলোকধর্ম্মাশ্চ মদর্থে তান্ বিভর্ম্যহম্" ১০।৪৬।৪

যাহারা আমার জন্য লৌকিক ভালমন্দ, ধর্ম্মাধর্ম্ম সকলি দিয়াছে বিসর্জ্জন, তাহাদিগকে আমি সর্ব্বদা ধারণ করিয়া থাকি

নিজ হৃদয়ে। যে যেভাবে ভজনা করে তাহাকে সেই ভাবেই ভজি, ইহা আমার স্বভাবগত ধর্ম্ম। গোপিকারা আমার বিরহ-তাপে মর্ম্মাহত। এ-কথায় উদ্ধব বলিতে পারেন যে, যাহারা মনপ্রাণ তোমাকে দিয়াছে ও তোমার জন্যই সর্ব্বস্ব ছাড়িয়াছে, তাহারা তো তোমাকে লাভই করিয়াছে ; তাহাদের জন্য আর চিন্তা কেন ? ইহার উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ কহিতেছেন—

ময়ি তাঃ প্রেয়সাং প্রেষ্ঠে দূরস্থে গোকুলস্ত্রিয়ঃ।
স্মরন্ত্যোঽঙ্গ বিমুহ্যন্তি বিরহৌৎকণ্ঠ্যবিহ্বলাঃ॥

ভাঃ ১০।৪৬।৫

হে আমার অঙ্গতুল্য প্রিয় উদ্ধব, তবে শোন। আমাকে ক্ষণার্দ্ধ সময় না দেখিলে তাহারা ঐ সময়টুকুকে শতযুগ মনে করিত। আমার দর্শনকালে চক্ষের নিমেষের জন্য যে ব্যবধানটুকু তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া তাহারা চক্ষের পলক-নির্ম্মাতা বিধাতাকে নিন্দা করিত। সেই গোপীদিগকে ছাড়িয়া আজ আমি কতদূরে আসিয়া আছি কত দীর্ঘকাল ধরিয়া। তাহারা যখন অন্তর্ম্মনা থাকে তখন আমাকে পায় অন্তরে, ডুবিয়া থাকে তখন আমাতে। কিন্তু তাহারা ত যোগী নয়, তাহারা ভক্ত। ভক্তেরা আমাকে অন্তরে পাইয়াই তৃপ্ত হয় না—বাহিরেও পাইতে ইচ্ছা করে সেবা করিতে। তাহাদের যখন বাহ্যদশা হয় তখন আমাকে দেখিতে না পাইয়া তাহারা আমার রূপ ও গুণের কথা যেইমাত্র স্মরণপথে আনয়ন করে অমনি বিরহের উৎকণ্ঠায় বিহ্বল হয় ও ঘন ঘন মূর্চ্ছাদশা প্রাপ্ত হইতে থাকে।

উদ্ধব, ব্রজরামাগণ অধিকাংশ সময়ই মূর্চ্ছাদশায় কাটায়।

বস্তুতঃ মূর্চ্ছাই তাহাদের প্রাণ রক্ষা করে। কারণ ঐ সময় তাহারা অন্তরে আমাকে পায়। তাহাদের যা অবস্থা তাহা অনুমান করিয়া আমি বেশ বুঝিতে পারি যে, তাহারা আর অধিক দিন বাঁচিবে না। আমার বিরহে অতি সন্তপ্ত প্রাণ তাহারা ধরিয়া আছে অতীব কষ্টে।

"ধারয়ন্ত্যতিকৃচ্ছ্রেণ প্রায়ঃ প্রাণান্ কথঞ্চন ॥"

ভাঃ ১০।৪৬।৬

"কথঞ্চন" কোনও প্রকারে, বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীকৃষ্ণ যে ব্রজ হইতে অক্রুর-রথে আসিবার কালে 'আবার শীঘ্র আসিব' এই আশা দিয়া আসিয়াছেন, সেই আশায় বুক বাঁধিয়া কোনমতে আছে তাহারা। শ্রীকৃষ্ণ সত্যসংকল্প হইয়াও যে ঐ কথা রক্ষা করেন নাই, সে বিষয়টা উদ্ধবকে বলিতে যেন সঙ্কুচিত হইতেছেন, তাই বলিলেন—কথঞ্চন—কোনও মতে। শেষে আর ঐ কথা গোপন করা সঙ্গত নয় মনে করিয়া বলিলেন "প্রত্যাগমনসন্দেশৈঃ" আমি আবার ব্রজে ফিরিব এই আশ্বাসবাক্যে আস্থা স্থাপন করিয়া তাহারা অতিকষ্টে জীবন ধারণ করিয়া রহিয়াছে।

ব্রজবধূগণ পরবধূ। তাহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি এত অনুরক্তা, আর শ্রীকৃষ্ণও তাহাদিগের প্রতি এত নিবিড়ভাবে আকৃষ্ট। এই সংবাদটি শ্রীমান্ উদ্ধবকে বলিয়া বক্তা যেন একটু অসুবিধায় পড়িলেন। গোপী-কৃষ্ণের তাত্ত্বিক সম্বন্ধটি না জানিলে ঐ ব্যাপারে ভক্তের চিত্তে বিপরীত ভাবের ছায়াপাত হইতে পারে। (যেমন ভাগবতকথা শুকমুখে শুনিয়া পরীক্ষিত রাজার

হইয়াছিল)। শ্রীকৃষ্ণ তাই ব্রজবল্লবীগণের সঙ্গে স্বকীয় তাত্ত্বিক সম্বন্ধটিও উদ্ধবকে শুনাইতেছেন ঃ—

"বল্লব্যো মে মদাত্মিকাঃ ॥" ভাঃ ১০।৪৬।৬

ব্রজবল্লবীগণ আমারই আত্মা। তত্ত্বদৃষ্টিতে আমরা একই আত্মা। লীলা আস্বাদনের নিমিত্ত আমাদের দেহভেদমাত্র। আমি কৃষ্ণ পরমাত্মাস্বরূপ—পরব্রহ্মেরও প্রতিষ্ঠা, ঘনীভূত-মূর্ত্তি, আর গোপিকাগণ আমার অন্তরঙ্গা শক্তি। শক্তি আর শক্তিমান, অগ্নি আর দাহিকাশক্তি যেমন পৃথক্ কিছু নয়, সেইরূপ আমি ও গোপিনীগণ পৃথক্ কিছু নয়। তত্ত্বতঃ আমরা অভিন্ন। ভেদ যাহা দৃষ্ট হয় তাহা আমাদিগকে প্রেম-রস-নির্যাস আস্বাদন করাইবার জন্য যোগমায়া কর্ত্তৃক সৃষ্ট মাত্র। কবিরাজ গোস্বামীর নিরুপম ভাষায়—

"মো বিষয়ে গোপীগণ উপপতি ভাবে।
যোগমায়া করিবেন আপন প্রভাবে ॥
আমিহ না জানি না জানে গোপীগণ।
দোঁহার রূপ গুণে নিত্য দোঁহার হরে মন ॥"

শ্রীকৃষ্ণের এই সকল গম্ভীরার্থপূর্ণ অথচ বেদনাভরা কথা শুনিয়া উদ্ধব মহাশয় বৃন্দাবনে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

॥ পাঁচ ॥

শ্রীমান্ উদ্ধব প্রস্তুত হইলেন ব্রজে যাইবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের আদেশ শিরে লইয়া। সখার অঙ্গ স্পর্শ করিয়া কহিলেন উদ্ধব,— "প্রিয়! তুমি যন্ত্রী, আমি যন্ত্র। যন্ত্রী যেমন নিজগুণেই যন্ত্রে তোলে সুরের ঝঙ্কার, তেমনি তুমিই করাইয়া লইবে আমাদ্বারা তোমার মনোমত কার্য্য।"

তারপর শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে সঙ্গে লইয়া গেলেন দাদা বলরামের কাছে। "ব্রজে পাঠাইতেছি উদ্ধবকে আমাদের সংবাদ দিতে," কহিলেন শ্রীকৃষ্ণ অগ্রজকে। অনুমোদন করিলেন সানন্দে সে-কার্য্য শ্রীবলদেবচন্দ্র। প্রণতঃ হইলেন উদ্ধব। আশিস্ দিলেন তাঁহার শিরে হাত দিয়া।

জননী রোহিণীর কাছে শ্রীকৃষ্ণ গেলেন তারপর উদ্ধবকে সাথে লইয়া। বলিলেন মাকে মনের সঙ্কল্প। রাঙা হইয়া উঠিল রোহিণী মায়ের বদনমণ্ডল ব্রজের কথা স্মরণে আসিতেই। কহিলেন মা অশ্রুগদ্‌গদ কণ্ঠে, "ব্রজেশ্বরী যশোদাকে সান্ত্বনা দিবে প্রতিনিধি পাঠাইয়া? তাও কি সম্ভব, বাছা?" "সবই ত জানো মা, উপায় কী"—বলিতে বলিতে রুদ্ধ হইয়া আসিল শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠও। পদধূলি লইলেন শিরে উদ্ধব রোহিণী জননীর তাঁহার সম্মুখে নতজানু হইয়া। স্নেহপূর্ণ শ্রীকরে স্পর্শ করিলেন রোহিণীমাতা উদ্ধবের নত মস্তক।

তৎপর শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে সাজাইয়া দিলেন নিজ শ্রীহস্তে নিজ অঙ্গের আভরণ ও পুষ্পমালিকা খুলিয়া লইয়া। উদ্ধবের অঙ্গ-

প্রত্যঙ্গ আনন্দে যেন জড়তা প্রাপ্ত হইল প্রিয়সখার স্নেহভরা আদর ও মধুভরা স্পর্শ পাইয়া।

ব্রজে যাইতেছেন উদ্ধব কৃষ্ণের কার্য্যে মনের আনন্দেই, কিন্তু কিছু কিছু দুঃখও আছে অন্তরের গভীর তলদেশে, শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ-সুখে ও সেবা-সুখে বঞ্চিত থাকিবেন, যে কয়দিন থাকিতে হইবে দূরে ঐ কার্য্যানুরোধে। অন্তর বুঝিয়াছেন অন্তরদেবতা প্রিয় উদ্ধবের। বলিলেন প্রিয় উদ্ধবকে "ব্রজে গেলে সঙ্গহারা হইবে আমার, এই আশঙ্কা করিও না উদ্ধব। আমি ব্রজেই আছি অনাদিকাল। কুত্রাপি ব্রজছাড়া নই। এখানে আমার যেন একটা টুক্‌রা পড়িয়া আছে—গোটা আমি ব্রজবনেই আছি। ব্রজে আমাকে পাওয়াই ঠিক পাওয়া। তুমি আমাকে হারাইতে যাইতেছ না,—পাইতে যাইতেছ উদ্ধব। আর আমার সেবার কথা ভাবিতেছ? আমার সেবাই আমার সেবা নহে। আমার প্রিয়জনদের সেবাই আমার প্রকৃষ্ট সেবা। আমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রিয়জনদের সেবায় যাইতেছ তুমি। আর বড় সেবা নাই আমার ইহা অপেক্ষা উদ্ধব।" প্রিয়ের আদরমাখা কথায় সকল বেদনা ঘুচিয়া গেল উদ্ধবের অন্তরের।

পদব্রজেই যাইবেন কৃষ্ণতীর্থে, উদ্ধবের সাধ। যান-আরোহণে তীর্থ-দর্শন শাস্ত্রবিধি নয়। কিন্তু পায়ে হাঁটিয়া গেলে দেরী হইবে যে অনেক, তাহা সহ্য হয় না শ্যামসুন্দরের। "না ভাই, তোমার রথেই যাইতে হইবে"—বলেন শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবের পৃষ্ঠে হস্ত দিয়া। কৃষ্ণের আদেশে রথ সাজিয়া আসিয়াছে। খালি রথ চালাইতেছে সারথি। সঙ্গে সঙ্গে পায়ে হাঁটিয়া চলিতেছেন

উদ্ধব যতক্ষণ শ্রীকৃষ্ণ অগ্রসর হইতেছেন সাথে সাথে কথা বলিতে বলিতে।

"কোন্ পথে যাইবে তুমি, উদ্ধব! দুই পথে যাওয়া যায়। আমি যে পথ দিয়া বলি সেই পথ ধরিয়া যাও, আরামেও যাইবে শীঘ্রও যাইবে। খানিকটা যমুনার তীর ধরিয়া যাইবে, তৎপর উত্তুঙ্গ তীরান্তভূমি ত্যাগ করিবে—

"মুঞ্চোত্তুঙ্গাং মিহিরদুহিতুর্ধীরতীরান্তভূমিম্।"

তীর্থরাজ ব্রহ্মহ্রদকে দক্ষিণে রাখিয়া চলিবে "মুঞ্চাসব্যে··· তীর্থরাজম্"। তারপর সম্মুখে পড়িবে অন্নভিক্ষাস্থলী। ওখানে আমি অন্ন পাই নাই ব্রাহ্মণদের কাছে ভিক্ষা চাহিয়া। তাঁহারা হইয়া রহিয়াছেন আমার প্রিয়দের অপ্রিয়ভাজন। তথাপি তাঁহারা পূজ্যজন। তাঁহাদের দুয়ারে রথ রাখিয়া প্রণাম করিয়া যাইও।

নিরন্তর আমার গুণকীর্ত্তন করেন যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ-পত্নীরা "গায়ন্তীনাং মদনুচরিতং তত্র বিপ্রাঙ্গনানাং"। তাঁহাদের দর্শন করিবার সাধ যদি তোমার না জাগে তাহা হইলে বলিব তোমার নয়ন-ধারণই বৃথা। (আলোকায় স্পৃহয়সি নচেৎ ঈক্ষণৈর্ব্বঞ্চিতোহসি)।

তারপর "সাটিকরা" (সট্টিকারণ্যং) ফুল-বাগানের মধ্য দিয়া চালাইয়া যাইবে রথ। ঐ বনেই আমি ক্রীড়াকালে শ্রীদামকে গরুড়ের ন্যায় বাহন করিয়া উঠিয়াছিলাম তাহার পৃষ্ঠে। (শ্রীদামানাং সুভগ গরুড়ীকৃত্য যত্রাধিরূঢ়ঃ) সাটিকরা গ্রাম

অতিক্রম করিয়া চলিয়া যাইও আমার গোষ্ঠক্রীড়াভূমির মধ্যবর্ত্তী পথ ধরিয়া। গোষ্ঠাঙ্গনে দেখিতে পাইবে, গোপবালকেরা গোবৎসগণের পুচ্ছ ধরিয়া ছুটিতেছে। আবার বৎসগণও ছুটিতেছে বালকগণের হস্ত হইতে মুক্তপুচ্ছ হইয়া "ধাবদ্ বালাবলি-করতল-প্রোচ্চলদ্ বালধীনাং"। বাছুরগুলির গাত্র স্ফটিকের মত শুভ্রোজ্জ্বল। তাহারা নবতৃণাঙ্কুর আঘ্রাণ করিয়া ত্যাগ করিতেছে। তাহাদের উল্লম্ফনাদি চঞ্চলতা দর্শন করিও রথ দাঁড় করাইয়া। দর্শন করিতে ভুলিও না আমার সখাগণকে, দেখিও তাহারা সকল সময়ই ক্রীড়া করিতেছে শ্রেণীবদ্ধভাবে। অনুকরণ করিতেছে যথাক্রমে আমার লীলাবিহার।

উদ্ধব, লক্ষ্য করিও আমার সখাদের। তাহাদের আমার বিরহানুসন্ধান নাই। তাহাদের সখ্যরস বিশ্রম্ভপ্রধান। আমার স্ফূর্ত্তিতেই তাহাদের সাক্ষাৎকার বোধ হয়। তাহাদের আবেশে আঘাত করিও না, বিন্দুমাত্রও না। আমার জননীদের আর গোপিনীদের অনুরাগ অন্যরূপ। তাহা হইল উৎকণ্ঠাপ্রধান। তাঁহারা পাইয়াও মনে করেন পাই নাই। কোলে লইয়াও কোথায় গেল বলিয়া কাঁদেন।

উদ্ধব, তারপর তোমার রথ বরাবর গিয়া পৌঁছিয়া যাইবে নন্দীশ্বর পর্ব্বতের সানুদেশে। তখন যে কি অবস্থা হইবে, ভাবিয়া পাই না। আমার সকল প্রিয়জনেরা ছুটিয়া আসিবে দ্রুতগতিতে—নিশ্চয় আমি আসিয়াছি, মনে করিয়া (মমাশঙ্ক্য স্ফুটমুপগতং); ভগ্নমনোরথ প্রিয়জনদের সন্নিধানে নিজ পরিচয় দিও তখন। বলিও—

"যঃ কালিন্দাবনবিহরণোদ্দামকামঃ কলাবান্
বৃন্দারণ্যান্নরপতিপুরং গান্দিনীয়েন নীতঃ।
কুর্ব্বন্ দৌত্যং প্রণয়-সচিবস্তস্য গোপেন্দ্রসূনোঃ
দেবীনাং বঃ সপদি সবিধং লব্ধবানুদ্ধবোঽস্মি॥"

—যমুনার তীরে বনবিহারে নিয়ত অভিলাষ করেন যিনি—নিরন্তর দীর্ঘনিঃশ্বাসপাতে বিমলিন হইয়াছে মুখখানি যাঁহার, অক্রূর যাঁহাকে লইয়া গিয়াছে ব্রজ হইতে মথুরায়, সেই নন্দ-নন্দন কৃষ্ণচন্দ্রের আমি প্রণয় সচিব। আমার নাম উদ্ধব। আসিয়াছি দৌত্যকার্য্যে। এই বলিয়া পরিচয় দিও।

উদ্ধব, ব্রজের সেই ভ্রমর-চুম্বিত বিটপীবৃন্দের কথা মনে পড়িতেছে। তুমি একটিবার হাত তুলিয়া আমার প্রাণভরা আশিস্ তাহাদের জানাইও "শস্তাশিষাং মে বৃন্দং বৃন্দাবন-বিটপিষু"। ব্রজের ধেনুগণের কুশল জিজ্ঞাসা করিও (ক্ষমাং পৃচ্ছে) আমার নাম ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে। ওরা সব নিজ নিজ বৎসের প্রতি স্নেহ ছাড়িয়া অশ্রুব্যাপ্ত নয়নে আমার গাত্রলেহন করিত। আর আমার মাতৃস্বরূপা গাভীগণের প্রতি আমার প্রণাম জানাইও। আমি তাহাদের স্তন্যামৃত পান করিয়াছি সম্বৎসর ধরিয়া ব্রহ্মা গোবৎসসমূহ চুরি করিয়া লইলে "স্তন্যং যাসাং মধুরমধয়ং বৎসরং বৎসলানাম্"।

নন্দ বাবার চরণ ধরিয়া "কৃষ্ণ আপনাকে প্রণাম জানাইতে-ছেন" "নামগ্রাহং মম" এই বলিয়া সম্যক্‌রূপে বন্দনা করিও। তখন তাঁহাকে ফিরাইয়া দিয়াছিলাম কত শপথ দিয়া মথুরা হইতে। তখনকার তাঁহার মুখখানি মনে পড়িলে বুক ফাটিয়া যায়।

অহো! আমার মা যশোদা অন্তর্নিহিত চিন্তাগ্নিতে মলিন-বদনা কৃশতনু হইয়াছেন "অন্তশ্চিন্তাং বিলুলিতমুখীং হা মদেক-প্রসূতিং"; তাঁহার পদযুগল বন্দনা করিও উদ্ধব, আমার নাম উল্লেখ করিয়া। নিরন্তর হাহাকার করিতেছেন ব্রজেশ্বরী মা আমার। মথুরার রাজপথের দিকে নয়ন দু'টি বিন্যস্ত করিয়া "পুরীবত্ম'বিন্যাসনেত্রা" বসিয়া আছেন, আজই আমি ব্রজধামে আসিব এই আশায়। নয়ন হইতে উদ্গীর্ণ জলধারায় সিক্ত হইতেছে মায়ের বসন।" কথা বলিতে বলিতে যশোদানন্দনেরও নয়ন হইতে ধারা বহিতে লাগিল। বহু কষ্টে ধৈর্য্য ধরিয়া ব্রজবিহারী আর একটি কথা কহিলেন—"উদ্ধব, নিদাঘে শুকাইয়া যায় সরোবরের জল। তখন জলের কূর্ম্মগুলি থাকে গিয়া কোনমতে কাদার তলে আশ্রয় লইয়া। আমার বিরহতাপ ব্রজের প্রবল গ্রীষ্ম, তাহাতে একেবারে শুষ্ক হইয়া গিয়াছে গোপী-সরসীর জল। তাঁহাদের প্রাণ-কূর্ম্মগুলি কোনমতে প্রাণে বাঁচিয়া আছে 'কেবল আমি আসিব' এই আশা-কাদার তলে মাথা গুঁজিয়া "যাসামাশামৃদমনুসৃতাঃ প্রাণকূর্ম্মা বসন্তি"। কি ভাবে যে আছেন তাঁহারা তাহা বলিবার ভাষা নাই আমার ভাণ্ডারে।"

কহিতে কহিতে তীব্র বিরহতাপে ব্রজসুন্দরের তপ্ত অশ্রুও শুকাইয়া গেল। পথ চলা বন্ধ হইল, দাঁড়াইয়া গেলেন। জলভরা মেঘের মত বদনখানি দেখিয়া সহ্য করিতে না পারিয়া উদ্ধব উঠিয়া বসিলেন রথে। রথ চলিতে লাগিল ব্রজাভিমুখে। ভাবিতে লাগিলেন উদ্ধব, যাঁহাদের জন্য এত কাতরতা স্বয়ং কৃষ্ণের, কত প্রেমবান্ না জানি তাঁহারা। সামর্থ্য কি হইবে

আমার সান্ত্বনা বাক্য বলিতে তাঁহাদের প্রতি! আবার ভাবিতে লাগিলেন, হয়ত হইবে,—আমাকেই যখন পাঠাইলেন যোগ্য মনে করিয়া। ভাবনার দোলায় দুলিতে লাগিল উদ্ধব মহারাজের মনটি। ফিরিয়া ফিরিয়া দেখিতে লাগিলেন—দণ্ডায়মান সখাকে আর তাঁহার বর্ষণোন্মুখ বদনটি।

সজল চোখে দাঁড়াইয়া রহিলেন ব্রজমুখে মথুরাবিহারী। যতক্ষণ উদ্ধবের রথের ধ্বজা দেখা যায় ততক্ষণই। অদম্য ইচ্ছা জাগে প্রাণে—ছুটিয়া যান উদ্ধবের সঙ্গে। কিন্তু পারেন কই? প্রীতির সহজ প্রভাবে নীতির শক্ত বাঁধ বাধা সৃষ্টি করে। দ্বন্দ্বাতীতের দ্বন্দ্ব—শোকাতীতের শোক। পূর্ণানন্দের বিলাপ। ভগবানের ভক্তবিরহ। ইহাই মাধুর্য্য-রসের ঘনায়িত মূর্তি।

॥ ছয় ॥

অগ্রসর হইতে লাগিলেন ক্রমে ক্রমে ব্রজের দিকে শ্রীমান্ উদ্ধব। ভাবিতে লাগিলেন পথে পথে ব্রজ ও ব্রজবিরহী মাধবের কথা। মাধব চিন্তা করিতে লাগিলেন উদ্ধবের কথা। ব্রজে যাইতেছেন আমার পরম প্রিয় উদ্ধব। কতই না শোভাসম্পদ্ আমার ব্রজভূমির, আজ সব বিমলিন আমাবিহনে। বেদনা দেখা দিল ভাবময় গোবিন্দের অন্তরে—এই কথা ভাবিতে যে বঞ্চিত থাকিবে উদ্ধব আমার 'স্বপদরমণ' শোভাময় বৃন্দাবনের নিরুপম সৌন্দর্য্য দর্শনে। শ্রীকৃষ্ণসংযুক্ত ব্রজের উৎসাহানন্দময় শোভা-সম্পদ্ দর্শন করিয়া ধন্য হউক উদ্ধব—ইহা ঐকান্তিকভাবে ইচ্ছা করিতে লাগিলেন ইচ্ছাময় লীলানায়ক শ্রীশ্যামসুন্দর।

যোগমায়াদেবী অঘটনঘটনপটীয়সী। ইনি শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা-শক্তিরই অপর নাম। ভগবদিচ্ছাকে রূপায়িত করা ইহার মুখ্য কার্য্যের অন্যতম। ব্রজের স্বাভাবিক শোভা প্রকট করিলেন তিনি শ্রীমান্ উদ্ধবের নয়নগোচরে। তাঁহার দৃষ্টির অগ্রে ভাসমান হইয়া উঠিল সেই সৌন্দর্য্য—যাহা পরম উল্লাসময় ব্রজে সর্ব্বত্র সুব্যক্ত ছিল শ্রীকৃষ্ণের ব্রজবিহারকালে। নিত্য-ভূমির প্রত্যেকটি অবস্থাই সমভাবে নিত্যত্ববিশিষ্ট। যখন যেটি ইচ্ছা ব্যক্ত করিতে পারেন লীলাশক্তি যোগমায়া। উদ্ধব ডুবিতে লাগিলেন আনন্দের সৌন্দর্য্যসমুদ্রে আপনাকে হারাইয়া গিয়া।

কোন বস্তুর সত্তামাত্রই তৎসম্ভোগে হেতু হয় না। ভোগ-যোগ্যতা থাকা চাই অন্তরে। সেইকালে ব্রজ-মাধুর্য্য আস্বাদনে সম্পূর্ণ যোগ্য হইয়াছে উদ্ধবের অন্তরখানি। যারা দাস তাহাদের শ্রেষ্ঠ সম্পদ হইল প্রভুর সেবা। আজ প্রভুর সেবাকার্য্যে চলিয়াছেন শ্রীমান্ উদ্ধব। প্রভুর সেবাতেই দাসের কৃতার্থতা। তাহাতে আবার আদেশ পাইয়া সেবা লাভ। তাহাতে আবার ব্রজবাসিগণের দর্শনলাভ ও সেবা করিবার সৌভাগ্য। কৃতার্থতার গভীর অনুভূতির উজ্জ্বলতা উদ্ধবের মুখে-চোখে। এই আন্তর প্রফুল্লতা পরম সহায়ক হইয়াছে তাহার ব্রজ-সৌন্দর্য্য দর্শনে।

ব্রজদর্শনের জন্য উদ্ধবের উৎকণ্ঠা পূর্ব্ব হইতেই প্রাণে ছিল। উহা তীব্রতা প্রাপ্ত হইয়াছে শ্রীকৃষ্ণের আদর-মাখা আবেগভরা আদেশে। ব্রজের প্রত্যেকটি বৃক্ষলতা শ্রীকৃষ্ণের লীলামধুরিমা উদ্দীপন করিতে লাগিল উদ্ধবের অন্তরে শ্রীব্রজে প্রবেশ করিবা-মাত্রই। প্রাণভরা অনুভূতিই লইয়া উদ্ধব ভাবিতেছে—অহো! এই সেই ব্রজভূমি, যেথায় নিত্য বিহার করেন বনবিহারী! এই সেই বনবীথি যেখানে রঙ্গে ভঙ্গে নৃত্য করিয়াছেন সখাগণের কণ্ঠ ধরিয়া ব্রজসুন্দর। এই বৃক্ষতলে উপবেশন করিয়াছেন রবিক্লান্ত হইয়া। এই ছায়াকুঞ্জে পল্লব-শয্যায় বিশ্রাম করিয়াছেন ক্রীড়াশ্রান্ত হইয়া।

এই নীপমূলে ললিতঠামে দাঁড়াইয়া বেণু বাজাইয়াছেন ধেনুর নাম ধরিয়া মধুর পঞ্চম তানে। এই বৃক্ষরাজির স্নিগ্ধ ছায়ায় পুলিনে ভোজন করিয়াছেন প্রিয় বয়স্যগণে পরিবেষ্টিত হইয়া।

ধন্য ব্রজের তরুলতা গিরিবন। দুর্লভ পাদপদ্ম স্পর্শ করিয়াছে ইহারা কত অনুরাগ লইয়া। ইহাদের সান্নিধ্যে আজ আমিও ধন্য, ভাবিলেন উদ্ধব মহারাজ।

দেখিতে লাগিল উদ্ধবের লোলুপ নয়ন অসংখ্য লতা-কানন, পুষ্পফলে পরিশোভিত, আমোদিত প্রাণভরা গন্ধে। প্রতি ফুলে ফুলে ভ্রমরের গুঞ্জন, প্রতি শাখায় শাখায় কোকিলের কাকলী,—'সর্ব্বতঃ পুষ্পিতবনং দ্বিজালিকুলনাদিতম্।' কত শত দীর্ঘিকা, তাহাতে রাশি রাশি ফুটন্ত পঙ্কজের নিরুপম শোভা, সৌরভে দিঙ্মণ্ডল মাতোয়ারা। হংস, কারণ্ডব প্রভৃতি জলপাখীগণের উল্লাসধ্বনিতে সরোবরসমূহ মুখরিত—'হংসকারণ্ডবাকীর্ণৈঃ পদ্মষণ্ডৈশ্চ মণ্ডিতম্।

উদ্ধব দর্শন করিলেন—উধোভারাক্রান্ত গাভীগণ ছুটিতেছে নিজ নিজ বৎসগণের প্রতি। শ্বেতবর্ণের বৎসগণ সানন্দে ইতস্ততঃ লাফাইয়া লাফাইয়া দৌড়াদৌড়ি করিতেছে। উদ্ধব শুনিলেন—চারিদিকে গোদোহনের শব্দ। 'বাছুরী ছাড়িও না' 'গো-দোহনের ভাণ্ডটী দেও', 'এই দুধভরা ভাণ্ডটি লইয়া যাও', 'এই দড়ি ধর' 'তাড়াতাড়ি কর', ইত্যাদি নানাবিধ শব্দে গোষ্ঠ মুখরিত "গোদোহশব্দাভিরবৈঃ"। উদ্ধব দেখিলেন—গৃহে গৃহে হোমানুষ্ঠান, অগ্নি ও সূর্য্যদেবতার পূজা। নব নব তৃণগ্রাস দিয়া গাভীগণের আপ্যায়ন। মধুর বচন ও সৎকার দ্বারা অতিথি ব্রাহ্মণ, পিতৃলোক ও দেবলোকের আরাধনা "অগ্ন্যর্কাতিথিগোবিপ্র-পিতৃদেবার্চ্চনান্বিতৈঃ"।

উদ্ধবের নয়নপথে পড়িল ব্রজের প্রত্যেকটি ঘর দুয়ার ফুলের দ্বারা সুসজ্জিত। প্রত্যেক গৃহমধ্যে উজ্জ্বল প্রদীপের শোভা, প্রাণ মাতানো ধূপের গন্ধ।

"ধূপদীপৈশ্চ মাল্যৈশ্চ গোপাবাসৈর্ম্মনোরমম্" ১০।৪৬।১২

যে দিকে দৃষ্টি পড়ে উদ্ধবের সেই দিকই মনোরম। গোপ-বালকগণ উল্লাসে নাচিতেছে, কেহ শিঙ্গা বাজাইতেছে, কেহ বেণু-বাদন করিতেছে—(বেণুনাং নিঃস্বনেন চ)।

যখন পৌঁছিয়া গেলেন উদ্ধব ব্রজে, তখন সূর্য্যদেব অস্তাচল-গামী (নিম্লোচতি বিভাবসৌ)। তখন যূথে যূথে ধেনুগণ ব্রজে প্রবেশ করিতেছে বন-খেলা শেষ করিয়া। তাহাদের খুরের সঞ্চালনে ব্রজের পথের ধূলি শূন্যে উড়িতেছিল। সেই ধূলিপটলে উদ্ধব মহাশয়ের রথখানি সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল।

"ছন্নযানঃ প্রবিশতাং পশূনাং খুরেণুভিঃ"

১০।৪৬।৮

গোধূলিকালের গোখুররেণুজালে ধূসরতনু উদ্ধব তাহাতে ধন্য মনে করিলেন আপনাকে। শ্রীকৃষ্ণের চরণ-চুম্বিত ধূলির বাতাসে উদ্ধবের দেহ আনন্দে কণ্টকিত। ব্রজবন যেন তাঁহাকে স্বাগত জানাইল ধূলিমাখা হস্তে। ব্রহ্মাদিবাঞ্ছিত রজঃকণিকা শিরে লইয়া উদ্ধবের যেন সকল অন্তরায় ও অযোগ্যতার বাধাবিপত্তি চিরতরে দূর হইয়া গেল। সন্ধ্যার অন্ধকারে ধূলিসমাচ্ছন্ন উদ্ধব ও তাঁহার রথ তখন কাহারও দৃষ্টিপথে পড়িল না। আগেই অন্য দশ জনের সঙ্গে দেখা হইলে উদ্ধবের বিলম্ব হইবে নন্দরাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে। লীলাশক্তির ইচ্ছাতেই এত সব ঘটিল।

লীলাশক্তি যোগমায়া লীলাপুষ্টির জন্য আজ প্রথমতঃ শ্রীকৃষ্ণ-সংযুক্ত ব্রজকাননের আনন্দ উৎসবপূর্ণ প্রকাশটি শ্রীমান্ উদ্ধবকে দেখাইলেন। দুঃখময় ব্রজের বিরহবিধুর প্রকাশটি রাখিলেন গোপন করিয়া। তারপর দেবদর্শনের পূর্ব্বে যেরূপ তীর্থজলে স্নান করিতে হয়, তদ্রূপ নন্দরাজার সন্দর্শনের পূর্ব্বে ব্রজের ধেনুখুরোত্থিত ধূলিজালে উদ্ধবকে পরিস্নাত করাইলেন।

ব্রজরাজ নন্দের দ্বারস্থ হইল উদ্ধবের রথ। তখনও ধূলির বাতাসে তাহা পড়িল না কিন্তু, লোকজনের চক্ষে। অবতরণ করিলেন রথ হইতে উদ্ধব মহাশয়—বসিয়া পড়িলেন একটি মর্ম্মর বেদিকার উপর কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া। ঐ বেদিকা ছিল ব্রজরাজের অন্তঃপুর-সম্মুখবর্ত্তী পুষ্পোদ্যানের মধ্যস্থলে। ক্রমে গোগণ গৃহে প্রবেশ করায় ধূলিমলিনতাশূন্য হইয়া উঠিল গগন-মণ্ডল। অন্ধকারও গাঢ় নহে। গতাগতি পথে গোপগণের দৃষ্টিতে পড়িলেন উদ্ধব। তাঁহারা আনিলেন ব্রজরাজের গোচরে অপরিচিতের আগমন সংবাদ।

মিলিত হইলেন উদ্ধবের সঙ্গে স্বয়ং নন্দরাজ বহিঃপ্রদেশে আগমন করিয়া। প্রণত হইলেন উদ্ধব নন্দরাজের পদপ্রান্তে। সিক্ত করিয়া দিলেন নন্দরাজ উদ্ধবের ধূলিধূসর দেহখানি নিজ নয়নের অফুরন্ত ধারাপাতে। আনিয়া বসাইলেন নিজ গৃহ-প্রকোষ্ঠে। সৌজন্যে অভিভূত উদ্ধব বসিলেন উদ্বেলিত হৃদয়ে।

গৃহমেধীর শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য গৃহাগত অতিথিকে সেবা করা। অতিথি উদ্ধব ক্ষুধায় অবসাদ প্রাপ্ত না হন, এই ভাবনা প্রবল হইয়া উঠিল ব্রজরাজের মনে। সেবা করিবেন উদ্ধবকে কি বস্তু

দ্বারা ; কিছুই নাই নন্দরাজ-গৃহে। যেদিন হইতে ব্রজ ছাড়িয়াছেন ব্রজ-জীবন অক্রূরের রথে চাপিয়া, সেইদিন হইতে আহার-নিদ্রাদি দেহধর্ম নাই ব্রজবাসী গোপগোপীগণের কাহারও। পাকের ঘরগুলি সাক্ষ্য দেয় তাহাদের চরম দুর্দ্দশার। পাকের ভাণ্ড বাসন মাজা হয় নাই। গৃহগুলি লেপন করা হয় নাই। আঙ্গিনায় ঝাড়ু পড়ে নাই। উনুনগুলিতে মাকড়সা জাল বুনিয়াছে। অমার্জ্জিত, অলিপ্ত, ধূলকঙ্কর-সমাচ্ছন্ন, লূতাতন্তুব্যাপ্ত পাকশালাগুলি কৃষ্ণবিরহের এক নিদারুণ প্রতিচ্ছবি।

তখন গ্রাম-প্রান্তবর্ত্তী এক বিপ্রগৃহ হইতে করাইয়া আনিলেন কিছু পরমান্ন নন্দমহারাজ লোক পাঠাইয়া। মিষ্টিবিহীন পরমান্ন দুগ্ধে সিদ্ধ করা তণ্ডুল মাত্র। পথক্লান্ত উদ্ধবের উদরে ক্ষুধা ছিল। যাহাই পাইলেন অমৃত-তুল্য আস্বাদন করিলেন। তৎপর ব্রজরাজ উদ্ধবকে শয্যায় শয়ন করাইলেন ও ভৃত্য দ্বারা পাদসংবাহন করাইলেন।

ভোজিতং পরমান্নেন সংবিষ্টং কশিপৌ সুখম্।
গতশ্রমং পর্য্যপৃচ্ছং পাদসংবাহনাদিভিঃ॥ ১০।৪৬।১৫

———

॥ সাত ॥

কুশল প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করিতে নন্দরাজ আসিয়া বসিলেন উদ্ধবের সন্নিধানে। কৃষ্ণের কথা ছাড়া আর কোন কথা অন্তরে নাই নন্দরাজের। কিন্তু ঐকথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস হয় না। কি প্রশ্ন করিয়া কি অপ্রিয় উত্তর শুনিতে হয় এই এক ভয়, আর এক ভয়, নিজের কথা ভাবিয়া বিরহদুঃখ বৃদ্ধি আশঙ্কায়। তাই কৃষ্ণ কেমন আছে জিজ্ঞাসা না করিয়া নন্দরাজ বসুদেবের কুশল প্রশ্ন করিলেন।

নন্দরাজ বলিলেন—আমার সখা বসুদেব কেমন আছেন হে উদ্ধব? উদ্ধব, তোমরা আমার পর নও। তোমার পিতা ও আমি ও বসুদেব এক পিতামহের সন্তান। আমাদের পিতামহ দেবমীঢ় দুই বিবাহ করিয়াছিলেন। ক্ষত্রিয় পত্নীর ঘরে জন্মেন দেবভাগ ও বসুদেবের পিতা শূর, আর বৈশ্যা মাতার পুত্র আমার পিতা পর্জন্য। বসুদেব কেবল আমার ভাই নয়, খেলার সাথী—ছেলেবেলায় কত একসঙ্গে খেলিয়াছি মাঠে ঘাটে। পুত্র-কন্যাগণসহ বসুদেবভাই কুশলে আছেন তো? তাঁহার সব সুহৃদ্‌গণ, যাঁহারা কংসভয়ে ভীত হইয়া নানা দেশ-বিদেশে ছদ্মবেশে ঘুরিতেছিলেন, তাঁহারা কি সম্প্রতি মিলিত হইয়াছেন মথুরায় আসিয়া?

আহা! বসুদেব ভাই আমার কত কষ্টই না পাইয়াছেন সুদীর্ঘকাল ধরিয়া দুষ্ট কংসের কারাগারকক্ষে। সম্প্রতি সেই দুঃখ হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। সৌভাগ্যের কথা পাপাচারী

কংস মরিয়া গিয়াছে অনুজবর্গের সহিত। নিজের পাপাগুনেই নিজে পুড়িয়াছে। পুড়িবেই—সজ্জনের উপর অত্যাচার চালায় যাহারা, অনিবার্য্য তাহাদের মরণ। সদাচারী যাদবকুলের উপর কী অমানুষিক দৌরাত্ম্যই না করিয়াছে! সেই মহাপাতকের ফলও ফলিয়াছে।

"দিষ্ট্যা কংসো হতঃ পাপঃ, সানুগঃ স্বেন পাপ্মনা।
সাধূনাং ধর্মশীলানাং যদূনাং দ্বেষ্টি যঃ সদা॥" ১০।৪৬।১৭

কংসের মৃত্যুর কথা বলিতেই নন্দরাজের কৃষ্ণের প্রসঙ্গ আসিয়া পড়িল। আর পারিলেন না চাপিয়া রাখিতে। বলিলেন, আচ্ছা উদ্ধব, জিজ্ঞাসা করি কৃষ্ণ আমার কি মথুরায় আছে? থাকিলে কোনো খবর পাই না কেন? পরম্পর শুনিয়াছি যজ্ঞোপবীত হইবার পর দুই ভাই নাকি সুদূর অবন্তীনগরে গিয়াছে গুরুগৃহে। কথা শুনিয়া আমার বুক ফাটিয়া যাইতেছে। গুরুগৃহে কঠোরতার কথা জানত উদ্ধব! ভিক্ষা করিতে হয়, যজ্ঞের সমিধ্‌ বহিতে হয়। আমার দুধের বালক, যে দণ্ডে খায় দশবার, তার উপর গুরুগৃহের কঠোরতা; অত কাঠ কাটা, পায়ে হাঁটা তপশ্চর্য্যার নির্য্যাতন কি কৃষ্ণের সাজে?

আমি ওকথা বিশ্বাস করি নাই উদ্ধব। আমার ভাই বসুদেব এত বিচারহীন নির্দ্দয় নিশ্চয়ই নয় যে কৃষ্ণের মত বালককে গুরুগৃহের তপস্যাচরণে পাঠাইবে। আচ্ছা, যদি দিয়াই থাকে সম্প্রতি কি মথুরায় আসিয়াছে ফিরিয়া? সেই নবজলধর বরণ গোপাল কি তাহার পরম স্নেহময়ী মায়ের কথা মনে করে? প্রিয় সুহৃদগণের অকৃত্রিম সৌহার্দ্দের কথা কি স্মরণে আছে? খেলুয়া

সখাগণের কথা কি তাহার একটিবারও হৃদয়ে জাগিয়া উঠে? যে গোপগণ তাহাকে কত আদরে স্নেহে কোলে তুলিত সেই গোপদের কথা কি মনে করে? যে ব্রজভূমিতে সে কত আনন্দে ক্রীড়াকৌতুকে বিচরণ করিত, সে ব্রজের কথা কি তার স্মৃতিপথে উদিত হয়? ধেনুগণকে কৃষ্ণ কত ভালবাসিত। নিত্য নিজ হাতে তৃণগ্রাস লইয়া প্রত্যেকটি গাভীকে খাওয়াইত। গাভীরাও তাহার দিকে পলকহারা দৃষ্টিতে তাকাইয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিত, অঙ্গ লেহন করিত। সেই গাভীগুলির কথা কি সে এখনও ভাবে? যে ব্রজবনে খেলিতে খেলিতে সে আহার নিদ্রা ভুলিয়া যাইত সেই ব্রজবিপিনের কথা কি সে একেবারে অন্তর হইতে মুছিয়া ফেলিয়াছে? যে গিরিরাজ গোবর্দ্ধনকে সে ছাতাটির মতন করিয়া ধরিয়াছিল, যে গিরি গাত্রে সর্ব্বত্র চরণচিহ্ন অঙ্কন করিয়া দিয়াছে সেই গিরি যে আজ তাহার বিরহে কেমন করিয়া কাঁদিতেছে তাহা অনুভব করিবার অবসর কি তাহার হয়?'

"অপি স্মরতি নঃ কৃষ্ণো মাতরং সুহৃদঃ সখীন্।

গোপান্ ব্রজঞ্চাত্মনাথং গাবো বৃন্দাবনং গিরিম্ ॥" ১০।৪৫।১৮

নন্দরাজ সকলের কথাই বলিয়াছেন, কেবল স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই আপনার কথা। আমাদের কৃষ্ণ কি আমাদের কথা ভাবে, এছাড়া আমি তাহার পিতা তাহার বিরহে যে মরণাপন্ন ইহা কি তাহার স্মরণেও আসে না? এই কথাটি নন্দরাজ বলিতে পারিতেছেন না। বলিতে বুক ফাটে, তাই সব বলিয়াও নিজের কথাটা না বলায় পুটপাকের মত হৃদয়টা অন্তরসন্তাপে দহ্যমান হইতে লাগিল।

নন্দরাজের কথা শুনিয়া ভাবিতেছেন উদ্ধব মহাশয়। নন্দ পিতা কী বলেন! কৃষ্ণের স্মৃতিশক্তি কি এতই কম যে এত অল্প সময় মধ্যে এই সব দ্রব্য ও ব্যক্তিদের কথা ভুলিয়া যাইবে? উদ্ধবের অন্তরের আশয় বুঝিয়া নন্দরাজ কহিলেন, উদ্ধব! কৃষ্ণ ছিল সরল শিশুটি, কোন চিন্তাভাবনা সে কোনদিন করিতে জানে না। আর আজ তার উপর কত চিন্তার চাপ। জরাসন্ধ মথুরার উপর দৌরাত্ম্য করিতে কৃতসংকল্প। সেই দৌরাত্ম্য হইতে কিভাবে রক্ষা করা যাবে যাদবগণকে, এই মহাচিন্তায় কৃষ্ণ ব্যাকুল। আর কংসের অত্যাচারে যে সকল যাদবেরা নানাদেশে গিয়া পলাতক হইয়াছিল, এখন তাহারা আসিতেছে ফিরিয়া একে একে। ইহাদের সকলের সুখস্বচ্ছন্দতা বিধানের জন্য কৃষ্ণ আমার মহা-বিব্রত। এতটুকু ছেলের উপর এত বড় চাপ—তাহার কি আর আমাদের কথা স্মরণ করিবার অবসর আছে?

উদ্ধব কহিলেন—"ব্রজরাজ, শ্রীকৃষ্ণের ধীশক্তি তো কম নহে। কিছুই তাঁহার ভুল হয় নাই। ব্রজের সব কথাই তিনি সর্ব্বদা স্মরণ করেন কৃতজ্ঞতার সহিত। আপনাদের স্মরণ করিতে তাঁহার যে অবস্থা হয় তাহা আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি।" নন্দরাজ বলিলেন, সত্যই কি তবে কৃষ্ণ আমাদের কথা স্মরণপথে আনে? যদি স্মরণেই থাকিবে—তবে আসিবে না কেন? যদি মনে পড়ে তবে কি না আসিয়া থাকিতে পারে? কৃষ্ণ আমাকে বিদায় দেবার কালে বলিয়াছিল—

"জ্ঞাতিং বো দ্রষ্টুমেষ্যামঃ বিধায় সুহৃদাং সুখম্।"

সুহৃদ যাদবগণের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধান করিয়া আপনাদিগকে

দর্শন করিতে যাইব। সেই দিন কি আর হইবে উদ্ধব? আর কি আসিবে গোকুলানন্দ গোকুলবাসী স্বজনের আনন্দ দিতে? একটিবার তাহাদিগকে দর্শন দিয়া কৃতার্থ করিতে?

"অপ্যায়াস্যতি গোবিন্দঃ স্বজনান্ সকৃদীক্ষিতুম্।" ১০।৪৬।১৯

ব্রজের নরনারী বালকবৃদ্ধ, উদ্ধব, কৃষ্ণবিরহে মণিহারা ফণীর মত পাগলপারা। ব্রজের সকল জনক জননীরা কৃষ্ণকে নিজ নিজ সন্তান অপেক্ষাও অধিক স্নেহ করেন। কৃষ্ণ তাঁহাদের প্রাণ-কোটি প্রিয়তম। ইঁহাদিগকে একটিবার দর্শন দিবার জন্যও তাহার আসা উচিত। এই ব্রজকে বিপদ্ আপদ্ হইতে সে কত শত প্রকারে রক্ষা করিয়াছে। আজ কৃষ্ণ আসিয়া তাঁদের সান্ত্বনা দিবে ইহাও আশা করি না। এমন প্রিয়জনেরা তাহার অভাবে কী যে অনির্বচনীয় দুরবস্থায় পড়িয়াছে তাহা একবার স্বচক্ষে দেখিবার জন্য আসা উচিত। বন্ধুজন রোগশয্যায় পতিত হইলে বন্ধুজনের আসিয়া দেখিয়া যাওয়া কর্ত্তব্য। আবার সেই রোগ যদি এমন হয় যে তাহার বাঁচিবার আর আশা থাকে না—তাহা হইলে ত সকল কাজ ফেলিয়াও আসিতে হয়। ব্রজবাসিগণের যে বিরহতাপ তাহা এতই তীব্র যে তাঁহারা আর বেশীদিন বাঁচিবে বলিয়া আশা করা যায় না। ইঁহাদের জীবন শেষ হইয়া গেলে আর ত দেখা হইতে পারিবে না। তখন তাঁহাদের জন্য মর্মাহত হইতে হইবে তাহাকেও। তাই বলি একটিবার আসিয়া শ্রীমুখখানি আমাদিগকে দেখাইয়া যাওয়া তাহার উচিত।

শ্রীকৃষ্ণের মুখের কথা বলিতে বলিতেই নন্দরাজের চক্ষু

বুজিয়া আসিয়া গণ্ড বহিয়া জলধারা বাহিতে লাগিল। মানসচক্ষে শ্রীমুখ দর্শন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন—'উদ্ধব, আমার গোপালের বদনের কি মধুরিমা! কি সুন্দর হাসিটি, কি সুন্দর নাসিকাটি, কি সুন্দর গণ্ড দু'টি, কি মনোহারী নয়নের দৃষ্টিখানি! আহা, আর কি জীবনে পাইব সেই হৃদয়জুড়ান মুখখানার দেখা!'

"কর্হি দ্রক্ষ্যাম তদ্বক্ত্রং সুনসং সুস্মিতেক্ষণম্।"

১০।৪৬।১৯

কৃষ্ণরূপের কথা বলিতে বলিতে নন্দরাজ আত্মহারা হইয়া গেলেন। কোন প্রকারে ধৈর্য্য ধারণ করিয়া নিজেকেই যেন সান্ত্বনা দিবার জন্য কৃষ্ণের গুণরাশি স্মরণ করিতে লাগিলেন। 'উদ্ধব, কৃষ্ণের গুণের কথা কত বলিব। পুত্র ত সকলেই পায়, এত গুণের পুত্র আর কার আছে? কালীদহ হ্রদ ছিল বিষময় হইয়া কালিয়নাগের বিষে, কৃষ্ণ তাহাকে তাড়াইয়া নির্বিষ করিয়াছে। নাগের মাথায় কৃষ্ণ কি মধুর নাচই নাচিয়াছিল। সকল প্রিয়জনেরা তদ্দর্শনে কতই আনন্দ লাভ করিয়াছিল। কালীয়দমনের দিন রাত্রে হ্রদের তীরে বনের মধ্যে আমরা যখন নিদ্রিত ছিলাম তখন হঠাৎ দাবাগ্নি জ্বলিয়াছিল। সকলেরই কষ্ট দূর করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া শ্রীকৃষ্ণ এ অগ্নি খাইতে আরম্ভ করিল। মনে হইল ব্রজজনের প্রতি কৃষ্ণের এত গভীর প্রীতি দেখিয়া অগ্নিদেব তাহার দাহধর্ম ত্যাগ করিয়া সুশীতল হইয়া গিয়াছিল।

কত বিপদ হইতে যে কৃষ্ণ বাঁচাইয়াছে তাহা আর কি বলিব। ইন্দ্রের ঝড়বৃষ্টি এমন প্রবলভাবে আরম্ভ হইয়াছিল যে, আমাদের

একেবারে নিশ্চিত মৃত্যু। কিন্তু অদ্ভুতভাবে কৃষ্ণ বাঁচাইয়া দিল সবাইকে।

'দাবাগ্নের্ব্বাতবর্ষাচ্চ বৃষসর্পাচ্চ রক্ষিতাঃ।
দুরত্যয়েভ্যো মৃত্যুভ্যঃ কৃষ্ণেন সুমহাত্মনা ॥'
১০।৪৬।২০

কৃষ্ণের অসংখ্য গুণ উদ্ধব, জনম ভরিয়া বর্ণন করিয়াও শেষ করিতে পারি না। এমন রত্ন দূরে রাখিয়াও বাঁচিয়া আছি প্রাণে—ইহাই পরমাশ্চর্য্য। উদ্ধব, আমার সব গিয়াছে। কেবল আছে শূন্য প্রাণ আর আছে কান্না। আর সকল নিত্যকর্ম্ম শেষ হইয়াছে "সর্বানঃ শিথিলাঃ ক্রিয়াঃ" প্রাণ আকুল হইয়া উঠে। উদ্ধব, কৃষ্ণের বিরহে গৃহ মনে হয় কারাগার। ঘরের বাহির হইয়া পড়ি কৃষ্ণের কথা ভুলিবার জন্য। কিন্তু কি করিয়া ভুলিব? ব্রজে এমন কোন্ স্থান আছে যেখানে কৃষ্ণের স্মৃতি নাই? দাঁড়াই গিয়ে যমুনার তীরে, মনে পড়ে কৃষ্ণের জলসন্তরণাদি কত খেলার কথা। চলিয়া যাই গোবর্দ্ধনের পার্শ্বে, কৃষ্ণের মুরলীতানে গিরি গলিয়া গিয়াছে যেখানে, সেখানে গোবৎসগণ সহ তার পদচিহ্ন আঁকা। বুকের মধ্যে আগুন জ্বলিয়া উঠে আমার 'হা কৃষ্ণ' 'হা কৃষ্ণ' বলিতে বলিতে। হাঁটিতে হাঁটিতে সরিয়া যাই তখন বনের দিকে। সেখানে দেখি কৃষ্ণের কত ক্রীড়াস্থলী। এমন কোন বৃক্ষ নাই যার তলায় কৃষ্ণ দাঁড়ায় নাই সেই ত্রিভঙ্গঠামে। এমন কুঞ্জ নাই যেখানে লুকায় নাই কৃষ্ণ লুকোচুরি খেলিতে খেলিতে, এমন কুণ্ড নাই যাহাতে অবগাহন করিয়া ক্রীড়ামোদে মাতে নাই কৃষ্ণ। যেদিকে

তাকাই শ্যামের বিহার-ভূমি, পথে পথে কচি কচি চরণের ছোট চিহ্নগুলি আমার মর্ম্মস্থলকে ভাঙ্গিয়া দেয়। যে দিকে তাকাই কৃষ্ণময়—চাঁদে কৃষ্ণের লালিত্য, ফুলে কৃষ্ণের হাসি, পিকগানে কৃষ্ণের কণ্ঠ, জগতের যাহা কিছু কেবল কৃষ্ণকে স্মরণ করায়। কী আর বলিব উদ্ধব! কৃষ্ণহারা মন প্রাণ আমার কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিতে বলিতে ভাবিতে ভাবিতে কৃষ্ণময় হইয়া যায়। অন্তর যায় কৃষ্ণময় হইয়া, আর বাহিরে বুকের কাছে তাকে পাই না। তখন বুক যায় বিদীর্ণ হইয়া।

"সরিচ্ছৈলবনোদ্দেশান্ মুকুন্দপদভূষিতান্।
আক্রীড়ানীক্ষমাণানাং মনো যাতি তদাত্মতাম্॥"

১০।৪৬।২২

।। আট ।।

যখন মথুরা হইতে ব্রজে যাত্রা করেন শ্রীমান্ উদ্ধব, তখন তিনি আপন মনে ভাবনা করিয়াছিলেন নন্দরাজার কথা। যাদের কথা বলিতে শ্রীকৃষ্ণের মত ব্যক্তির এত বিহ্বলতা, না জানি তাঁদের কৃষ্ণপ্রীতি কত গভীর! এই গভীরতার একটা মানসিক অনুমিতি ছিল উদ্ধবের অন্তরে। নন্দরাজার অবস্থা প্রত্যক্ষ সন্দর্শনে উদ্ধব বুঝিলেন যে তাঁহার অনুমিতি অপেক্ষা নন্দরাজের পুত্র-বাৎসল্য কোটি গুণ গভীর। কৃষ্ণে এত অনুরাগ যে কাহারও থাকিতে পারে ইতঃপূর্ব্বে তাহা কল্পনাতেও আনিতে পারেন নাই শ্রীমান্ উদ্ধব।

তিনি তখন ডুবিয়া গেলেন মহাভাবনার সিন্ধুমধ্যে। প্রবোধ ত দিতে হইবে নন্দরাজকে। কিন্তু কী বলিয়া! সংসারে যখন কেহ ক্রন্দন করে কাহারও জন্য, তখন প্রথম কর্ত্তব্য প্রবোধদাতার তাহাকে কাঁদিতে নিষেধ করা। উদ্ধবের এখন বলা উচিত নন্দরাজ আর কাঁদিবেন না এমন আকুলভাবে। কিন্তু এই কথাটি বলা যে কত অনুচিত, অশাস্ত্রীয় তাহা উচ্চারিত হইতে পারে না শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তির মুখে।

উদ্ধব প্রবীণ, শাস্ত্রজ্ঞ, পণ্ডিত, ভক্ত। তিনি জানেন, অতি উত্তম ভাবেই জানেন যে জীবের জীবনের চরম সার্থকতা ভগবল্লাভে। ভগবান্‌কে অন্তরঙ্গভাবে লাভ করা যায় হৃদয়ের আর্ত্তি ও আকুলতা দ্বারা। সংসারক্ষেত্রে জীবকুল সর্ব্বদা ব্যাকুল ধন-জন-সুখৈশ্বর্য্যের জন্য, কেহ কেহ স্বর্গ-মোক্ষের জন্য। কৃষ্ণের

জন্য ব্যাকুলতাপূর্ণ মানুষ সুদুর্লভ। কৃষ্ণের জন্য তীব্র ব্যাকুলতা লাভই মনুষ্যজীবনের চরমতম সার্থকতা।

উদ্ধব প্রত্যক্ষ দেখিতেছেন। নন্দরাজ জীবনের পরমতম সফলতা লাভ করিয়াছেন। তাঁহাকে দেখিয়া উদ্ধবের নিজের অন্তরে সাধ জাগে যাহাতে ঐরূপ আকুলতা তাঁর হৃদয়েও জাগে কৃষ্ণের জন্য। তিনি ভাবেন, বুঝি বা কোটি জন্মেও মহাসাধনা করিলেও ঐরূপ আর্ত্তি তাঁহার হইবে না শ্রীকৃষ্ণ লাভের জন্য। কৃষ্ণের জন্য ঐরূপ অশ্রুবর্ষণ, উদ্ধব মনে করেন তাঁর শাস্ত্র-কঠিন হৃদয়ে কদাপি সম্ভব হইবে না। উদ্ধবের প্রবল ইচ্ছা জাগে নন্দরাজের প্রেমপূর্ণ হৃদয়টি লাভ করিবার জন্য সব ছাড়িয়া তপস্যা করিতে।

নন্দরাজ যে প্রেম লাভ করিয়াছেন অনন্ত বিশ্বে তাহার তুলনা নাই। কৃষ্ণের জন্য আকুল আর্ত্তনাদই যখন জীবের জীবনের চরমতম সার্থকতার পরিচায়ক, তখম উদ্ধব নন্দরাজকে কাঁদিতে নিষেধ করিবেন কোন্ মুখে। যদি বলেন উদ্ধব তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া "হে ব্রজরাজ, আর অমন করিয়া কাঁদিবেন না", তাহা হইলে বিশ্বের সকল ধর্ম্মশাস্ত্র উদ্ধবের মুখ চাপিয়া ধরিবে। শাস্ত্রগণ বলিবেন উদ্ধব! কী অন্যায় কথা বলিতেছ? যে ক্রন্দনে জীবের জীবনসাধনায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাফল্য তুমি সেই কার্য্যে নিষেধ করিতেছ? তুমি শাস্ত্র-নিপুণ হইয়া এমন শাস্ত্র-বিগর্হিত উপদেশ দিতেছ কোন্ বিচারে? উদ্ধব শাস্ত্রের মূর্ত্তি। শাস্ত্রসিদ্ধান্ত দ্বারা যেন তাঁর দেহমন গড়া। শাস্ত্রীয় তত্ত্বের বিপরীত একটি শ্বাসপ্রশ্বাস ত্যাগও উদ্ধবের স্বভাববিরুদ্ধ।

সুতরাং শাস্ত্রানুযায়ী উদ্ধবের বলিতে হয়, 'নন্দরাজ, এমনি ভাবে আরও কাঁদুন, যুগ যুগ ধরিয়া আরও আর্ত্ত হইয়া হা কৃষ্ণ বলিয়া আরও অশ্রু বিসর্জ্জন করুন।' কিন্তু হায়! ইহাও ত সান্ত্বনার ভাষা নয়। যে মহাকাতর তাহাকে আরও কাতর হইতে বলা কি প্রবোধদাতার সাজে? যাহাকে সান্ত্বনা বাক্য বলিলে তাহা হয় শাস্ত্রবিগর্হিত, যাহাকে শাস্ত্রীয় কথা বলিলে তাহা হইয়া যায় প্রবোধদাতার পক্ষে নিতান্ত অশোভন, তাহাকে কি কথা বলিবে কে? শাস্ত্রপ্রবীণ উদ্ধবের পক্ষে নন্দ-রাজার সান্ত্বনাদাতা হওয়া কেবল যে অতি কঠিন কার্য্য তাহা নহে, সম্পূর্ণ অসম্ভব ব্যাপার।

কোন লোক যদি কোন ব্যক্তি বা বস্তুর জন্য অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়ে, তাহা হইলে যিনি আসিবেন তাহাকে সুস্থ করিতে, তাঁর দ্বিতীয় কর্ত্তব্য হইবে কাতর ব্যক্তির মনকে বিষয়ান্তরে টানিয়া আনিবার। যে বিষয় লইয়া সে ব্যথিত, সেই বিষয় হইতে যদি তার মন অন্য বিষয়ে লইয়া যাওয়া যায় তাহা হইলে তার দুঃখের লাঘবতা হইতে পারে। উদ্ধব যদি তাহা করেন তাহা হইলে তাঁহার নন্দরাজকে এমন কথা বলিতে হয় যাহাতে তাঁহার মন কৃষ্ণচিন্তা হইতে অন্য চিন্তায় চলিয়া যায়। শাস্ত্রপরায়ণ উদ্ধব তাহা পারেন না। কারণ, তিনি জানেন সকল শাস্ত্রের উপদেশ জগতের যাবতীয় বিষয় পরিত্যাগ করিয়া এমন কি "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য" একমাত্র কৃষ্ণস্মরণ করাই জীবের পরম শ্রেয়ঃ। যাহার মন কৃষ্ণে আছে কোনও উপায়ে তাহার মন কৃষ্ণ হইতে অন্যত্র লইয়া যাইবার চেষ্টা কেবল অন্যায় নয়,

রীতিমত পাপের কার্য্য। পুণ্যপবিত্রতার মূর্ত্তি উদ্ধব কি পাপকার্য্য করিবেন? তাও আবার ব্রজে আসিয়া, কৃষ্ণপিতার সম্মুখে বসিয়া! উদ্ধব বুঝিতেছেন নন্দবাবাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টাও বিড়ম্বনা।”

সংসারে কেহ যদি পুত্রবিরহে দুঃখার্ত্ত হইয়া বিলাপ করিতে থাকে, তাহা হইলে যিনি উপস্থিত হইবেন তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতে, তাঁহার তৃতীয় কর্ত্তব্য হইবে দুঃখী ব্যক্তির মন মায়িক বস্তু হইতে অমায়িক বস্তুতে লইয়া যাওয়া। তাহাকে বলিতে হইবে—তুমি মায়াময় পুত্রের জন্য কেন বৃথা মায়িক শোক করিতেছ? এই জগতে কে কার—সকল সম্বন্ধই মিথ্যা, দু-দিনের মাত্র। পথে চলিতে যেন পথিকে পথিকে ক্ষণিকের পরিচয়—এই মায়াময় জগতে পিতামাতা পুত্র কন্যা পরিচয়ও ঐরূপই। তুমি এই জন্মে কাহারও পুত্র বা পিতা হইয়াছ, পূর্ব্বজন্মে অন্য কাহারও পুত্র বা পিতা হইয়াছিলে আবার পরজন্মে অপর কাহারও পিতা বা পুত্র হইবে। তোমার পুত্র গত জন্মে অপর কাহারও পুত্র হইয়াছিল, এইজন্মে তোমার পুত্র হইয়াছে, আগামী জন্মে আবার কোথায় গিয়া কার পুত্র হইবে কে জানে? সুতরাং এ নশ্বর সম্বন্ধে স্নেহাকৃষ্ট না হইয়া, এসব ক্ষণিক সম্পর্কের কথা ভুলিয়া নিত্যধন ভগবানের সঙ্গে নিত্যসম্বন্ধ স্থাপন কর। তাহা হইলে সেই সম্বন্ধ কোনদিনই নাশ হইবে না। দুর্ব্বিষহ তাপও ভোগ করিতে হইবে না। সুতরাং পুত্রের জন্য না কাঁদিয়া দিন রাত যদি কৃষ্ণ বলিয়া কাঁদিতে পার তবেই ইহ পরকালের অশেষ কল্যাণ।

কিন্তু আজ উদ্ধবের সম্মুখে বসিয়া নন্দরাজ ত শ্রীকৃষ্ণের জন্যই

অবিশ্রান্ত ঝুরিতেছেন। যাঁর পুত্রই ভগবান্ এবং তাঁর জন্যই যিনি আকুল আবেগে রোরুদ্যমান, উদ্ধব তাঁহাকে কী উপদেশ দিবেন? উদ্ধব যদি বলেন, "নন্দরাজ, আপনি পুত্রের কথা ভুলিয়া যান" তাহা হইলে উদ্ধবের হইবে বিষম পাপ, যাহা নিতান্তই অসাধু-জনোচিত। শ্রীভগবানকে স্মরণ করিতে বলাই সাধুজনের কর্ত্তব্য। সাধুশ্রেষ্ঠ উদ্ধব কোন্ মুখে নন্দরাজকে বলিবেন, পুত্রের কথা ভুলিয়া যান।

উদ্ধব যদি বলেন, "নন্দরাজ, ভগবানের কথা স্মরণ করুন" তাহা হইলে তিনি যাহা করিতেছেন তাহাই আরও বিশেষ করিয়া করিতে বলা হয়। উদ্ধব জানেন শ্রীকৃষ্ণই ভগবান্। একমাত্র তাঁর সঙ্গে সম্বন্ধই জীবের নিত্য শাশ্বত সম্বন্ধ। সুতরাং নন্দরাজকে ভগবানের কথা স্মরণ করিতে বলাও যা, তাঁর পুত্রের কথা বলিয়া আরও কাতর হইতে বলাও তা। কিন্তু যিনি যার জন্য কাঁদিতে-ছেন তাহাকে তার জন্য আরও কাঁদিতে বলা তো সান্ত্বনাদাতার ভাষা নহে। উদ্ধব মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছেন, নন্দরাজকে সান্ত্বনা দিবার ভাষা সরস্বতীদেবীর ভাণ্ডারেও বিদ্যমান নাই।

উদ্ধব বুঝিতেছেন, যে কার্য্যে তিনি প্রেরিত হইয়াছেন সেই কার্য্যটি নিতান্তই অসম্ভব। এমন কোন ভাষা বা কথা উদ্ধব খুঁজিয়া পাইতেছেন না, যাহা বলিয়া তিনি মুখ খুলিতে পারেন। বৃহস্পতির সাক্ষাৎ-শিষ্য বুদ্ধিসত্তম উদ্ধব নিতান্ত মূক হইয়া তাকাইয়া থাকিলেন নন্দমহারাজের অশ্রুব্যাপ্ত মুখখানির দিকে—ব্যথা যেন রূপ ধরিয়াছে। উদ্ধব ভাবিতে লাগিলেন, নন্দরাজার মহাভাগ্যের কথা ও নিজের নিদারুণ অক্ষমতার কথা।

॥ নয় ॥

নন্দরাজের আর্ত্তি এমন চরমে উঠিয়াছে যে, তখন তাঁহার পার্শ্বে কেহ বসিয়া থাকিতে পারে না মূকের মত হা করিয়া। হয়, তাঁহাকেও তাঁর সঙ্গে কাঁদিতে হয়, নয়, দুইটি কথা বলিতে হয়। অমনভাবে কান্নার যোগ্যতাও উদ্ধবের নাই, প্রবোধ দিবার ভাষাও তাঁর জ্ঞানের পরিধির মধ্যে নাই। এমন অনন্যোপায় উদ্ধব-জীবনে আর কোনও দিন হন নাই। কি করিবেন। অগত্যা মুখ খুলিলেন। উদ্ধব বলিলেন—নন্দরাজ, আপনি ও নন্দরাণী মহাভাগ্যবান্ ও ভাগ্যবতী। আপনাদের মত শ্লাঘনীয় জীবন জগতে "ন ভূতো ন ভবিষ্যতি।" "যুবাং শ্লাঘ্যতমৌ লোকে।" শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ধরাধামে আবির্ভূত হওয়ায় বর্ত্তমান জগৎ মহা মহা ভক্তগণ দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়াছে। সকল স্থানেই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন মহাপ্রেমিক ভক্তগণ। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সৃষ্টির আদি হইতে আজ পর্য্যন্ত যত যত ভক্ত জন্মগ্রহণ করিয়া পৃথিবীকে অলঙ্কৃত করিয়াছেন, তার মধ্যে আপনারাই সর্ব্বোপরি বিরাজমান।

আপনাদের ভাগ্যের পরিসীমা নাই। আপনাদের মত অনাবিল আকুলতামাখা প্রীতিমান্ ভক্ত ভূমিতলে আর কুত্রাপি প্রকটিত হন নাই। কোন গোষ্ঠীর মধ্যে একজন বড় হইলে অপর সকলে তার গর্ব্বে গর্ব্বানুভব করে—আমরা ও জগতের ভক্তগোষ্ঠীসকলে আপনাদের নামে গর্ব্ব বোধ করি। আপনাদের

ভাগ্যমহিমা বর্ণনা করিয়াও আমরা ধন্য। আপনাদের মত ভাগ্যবান্‌দের বক্ষে ধরিয়া ধরণীও ধন্যা।

উদ্ধবের কথাগুলি সুন্দর ও পরম সত্য বটে, কিন্তু নন্দরাজার বুকে লাগিল সুতীক্ষ্ণ বাণের মত। আরও যেন বর্দ্ধিত বেদনাভারে কাতর হইয়া নন্দরাজ কহিলেন, "উদ্ধব, বৎস! শুনিয়াছিলাম তুমি খুব বুদ্ধিমান্‌। তোমাকে দেখিয়া সেইরূপ মনেও করিয়াছিলাম, কিন্তু তোমার ভাষা শুনিয়া হতাশ হইলাম। তুমি নিতান্তই বালক, একান্তই অজ্ঞ। না হইলে তুমি আমাদের সম্মুখে বসিয়া আমাদের মুখের উপর আমাদিগকে বলিতেছ ভাগ্যবান্‌! অহো বিধাতঃ, আমার মত হতভাগ্যকে যে ভাগ্যবান্‌ বলে তার কি বিন্দুমাত্রও বোধশক্তি আছে?

উদ্ধব, যে ব্যক্তি পুত্রবিরহে মুমূর্ষু তুমি তাহাকে কহ ভাগ্যবান্‌! তাও আবার যে-সে পুত্র নয়। পুত্র ত সকল মানুষেরই হয় কিন্তু কৃষ্ণের মত পুত্র কি কাহারও আছে, না হবে? এমন পুত্ররত্নহারা হইয়া মরণাধিক বেদনায় যে নিশিদিন ছট্‌ফট্‌ করিতেছে, তুমি তাহাকে ভাগ্যশালী বলিতে পারিতে না, যদি এক কণা অনুভবশক্তিও তোমার হৃদয়ে থাকিত! ঘটে যার অতি সাধারণ বুদ্ধিও আছে সেও বুঝিবে এই সংসারে আমাদের মত ভাগ্যহত আর কখনও জন্মগ্রহণ করে নাই। অতি বড় শত্রুও যেন আমাদের মত দুর্ভাগ্য লাভ না করে। উদ্ধব, আমাদের উপর বিধি বিমুখ, তাই এমন কথাও শুনিতে হয়। আমাকে ভাগ্যবান্‌ বলা একপ্রকার বিদ্রূপ তুল্য। বেদনার উপর বিদ্রূপ ক্ষতস্থানে ক্ষার লেপনের মত। তোমাতে বিচারবুদ্ধি অপ্রচুর

ও অন্তর তোমার অনুভবহীন মনে করিয়া ঐ কথা সহ্য করিলাম।”

নন্দরাজের কথায় উদ্ধব স্তব্ধ হইয়া গেলেন। বুঝিলেন, কথাটা বলা ভাল হয় নাই। তাঁহার কথায় কৃষ্ণ-পিতার বেদনা বর্দ্ধিত হইয়াছে। সান্ত্বনা দিতে আসিয়া বেদনা বাড়াইয়া দেওয়া নিতান্তই অকর্ত্তব্য। উদ্ধব অন্যায় কথা বলিয়া অকর্ত্তব্য কার্য্য করিয়াছেন। আপাততঃ তাহাই মনে হয়। উদ্ধব গভীরভাবে ভাবিলেন—দেখিলেন যাহা বলিয়াছেন তাহা সর্ব্বতোভাবেই যথার্থ। যাঁহার হৃদয় ঐরূপ আকুলতাভরা কৃষ্ণানুরাগ, এই বিশ্বসংসারে সেই ত পরম ভাগ্যবান্। নিখিল-শাস্ত্র উদ্ধবের পক্ষে সাক্ষ্য দিবে। যাহা শাস্ত্রীয়-সিদ্ধান্ত তাহা বলাই ত নীতিসম্মত ও শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তির সর্ব্বদা কর্ত্তব্য।—উদ্ধব তাহা হইলে ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ পরম সত্যভাষণ করিয়া কর্ত্তব্যই করিয়াছেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! এমন কথাও কি প্রকারে অন্যায় ও অকর্ত্তব্য হইয়া নন্দরাজের বেদনা বর্দ্ধনের কারণ হইল—উদ্ধব দিশাহারা হইয়া ভাবিতে লাগিলেন। নন্দরাজের কৃষ্ণপ্রেম যে নিখিল-শাস্ত্রসিদ্ধান্তের অতি ঊর্দ্ধে বিরাজিত সেই রহস্য ভেদ করিতে না পারিয়া দিগ্‌ভ্রান্তের মত খুঁজিতে লাগিলেন।

বস্তুতঃ নন্দরাজের কৃষ্ণপ্রীতির গৌরব-অংশ গ্রহণ করিয়া উদ্ধব মুগ্ধ হইয়াছেন, কিন্তু সৌরভাংশ গ্রহণ করিয়া অভিভূত হন নাই। নন্দরাজের দুঃখের দুঃখাংশ উদ্ধব বোধ করিতে পারেন নাই, তাঁহার মহিমাংশ অনুভব করিয়া চমৎকৃত হইয়াছেন। নন্দরাজের ব্যথাটি যদি উদ্ধব অনুভব করিবেন তাহা হইলে তিনিও

তাঁহার সঙ্গে আকুল হইয়া কাঁদিতে থাকিতেন। উদ্ধব তাহা নিতে পারেন নাই। অতখানি অনুরাগ যাঁহার প্রাণে তিনি যে কত বড়, এই বড়ত্বটা উদ্ধব বেশ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন। করিয়াছেন বলিয়াই তাঁহাকে ভাগ্যবান্ বলিতে পারিয়াছেন। নন্দরাজের কৃষ্ণবাৎসল্যের বিশালতায় উদ্ধব মুগ্ধ হইয়াছেন কিন্তু উহার গভীরতায় অবগাহন করিয়া থই হারাইতে পারেন নাই।

উদ্ধব নিজেরে নিজে বুঝিতেছেন না। কারণ উদ্ধবের চিত্তে যে কৃষ্ণভক্তি, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যাংশের স্ফুর্ত্তিই প্রধানরূপে বিরাজমান। শ্রীকৃষ্ণই পরদেবতা, পরব্রহ্ম, ইহা উদ্ধব সর্বান্তঃ-করণেই জানেন। জীবের অনুরাগের পরম বিষয় পূর্ণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই। যে বস্তুতে অনুরাগ স্থাপন করা উচিত, নন্দরাজের অনুরাগ সেই বস্তুতেই স্থাপিত। সুতরাং নন্দরাজ মহামহিমান্বিত ব্যক্তি ইহা বুঝিতে উদ্ধবের কোন অসুবিধা নাই। কিন্তু নন্দ-রাজের প্রীতিতে যে কোন ঔচিত্যের বিচার নাই, ইহা বুদ্ধির অতীত। কৃষ্ণ ভগবান্, সুতরাং তাঁহাকেই ভালবাসা উচিত, এজন্য নন্দরাজ তাঁহাকে ভালবাসেন নাই। নন্দরাজের কৃষ্ণপ্রেম স্বভাবসিদ্ধ স্বতঃসিদ্ধ। উদ্ধবের প্রীতি কৃষ্ণের প্রতি। উদ্ধবের কৃষ্ণ ভগবান্ ছাড়া আর কিছুই নহেন। নন্দরাজের কৃষ্ণ পুত্র ছাড়া আর কিছুই নহে।

মথুরা আর বৃন্দাবন মুখোমুখি বসিয়াছেন। উদ্ধব-সন্দেশের ইহাই বিশেষ কথা। মথুরা আর ব্রজ দু'য়ের ভৌগোলিক ব্যবধান কয়েক ক্রোশ, কিন্তু তাত্ত্বিক ব্যবধান অফুরন্ত। মথুরার বসুদেব সূতিকাগারেই স্তব করিয়াছেন কৃষ্ণকে, ব্রজের নন্দ নিজের

পাদুকা কৃষ্ণের মাথায় দিয়া বনে বনে বহাইয়াছেন। মথুরার দেবকী কংসবধ দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া পদে প্রণত কৃষ্ণকে আশীর্ব্বাদ করিতে পারেন নাই। ব্রজের যশোদা মুখে বিশ্বরূপ দেখিয়াও তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া দড়ি দিয়া তাঁহাকে বাঁধিতে ছাড়েন নাই। মথুরার উদ্ধব কৃষ্ণের পাদোদক পান করিয়া কৃতার্থ হন। ব্রজের শ্রীদাম কৃষ্ণের কাঁধে উঠিয়া, তাঁহার বুকে পা দোলাইয়া ভাণ্ডীর বনের পথে হাঁকাইয়া লন। মথুরায় কৃষ্ণ বড়, ব্রজে কৃষ্ণ কাহারও সমান, কাহারও ছোট। মথুরায় কৃষ্ণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, ব্রজের কৃষ্ণ পরম প্রেষ্ঠ।

আজ মথুরা আসিয়াছেন ব্রজ দেখিতে। শুধু দেখিতে নয়, বিরহকাতর ব্রজরাজকে সান্ত্বনা দিতে। ব্রজরাজের কৃষ্ণপ্রেমের গরিমাটি উদ্ধব বুদ্ধি দ্বারা গ্রহণ করিতেছেন, কিন্তু তাহার মধুরিমাটি হৃদয় দ্বারা আস্বাদন করিতে পারিতেছেন না। তাই তাঁহার নির্দ্দোষ বাক্যও দোষের হইয়া যাইতেছে।

॥ দশ ॥

সুতীব্র বিরহ-বেদনায় নন্দরাজার চিত্তে দৈন্যের উদয় হইল। দীনহীনের সুরে বলিতে লাগিলেন ব্রজরাজ—"উদ্ধব, আমি কৃষ্ণের পিতা হইবার যোগ্য নই। কৃষ্ণ ত সাধারণ বালক নয়। গর্গমুনি নামকরণকালে আমাকে বলিয়াছিলেন "গর্গস্য বচনং যথা" গুণে কৃষ্ণ নারায়ণের সমান। কৃষ্ণ-বলরাম সুরমুনিগণের ধ্যেয় একথাও তিনি কহিয়াছিলেন। এখন মাঝে মাঝে মনে হয় আচার্য্যের বাক্য ঠিকই। তোমরাও ত স্বচক্ষে দেখিয়াছ। সেই কংস, যার গায়ে বল হইবে হাজার হাতীর, তাহাকে ধাক্কা দিয়া মাটিতে পাড়িয়া বধ করিল কৃষ্ণ।

আর সেই কুবলয়াপীড় হস্তীটাকে মারিল কেমন অবহেলায় দাঁত দুটা উৎপাটন করিয়া। চাণুর মুষ্টিক প্রভৃতি মল্লগুলিকে যমালয়ে পাঠাইল অবলীলাক্রমে, সিংহ যেমন বনের পশুগুলিকে ধরে আর মারে—সেইমত।

"কংসং নাগাযুতপ্রাণং মল্লৌ গজপতিং তথা।
অবধিষ্টাং লীলয়ৈব পশূনিব মৃগাধিপঃ ॥"

ভাঃ ১০।৪৬।২৪

মত্ত হস্তী যেমন ইক্ষুদণ্ড ভাঙ্গে, তেমন করিয়া ভাঙ্গিল কৃষ্ণ শিবের ধনুখানা। ধনুখানা ত ছোট খাট ছিল না, দৈর্ঘ্য ছিল তার তিন তাল, (১০০ হাত)। পুরাণ হইলেও জীর্ণ হয় নাই, বিশেষ সারবান ও শক্তই ছিল। এসবগুলি ত উদ্ধব তোমাদেরও চোখে দেখা। ব্রজেও কম দেখি নাই। সাত বৎসর বয়সে

দাঁড়াইয়াছিল গোবর্দ্ধন গিরিখানাকে হাতে ধরিয়া এক সপ্তাহ কাল। প্রলম্ব, ধেনুক, অরিষ্ট, তৃণাবর্ত্ত, বক প্রভৃতি অসুরগুলি—ভয়ে যাদের সুরাসুর কম্পমান—তাদের বধ করিয়াছে কৃষ্ণ খেলিতে খেলিতে, এগুলি সবই আমার চোখে দেখা।

তালত্রয়ং মহাসারং ধনুর্যষ্টিমিবেভরাট্।
বভঞ্জৈকেন হস্তেন সপ্তাহমদধাদ্ গিরিম্॥
প্রলম্বো ধেনুকোহরিষ্টস্তৃণাবর্তো বকাদয়ঃ।
দৈত্যাঃ সুরাসুরজিতো হতা যেনেহ লীলয়া॥

ভাঃ ১০।৪৬।২৫-২৬

এই সব দেখিয়া শুনিয়া, আচার্য্যের কথা স্মরণ করিয়া আমি ঠিকই বুঝিয়াছি কৃষ্ণ সাধারণ মনুষ্য নহে। সে কোন শাপভ্রষ্ট দেবতা হইতে পারে। অথবা কোন শ্রেষ্ঠ দেবতা অন্যদেবগণের কার্য্য সাধনের জন্য আসিতে পারে। আমার নিতান্ত সৌভাগ্য জন্মজন্মান্তরের পুণ্যফল বা পিতা-মাতামহের শুভকার্য্যের ফল, যে আমার মত অতি সাধারণ মানুষকে সে বাবা বলিয়া ডাকিয়াছে। নতুবা তার পিতা হইবার যোগ্যতা আমার কিছুই নাই।

আচম্বিতে নন্দরাজার এই দৈন্য আসিল কেন? ইহা বাৎসল্য-রসের সমুদ্র-উত্থিত অসংখ্য সঞ্চারীভাবতরঙ্গের একটি ক্ষুদ্র তরঙ্গ। এই তরঙ্গ সখ্য বাৎসল্য রসের সমুদ্রেও দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বে বলিয়াছি, নন্দরাজ কৃষ্ণকে আদরের পুত্র বলিয়াই জানেন। কৃষ্ণের ভগবত্তা বা অন্য কোনরূপ মহত্ত্ব তাঁহার ভাবনার পরিধিতে আসে না। যদি না আসে তাহা হইলে তখন ঐ সব ভাবনা আসিল কোথা হইতে? উত্তর এই, ব্রজের বাৎসল্য, সখ্য,

মধুরতা তিন রসেই কৃষ্ণের ভগবত্তার অনুসন্ধান নাই। কিন্তু বিরহের তরঙ্গকালে উহার ক্ষণিক প্রকাশ পরিদৃষ্ট হয়। মিলন-কালে তাহারা কখনও কৃষ্ণকে কোন মহদ্ব্যক্তি বলিয়া ভাবে না। বিরহকালে—যখন আর কৃষ্ণকে পাইব না এইমত নৈরাশ্য আসে, তার বিরহতাপে ভাবসিন্ধুর আলোড়নে ঈশ্বরভাবের ক্ষণিক উদয় হয়; আবর্ত্তিত তপ্ত দুগ্ধের কটাহমধ্যে ক্ষুদ্র তৃণখণ্ডের মত উহা একটু দেখা দিয়াই লোপ পায়। আর দেখা যায় না।

উদ্ধব মহাশয়ের কৃষ্ণে ভগবদ্বুদ্ধি তাঁহার স্থায়িভাবের অন্তর্গত। আর নন্দরাজে কৃষ্ণের মাহাত্ম্যস্ফুর্ত্তি ক্ষণিক ক্ষুদ্র বীচিমালার মত। তথাপি এই ক্ষেত্রে উদ্ধবের সঙ্গে কিঞ্চিৎ সাদৃশ্যেও উদ্ধবের একটি প্রকাণ্ড লাভ হইয়া গেল।

বলিতে বলিতে থামিয়া গেলেন নন্দরাজ। গাম্ভীর্য্য ও ধৈর্য্য তাঁহাকে একটু যেন সোয়াস্তি দিল। একটি সুতপ্ত দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া তিনি যেন একটু আশ্বস্ত হইয়া বসিলেন। ওদিকে কৃষ্ণজননী যশোমতী মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়া আছেন পার্শ্বের প্রকোষ্ঠে। মথুরা হইতে কৃষ্ণের সখা আসিয়াছে, কৃষ্ণ আসে নাই এই সংবাদ শুনিবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি সম্বিৎহারা হইয়া পড়িয়া আছেন মাটিতে। যেদিন কৃষ্ণ ব্রজ ছাড়িয়াছেন, সেই দিন হইতে নন্দরাণী চক্ষু বুজিয়াছেন। কৃষ্ণ ছাড়া ব্রজ আর দেখিবেন না বলিয়া মুদ্রিত নয়ন আর উন্মীলিত করেন নাই। নন্দরাজ যে উদ্ধবের কাছে কৃষ্ণের কথা কহিতেছিলেন, অর্দ্ধ-বাহ্যজ্ঞান অবস্থায় যশোদার কাণে তার কিছু কিছু কথা ভাঙ্গা ভাঙ্গা ভাবে আসিতেছিল। ঐ কথা শুনিতে শুনিতে শুদ্ধ

বাৎসল্য-রসের উদ্দীপনে স্তনযুগল হইতে শ্রাবণের জলধারার মত দুগ্ধধারা, আর নয়ন হইতে অশ্রুধারা, দুইয়ে মিলিয়া যশোমতীর বক্ষের বসন একেবারেই সিক্ত হইয়া গিয়াছিল।

লীলায় তখন কৃষ্ণের বয়স এগার বৎসর। তখনও তাঁহার কথা স্মরণে শ্রবণে স্তন হইতে দুগ্ধক্ষরণ লৌকিক জগতে কুত্রাপি সম্ভব নহে। ইহার হেতু এই যে, প্রাকৃত জগতের পিতৃত্ব মাতৃত্ব হয় জন্যজনকত্ব সম্বন্ধে। যশোদা-নন্দের সঙ্গে কৃষ্ণের সম্বন্ধ নিত্য, শাশ্বত, স্বতঃসিদ্ধ। বাৎসল্য রসের আশ্রয়ত্ব নিবন্ধনই কৃষ্ণের পুত্রত্ব ও নন্দ-যশোদার পিতৃত্ব মাতৃত্ব—প্রাকৃত জন্যজনক সম্বন্ধে নহে। এই কারণে লীলায় কৃষ্ণের জাগতিক বয়স যতই হউক, নিত্যকালই তিনি যশোদাস্তনন্ধয়। এই নিমিত্ত নিত্যকালেই যশোদার স্তনক্ষরণ স্বতঃ ও স্বাভাবিক।

"যশোদা বর্ণ্যমানানি পুত্রস্য চরিতানি চ।
শৃণ্বন্ত্যশ্রূণ্যবাস্রাক্ষীৎ স্নেহস্নুতপয়োধরা ॥"

ভাঃ ১০।৪৬।২৮

উদ্ধব নীরব হইয়া আছেন। যশোদাজননীর সঙ্গে কোন বাক্যালাপ করিবার সাহস তাঁহার ছিল না। কিন্তু নন্দবাবার সঙ্গে আর দুই একটি কথা বলিবার কিঞ্চিৎ সাহস সে লাভ করিল। ইহাকেই উদ্ধবের মস্ত লাভ বলিয়াছি।

উদ্ধব লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে, কৃষ্ণের মাহাত্ম্য বর্ণনাকালে দৈন্যে নন্দরাজের চোখের জল যেন শুকাইয়া যাইতেছিল। উহা লক্ষ্য করিয়া উদ্ধবের অন্তরে এক নূতন জ্ঞানের আলোকপাত হইল। তিনি ভাবিলেন, কৃষ্ণ যে কাহারও ছেলে নহেন, অনন্ত

দেহের পিতা হইলেন বীজ, মাতা হইলেন যোনি। সকল জগতের বীজ ও যোনিতে ভেদ আছে, পৃথকবস্তু হওয়া প্রয়োজন—কিন্তু নিখিল বিশ্বের যিনি মূল, তিনি একাধারেই নিমিত্ত ও উপাদান উভয় কারণ বটেন।

নিখিল বিশ্বের মূল বীজ হইতেছেন পুরুষ ও আদি যোনি হইতেছেন প্রকৃতি। সকল পুরুষের আশ্রয় যে পরমপুরুষ তিনিই শ্রীকৃষ্ণ। সকল প্রকৃতির ঈক্ষণকারী ও ক্ষোভকারী পুরুষ হইলেন পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের অংশকলা। নিখিল বিশ্বের যাহা কিছু সবই শ্রীকৃষ্ণের বিভূতি। এমন কি নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মেরও তিনি প্রতিষ্ঠা বা মূলাশ্রয়। অনন্ত জগৎ সৃষ্টি করিয়া আবার ইহার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্য্যামিরূপে। প্রবেশ করিয়াও তিনি কিন্তু মায়িক বস্তুর সঙ্গে লিপ্ত হন নাই।

নন্দ মহারাজ অবাক্ বিস্ময়ে উদ্ধবের কথাগুলি গলাধঃকরণ করিতেছেন। উদ্ধব আরও বলিতে লাগিলেন—শুনুন গোপরাজ! প্রাণিমাত্র মৃত্যুকালে যদি পারে ক্ষণকালের জন্যও মনোনিবেশ করিতে শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে, তাহা হইলে দূর হইয়া যায় তার অশেষ অমঙ্গল, দগ্ধীভূত হইয়া যায় সর্ববিধ কর্মফল, সে লাভ করে পরমপদ। কখনও ভগবানের পার্ষদত্ব প্রাপ্ত হইয়া সূর্য্যের মত ভাস্বর হয়।

"যস্মিন্ জনঃ প্রাণবিয়োগকালে
ক্ষণং সমাবেশ্য মনো বিশুদ্ধম্।
নির্হৃত্য কর্মাশয়মাশু যাতি
পরাং গতিং ব্রহ্মময়োঽর্কবর্ণঃ ॥" ভাঃ ১০।৪৬।৩২

অমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের আত্মা শ্রীকৃষ্ণ। সকল কার্য্য-করণের চরম পর্য্যাপ্ততা শ্রীকৃষ্ণে। এমন শ্রীকৃষ্ণে আপনাদের এতাদৃশ প্রগাঢ় অনুরাগ নিরুপম। এমন কৃষ্ণপ্রেম-ধনে আপনারা ধনী। এমন কিছুই নাই জগতে যাহা আপনাদের পাওয়া বাকী আছে। "কিংবাবশিষ্টং যুবয়োঃ স্বকৃত্যম্।" আপনাদের ভাগ্যমহিমা বাক্যমনের অগোচর।

শ্রীকৃষ্ণের বিরহে আপনি কাতর হইয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণ কি বস্তু তাহা পরিজ্ঞাত হইলে আপনার এই বিরহ আর থাকিতে পারে না। বিরহের জনক হইল অভাব। যাহার অভাব কোন দিন কোন স্থানেই নাই, তাহার বিরহ হইবে কিরূপে? কাষ্ঠের মধ্যে যেমন অগ্নি থাকে, সেইরূপ সকল প্রাণীর হৃদয়মধ্যে নিত্যকাল কৃষ্ণ আছেন। নন্দরাজ, আপনার হৃদয়মধ্যে কৃষ্ণ আছেন। সুতরাং শোকের কোন কারণ নাই, আর খেদ করিবেন না—কৃষ্ণ অতি নিকটে, তাঁহাকে দেখুন।

"মা খিদ্যতং মহাভাগৌ! দ্রক্ষ্যথঃ কৃষ্ণমন্তিকে।
অন্তর্হৃদি স ভূতানামাস্তে জ্যোতিরিবৈধসি॥"

ভাঃ ১০।৪৬।৩৬

নন্দরাজ, আপনি যে মনে করেন কৃষ্ণ আপনার প্রিয় পুত্র, কৃষ্ণের তত্ত্ব জানেন না বলিয়াই আপনার ঐরূপ ভাবনা। কৃষ্ণ পরব্রহ্ম। তিনি মায়াতীত—নির্লেপ নির্ব্বিকার। তাঁহার কেহ প্রিয়ও নাই, কেহ অপ্রিয়ও নাই। পূর্ণকাম যিনি তাঁর আবার আপন পর কি?

আপনারা মনে করেন যে, কৃষ্ণের আপনারা পিতামাতা ইহা

কিন্তু ঠিক নহে। পিতৃমাতৃসম্বন্ধ মায়িক। মায়াতীতের পিতামাতা হইতে পারে না। ব্যবহারিক জগতে ধাতু দ্বারা দেহ উৎপন্ন হয় বলিয়াই পিতামাতা দেখিতে পাওয়া যায়। সেইরূপ ধাতুসম্বন্ধে জন্ম নাই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের পিতামাতা হইতে পারে না।

"ন মাতা ন পিতা তস্য ন ভার্য্যা ন সুতাদয়ঃ।
নাত্মীয়ো ন পরশ্চাপি ন দেহো জন্ম এব চ॥"

ভাঃ ১০।৪৬।৩৮

তিনি নিখিল কারণের আদি কারণ। সুতরাং কেহ তাঁহার আপন বা পর হইতে পারে না। প্রাকৃত-জীবের দেহ ও দেহী দুইটি বস্তু আছে। অপ্রাকৃত শ্রীকৃষ্ণের দেহ-দেহী ভেদ নাই। জীবের যেটি স্বরূপ, সেটি তাঁর দেহ নহে। এই জন্য জীবের দেহ আছে। শ্রীকৃষ্ণের যেটি দেহ সেইটিই স্বরূপ, সুতরাং তাঁহার দেহ নাই। জীবের কর্ম্ম আছে। কর্ম্মজনিত ফল আছে। সেইজন্য জন্ম মৃত্যু আছে। শ্রীকৃষ্ণের কোন কর্ম নাই, সুতরাং কর্মফল নাই, অতএব জন্ম মৃত্যু নাই।

এসব শুনিয়া আপনি প্রশ্ন করিতে পারেন যে, সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানের জগতে আসিবার প্রয়োজন কি? তাহা বলিতেছি—

ক্রীড়ার্থঃ সোহপি সাধূনাং পরিত্রাণায় কল্পতে।

ভাঃ ১০।৪৬।৩৯

তিনি নিত্যলোকে থাকিয়া সংকল্পমাত্রেই সকল কার্য্য সাধন করিতে পারিলেও জগতে আসেন দুইটি প্রয়োজনে। একটি হইল ক্রীড়া বা লীলাস্বাদন, অপরটি হইল সাধুজনের রক্ষণ।

কর্ম্মময় দেহধারী জীব যেমন ক্ষণকাল কর্ম না করিয়া থাকিতে পারে না, লীলাময় কৃষ্ণ সেইরূপ ক্ষণকালও লীলা না করিয়া থাকিতে পারেন না। তিনি আর সকল বিষয়ে উদাসীন হইলেও ভক্তরক্ষণ বিষয়ে পরম আগ্রহশীল। ভক্ত তাঁর প্রাণপ্রিয়, ভক্তই সাধু। সুতরাং সাধুরক্ষা তাঁহার স্বভাবগত ধর্ম্ম। ভক্তের ভগবদ্‌ভজনে যে কোন প্রকারের বাধা উপস্থিত হউক তাহা তিনি দূর করেন, আর ভজনের যতপ্রকার অনুকূলতা তাহা তিনি সৃষ্টি করেন। অসুরাদির অত্যাচারে ভক্তের ভজনের বিঘ্ন হয়, তাহা তিনি দূর করেন। আর ভক্ত যদি ভগবানকে পুত্ররূপে, সখারূপে বা বল্লভরূপে ভালবাসিতে চাহে, আর সেই সেই রূপে, তাঁহাকে না পায় তাহা হইলে তাহার ভজনের অনুকূলতা হয় না। এজন্য তিনি সেই সেই রূপে আবিষ্ট হইয়া ভক্তপালন ও লীলাস্বাদন করিয়া থাকেন। অতএব বাস্তবে তিনি কাহারও পুত্র নহেন। কেবল ভক্তের তৎ তৎ ভাবের অনুকুলে পুত্রাদি অভিমান করিয়া থাকেন মাত্র।

যুবয়োরেব নৈবায়মাত্মজো ভগবান্ হরিঃ।
সর্ব্বেষামাত্মজো হ্যাত্মা পিতা মাতা স ঈশ্বরঃ॥

ভাঃ ১০।৪৬।৪২

হে গোপরাজ! শ্রীকৃষ্ণ আপনাদের পুত্র একথা এক দৃষ্টিতে ঠিক আর এক দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ অঠিক। আপনাদের হৃদয়ে গভীর বাৎসল্যভাবের আবেশ আছে বলিয়াই তিনি আপনাদের পুত্র, কারণ "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্" এইরূপ তাঁহার প্রতিজ্ঞা আছে। আপনাদের হৃদয়ের ভাব এবং শ্রীকৃষ্ণর

তদনুকূল প্রতিরূপ ভাবের অভিমান—এই দৃষ্টিতে তিনি আপনাদের পুত্র। যদি আপনারা জাগতিক জন্যজনক সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণে পুত্রাভিমান পোষণ করেন তবে তাহা সর্বতোভাবেই অঠিক। তিনি সকলেরই আত্মার আত্মা, তিনি সকলেরই পরম প্রিয়। তিনি সকলেরই পিতা, মাতা, ধাতা। নিজে তাহা বলিয়াছেনও—'পিতাহমস্যজগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।' আমি এই জগতের পিতা, মাতা, ধাতা, পিতামহ সকলেরই। তিনি সকলেরই সব। ইহাই তত্ত্ব ও তথ্য। তিনি আপনাদের পুত্র ইহা রসভাবানুকূল, তাহাও আপনাদের অভিমানবিশেষ।

এই অনন্ত বিশ্বে শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া আর কোন বস্তুই নাই। এই জগতে যাহা শুনিয়াছেন, যাহা দেখিয়াছেন, যাহা অতীত, যাহা বিদ্যমান ও যাহা হইবে, যাহা স্থাবর ও জঙ্গম, যাহা বৃহৎ ও অণু সে সকলই অচ্যুত নামধারী শ্রীকৃষ্ণ হইতে পৃথক্ কিছু নহে, যেহেতু তিনিই পরমাত্মা, পরমাশ্রয়, এবং সর্বস্বরূপ।

"দৃষ্টং শ্রুতং ভূতভবদ্ভবিষ্যৎ স্থাস্নুশ্চরিষ্ণুর্ম্মহদল্পকঞ্চ।
বিনাচ্যুতাদ্বস্তুতরাং ন বাচ্যং স এব সর্বং পরমার্থভূতঃ॥"

ভাঃ ১০।৪৬।৪৩

এইরূপে উদ্ধব মহারাজ আঁকিলেন শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের একখানি নিরুপম চিত্র। আঁকিলেন শাস্ত্রের তুলিকায়, বিচারের বর্ণে। চিত্রখানি তুলিয়া ধরিলেন নন্দরাজের সম্মুখে। উদ্ধব বুঝি বা জানেন না যে নন্দরাজ অন্ধ। জগতের জীব ভোগে অন্ধ। ব্রজের জন প্রেমে অন্ধ।

॥ বার ॥

বস্তুজাত দৃষ্ট হয় সূর্য্যের আলোকে। গাঢ় অন্ধকারে দেখা যায় না কিন্তু কিছুই। শাস্ত্রজ্ঞান দিবাকর-কিরণতুল্য। কিরণ-সম্পাতে পরিষ্কার হইয়া যায় সকল সত্য তথ্য। কাটিয়া যায় ভ্রম প্রমাদের আঁধার।

নন্দরাজ কাঁদিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের জন্য কাঁদিতেছেন। উদ্ধব জানেন কান্না আসে মোহ হইতে। মোহ আসে ভ্রমজ্ঞান হইতে। তত্ত্বজ্ঞান আসিলে ভ্রমজ্ঞান ঘুচে। ভ্রমজ্ঞান গেলে দূরীভূত হয় মোহ। মোহ অপনোদনে কান্নার হা-হুতাশ থামিবে। উদ্ধব তাই চেষ্টা করিতে লাগিলেন নন্দরাজের সম্মুখে শাস্ত্রজ্ঞানের তত্ত্বের আলোকটি জ্বালিয়া ধরিতে।

উদ্ধব শাস্ত্রের মূর্ত্তি। উদ্ধব জ্ঞানালোকের সাধক। তিনি জানেন নিশ্চিতভাবেই, সত্যের দর্শন জ্ঞানের আলোতেই সম্ভব। কিন্তু কোন কোন বস্তু যে অন্ধকারেই দেখা যায় সে সংবাদটি রাখেন না উদ্ধবজী। পৃথিবীর পৃষ্ঠে যত দ্রব্য তাহাদিগকে দেখায় আলো। কিন্তু গগনের গাত্রে যে অসংখ্য তারকারাজি, তাহা-দিগকে কিন্তু দেখায় অন্ধকারই। জগতে যদি কেবল আলোই থাকিত তাহা হইলে কোনদিনই জানিতে পারিতাম না আমরা আকাশের অগণিত নক্ষত্রমণ্ডলীর সংবাদ।

সূর্য্য যখন নিভে, আঁধার যখন নামে, তখনই নক্ষত্রগণের রূপ ফুটে। যদি কোন ব্যক্তির এই হয় জীবনের ব্রত যে, সে সর্ব্বদা তাকাইয়া থাকিবে উত্তর মুখে, ধ্রুব নক্ষত্রের প্রতি দৃষ্টি

নিবদ্ধ করিয়া, তাহা হইলে সূর্য্যালোক হইবে তাহার ব্রতরক্ষার বাধক। আলোর মানুষের আলোর গৌরব হইবে তাহার তপস্যার অন্তরায়। আলোর ভাষণে তাহার কর্ণ রহিবে বধির।

"কৃষ্ণ আমার আত্মজ" এই একমাত্র ভাবনায় উত্তর মুখে তাকাইয়া আছেন নিরন্তর গোপরাজ নন্দ। অপলকে দেখিতেছেন তিনি কৃষ্ণ-ধ্রুব-নক্ষত্রকে। তাঁহার কাছে নিতান্তই অবাঞ্ছিত শাস্ত্রসূর্য্যের ময়ূখমালা। শাস্ত্রসাধক উদ্ধবের জ্ঞানসম্পদ নন্দ-রাজের নিকট শুধু অবোধ্যই নহে, অন্তরায়ও বটে। "আমি কৃষ্ণের পিতা" এই নিবিড় অনুভূতি নন্দরাজের বুকজোড়া। সেখানে অবকাশ কোথায় তদ্ভিন্ন অন্য ভাবনা প্রবেশের।

দীর্ঘ ভাষণ দিলেন উদ্ধব, শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব সম্বন্ধে। উদ্ধবের স্বকীয় অনুভবে ও শাস্ত্রীয় বিচার-গৌরবে ভাষণটি অনবদ্য। কিন্তু নন্দরাজের চিত্তে উহার প্রতিক্রিয়া উদ্ধব যাহা আশা করিয়া-ছিলেন তাহা হইল না। তত্ত্বকথা শুনিয়া কহিয়া উঠিলেন নন্দরাজ—"উদ্ধব, বয়সে তুমি বালক। তথাপি কেন যেন বিশ্বাস ছিল অন্তরে—বুদ্ধিতে তুমি প্রবীণ। কিন্তু এখন দেখিলাম তাহা নহে। বয়সেও যেমন বালক, তুমি বুদ্ধিতেও তদ্রূপই।"

তুমি কথা জান, উদ্ধব, কিন্তু কাহাকে কি বলিতে হয় তাহা একেবারেই জান না। তুমি ভাগ্যবান্ ভাগ্যবতী বলিয়াছ আমাকে ও কৃষ্ণ-জননীকে। এমন কথা তুমি উচ্চারণ করিতে পারিতে না মুখে, যদি সামান্য বুদ্ধিও থাকিত তোমার। এই বিশ্বসংসারে আমাদের মত ভাগ্যহত জীব যে আর নাই, ইহা

আমি জানি নিশ্চিতভাবেই। এই জগতে যে পুত্রহারা সেই ভাগ্যহীন। আর যে কৃষ্ণের মত পুত্ররত্ন হারায় সে নিতান্তই হতভাগ্য।

পুত্র অনেকেরই হয়, উদ্ধব, কিন্তু কৃষ্ণের মত পুত্র কি আর কাহারও কোন দিন হইয়াছে না হইবে? এত সুন্দর, এত মধুর, এত হাস্যময়, এত লাস্যময়, এত প্রীতিমান, এত বুদ্ধিমান, এমন চলন নটন মুরলীবাদন, এমন প্রেমমাখা ভাষা, এমন মধুগন্ধী শ্বাস, নিখিল বিশ্বে কোন দিন কোথাও হয় নাই আর হইবেও না। হারাইয়া ফেলিয়াছে যাহারা এ হেন মহাধনকে, আকুল আর্ত্তনাদ করিতেছে যাহারা এ হেন রত্নসম্পদের অভাবে, তাহাদের সম্মুখে তুমি যে তাদের মহাভাগ্যবান্ বলিয়াছ ইহা এক মর্ম্মভেদী বিদ্রূপময় প্রহসন মাত্র।

এই কথা না বলিয়া উদ্ধব তুমি যদি বলিতে আমাদের মত দুর্ভাগ্য জীব জগতে আর দ্বিতীয় নাই, তাহা হইলে একটু সুখী হইতাম, বুঝিতাম আমাদের হৃদয়ের বেদনা কিঞ্চিৎ অনুভব করিয়াছে উদ্ধব। সহানুভূতিতে বেদনার কিঞ্চিৎ অনুভব করিয়াছে উদ্ধব। সহানুভূতিতে বেদনার কিঞ্চিৎ লাঘব হইত।

উদ্ধব, তুমি আলোচনা করিয়াছ আমার নিকটে ভগবত্তত্ত্ব। আমি শাস্ত্রজ্ঞ নহি, কেবল স্থূল বুদ্ধিতে এই কথা বিশ্বাস করি যে ভগবান্ একজন আছেন। তিনি জগতের গুরু ও বিশ্বের নিয়ন্তা। তিনি পুরুষ প্রকৃতির মূল কারণ, তিনি অনাদি অপরিণামী সর্ব্বেশ্বর। আমি জানি তিনি নারায়ণ। ইহা শালগ্রামরূপে নিত্য বিরাজিত আমার গৃহে।

উদ্ধব, তুমি কিন্তু এই নারায়ণের স্বরূপ-তত্ত্বের কথা বলিয়াই ক্ষান্ত হও নাই। তৎসঙ্গে আর একটি অদ্ভুত কথা কহিয়াছ। তুমি বলিয়াছ সেই নারায়ণই আমার গোপাল, কৃষ্ণ। তুমি নিতান্ত বালক বলিয়াই এমন মন্তব্য করিয়াছ। ভগবান্ কি বস্তু তাহা আমি শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়া না জানিলেও মহতের মুখে শুনিয়া শুনিয়া কিছুটা জানি। নারায়ণের যাহা যাহা বিশেষ লক্ষণ তাহা কিঞ্চিৎ আমার পরিজ্ঞাত আছে। ঐ সব লক্ষণের একটি বিন্দুমাত্রও আমার কৃষ্ণেতে বিদ্যমান নাই।

নারায়ণ হইলেন নিখিল বিশ্বের কারণের কারণ, এ কথা তুমিই বলিয়াছ। আমার কৃষ্ণ একটি ক্ষুদ্র দুগ্ধপোষ্য বালকমাত্র। নারায়ণ শুদ্ধ, শান্ত, অপাপবিদ্ধ। কৃষ্ণ দুর্মদ. চঞ্চল, লোভী ও ক্রোধী। নারায়ণ নির্মল, নির্দ্দোষ, শুদ্ধ সত্ত্বগুণময়। কৃষ্ণ চোর, মিথ্যাভাষী, অভিমানী। নারায়ণ নিখিল জগতের আশ্রয়, আর কৃষ্ণ তাহার পিতামাতার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল।

উদ্ধব. কত আর বলিব, নারায়ণের সঙ্গে কৃষ্ণের কোন সাদৃশ্যই নাই। নারায়ণ সত্য-সঙ্কল্প, আর কৃষ্ণকে মিথ্যা কথা বলিতে আমি নিজে শুনিয়াছি। নারায়ণ আপ্তকাম, ক্ষুধাতৃষ্ণার অতীত, আর আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি কৃষ্ণ ক্ষুধায় কাতর, তৃষ্ণায় অস্থির। উদ্ধব, নারায়ণ আমাদের প্রণম্য, কিন্তু কৃষ্ণকে দেখিয়াছি দিনের পর দিন আমার পাদুকা মাথায় লইয়া পিছনে পিছনে ছুটিয়াছে। উদ্ধব, আমাদের না হয় ভুল হইতে পারে— ভগবানের ত আর ভুল হইতে পারে না। কৃষ্ণ ভগবান্ হইলে আমাদিগকে মা বাবা সম্বোধন করিবে কেন? আমাদের

সাহায্য বিনা নিজেকে অমন অসহায় মনে করিবে কেন? নারায়ণের কোন্ লক্ষণটা কৃষ্ণে আছে তাহা আমি দেখিতে পাই না। তবে নারায়ণের অসীম করুণায় এই পুত্ররত্ন পাইয়াছি এ কথা দৃঢ়ভাবে জানি। কৃষ্ণ আমাদের পুত্র, এই মর্মান্তিক অনুভূতি আমাদের অন্তরজোড়া। কোন বিচার তর্কের সামর্থ্য নাই, উদ্ধব সেই অনুভবটাকে ভুল করিয়া দিতে পারে।

আর একটি কথা শুন উদ্ধব। না হয় তোমার কথা সত্যই ধরিয়া লইলাম, কৃষ্ণ মানুষ নয়, ভগবানই, ইহা স্বীকার করিয়া লইলাম। কিন্তু এই তত্ত্বাবিষ্কারে ফলে কৃষ্ণহারা আমার বিরহের তাপ কি একবিন্দুও অপনোদন হইতে পারে? আমি ত দেখিতেছি, তোমার কথা শুনিয়া আমার বেদনা সহস্রগুণে বর্দ্ধিত হইয়াছে। আমরা জানিতাম পুত্রহারা হইয়াছি—তাই অন্তর বেদনা বিস্মৃত। এখন তুমি আসিয়া জানাইলে যে, সে শুধু পুত্রই নহে মূল ভগবান্ বটেন। এখন আমি বুঝিতেছি—শুধু পুত্র হারাই নাই, ভগবানকেও হারাইয়াছি। মনে করিয়াছিলাম একটি তাম্রখণ্ড হারাইয়াছি, তুমি জানাইলে ওটি তাম্রখণ্ড নয়—একটি হীরার টুকরা। এই কথা শুনিয়া আমার বুকের বেদনা শতগুণ বর্দ্ধিত হইল। উদ্ধব, তুমি বালক—তাই অগ্নি নিভাইতে চেষ্টা করিতেছ ঘৃত ঢালিয়া। কথা বলিতে বলিতে গোপরাজ অবিরলধারায় অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন।

॥ তের ॥

শ্রীকৃষ্ণকে সখা বলিয়া ডাকিতেন অর্জ্জুন। সখ্যরসে ভালবাসিতেন তাঁহাকে। সেই সখ্যরস শিথিল হইয়া গিয়াছিল বিশ্বরূপদর্শনে, তাঁহার বিরাট ঐশ্বর্য্যের কিঞ্চিন্মাত্র অনুভবে। সখ্যপ্রীতির শিথিলতায় গৌরববুদ্ধির উদয় হইয়াছিল। তাই ক্ষমা চাহিয়াছিলেন অর্জ্জুন বিশ্বরূপের কাছে, আমায় ক্ষমা কর, এই কথা বলিয়া।

বসুদেব দেবকীর শ্রীকৃষ্ণে বাৎসল্যভাব। ঐ ভাব শিথিল হইয়া গিয়াছিল, কংসবধের ঐশ্বর্য্য দর্শনে। কংস বধের পর যখন কৃষ্ণ বলরাম প্রণাম করিতে গেলেন বসুদেব দেবকীকে, তখন তাঁহারা সাহসী হইলেন না পুত্রদের প্রণাম গ্রহণ করিতে। এত দীর্ঘ বিরহের পর কাছে পাইয়াও আদর করিতে পারিলেন না তাহাদের।

উদ্ধব মহাশয় মনে করিয়াছিলেন—শ্রীকৃষ্ণ ভগবান, এই সত্যটি যদি প্রবেশ করাইয়া দিতে পারি নন্দরাজের হৃদয়ে, তাহা হইলে অবশ্যই দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে তাঁহার কৃষ্ণ-বাৎসল্য, কমিয়া যাইবে এত হা-হুতাশ। কিন্তু এখন পরম বিস্ময়ে দেখিলেন উদ্ধব মহাশয়, যাহা ভাবিয়াছিলেন তাহা হইবার নয়। কৃষ্ণের ভগবত্ত্ব শ্রবণে শিথিল ত হইলই না বরং গাঢ়তর হইল নন্দরাজের বাৎসল্য-স্নেহ। এত ঊর্দ্ধভূমিতে অবস্থিত গোপরাজের কৃষ্ণ-বাৎসল্য যে, তাহাকে নাগাল পাইল না উদ্ধবের কণ্ঠোচ্চারিত মহাতত্ত্বকথাসকল।

অনুরাগ যদি তরল হয় তাহা হইলেই তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে ঐশ্বর্য্যবুদ্ধি ও শিথিল করিতে পারে সম্বন্ধ-জ্ঞানকে ; গাঢ় হইলে এরূপ সম্ভব হয় না। জলটা তরল বলিয়াই তাহার মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া যায় হাতখানাকে। কাঠটা গাঢ় বলিয়াই হাত ঢোকান সম্ভব হয় না, তবে একটা পেরেক প্রবেশ করান যায়। একটি লোহার বল অতীব গাঢ় বলিয়া সম্ভব হয় না কোন কিছুরই অনুপ্রবেশ তাহার মধ্যে।

যেখানে কৃষ্ণপ্রীতি তরল, সেইখানেই অবকাশ আছে অন্য চিন্তা প্রবেশের। শ্রীকৃষ্ণ বিরাট ভগবান্. এই জ্ঞান প্রবেশ করিবার অবকাশ ছিল অর্জ্জুন ও বসুদেব-দেবকীর সখ্য বাৎসল্য প্রীতির মধ্যে। সেইজন্যই ঐ জ্ঞানে দুর্ব্বল হইয়া গিয়াছিল তাঁহাদের কৃষ্ণসম্বন্ধজ্ঞান। কিন্তু নন্দ মহারাজের কৃষ্ণপ্রীতি এতই প্রগাঢ় যে, অন্য কোন ভাবনা বা বিবেচনার বিন্দুমাত্র প্রবেশের অবকাশ নাই তাহার মধ্যে। এই জন্যই উদ্ধব মহারাজের মহাতত্ত্বকথাপূর্ণ ভাষণ নন্দরাজের কর্ণে প্রবেশ করিয়া সম্পূর্ণ অক্ষম হইয়াছে তাঁহার হৃদয়ের অনুরাগের ভূমিকে স্পর্শ করিতে। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি এতাদৃশ প্রগাঢ় প্রেম সম্বন্ধে কোন জ্ঞান বা অনুভব নাই উদ্ধবের। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে ভক্তি করেন ভগবান্ জানিয়াই। ভগবান্‌কে ভগবান্ জানিয়া ভক্তি করা ভাল কথাই, কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা এই যে, ঐ জন্যই উহা ঘন হইতে পারে না। নন্দরাজ কৃষ্ণকে পরম প্রেমে আপন করিয়া লইয়াছেন পুত্র বলিয়াই। এখন সে পুত্র যে ভগবান্ ইহা শ্রবণেও লাঘব ঘটে না অনুরাগের গাঢ়তার।

ভগবানকে ভগবান জানিয়া ভক্তি করাই শাস্ত্রবিধি। উদ্ধবের কৃষ্ণপ্রীতি শাস্ত্রবিধির অধীন। নন্দরাজের কৃষ্ণপ্রীতি শাস্ত্রবিধির ঊর্দ্ধে। উদ্ধবের কৃষ্ণপ্রীতির হেতু কৃষ্ণ ভগবান। নন্দরাজের কৃষ্ণপ্রীতির হেতু নাই, উহা অহেতুকী স্বয়ংসিদ্ধ। চক্রবাল রেখা যেমন দূরে দেখা যায় কিন্তু ছোঁয়া যায় না হাত দিয়া কোন কালেই, নন্দরাজের কৃষ্ণ-অনুরাগটিও যে সেইরূপ, বুঝিতে পারিতেছিলেন উদ্ধব মহাশয় বুদ্ধির দ্বারা, কিন্তু সম্পূর্ণ অক্ষম হইয়াছিলেন স্পর্শ করিতে হৃদয়ের দ্বারা। এই অক্ষমতা সম্বন্ধে সজাগ হইয়া উঠিলেন উদ্ধব মহাশয়। কাঞ্চনজঙ্ঘা দর্শনে বিস্ময়ান্বিত হই ওখানে কোন দিনই উঠিতে পারিব না বলিয়া। নন্দরাজের অনুরাগ দর্শনে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছিলেন ভক্তশ্রেষ্ঠ উদ্ধব ঐ প্রীতির শিখরে কোন দিনই আরোহণ করিতে পারিবেন না এই অক্ষমতার অনুভবে। নন্দরাজের সম্মুখে কথা বলাই ধৃষ্টতা হইয়াছে এ কথা বুঝিলেন উদ্ধব।

উদ্ধব আর কি-ই বা বলিবেন। বলিলেন—নন্দরাজ, ইহা নিতান্তই ক্ষোভের কথা যে আমার মত অযোগ্যজন সান্ত্বনাবাক্য বলিবার চেষ্টা করিতেছে আপনার মত কৃষ্ণ-প্রেমিককে। আপনাকে যে উপদেশ-বাক্য বলিয়াছি উহা নিছক ধৃষ্টতা হইয়াছে আমার পক্ষে। এখন কষ্ট অনুভব করিতেছি ধৃষ্টতার জন্য, এখন আর প্রবোধ-বাক্য নয়, একটি প্রাণের অনুভবের কথা বলিব আপনাকে—শ্রীকৃষ্ণ যদি প্রতিজ্ঞাও করিয়া থাকেন আর ব্রজে আসিবেন না, তবু আমার দৃঢ় বিশ্বাস, অচিরাৎ ভঙ্গ হইয়া যাইবে সে প্রতিজ্ঞা। আমি নিশ্চয় করিয়াই জানি যে

শ্রীকৃষ্ণ একমাত্র অনুরাগেরই অধীন। যাদৃশ অনুরাগ তৎপ্রতি আপনাদের, তাহাতে তিনি কিছুতেই থাকিতে পারিবেন না, না আসিয়া এ বৃন্দাবনে। আপনাদের স্নেহপারিপাট্যই তাঁহাকে আকর্ষণ করিয়া অভীষ্টসাধন করিবে আপনাদের—

"আগমিষ্যত্যদীর্ঘেণ কালেন ব্রজমচ্যুতঃ।
প্রিয়ং বিধাস্যতে পিত্রোর্ভগবান্ সাত্বতাং পতিঃ॥"

আর একটি কথা বলি আপনাকে নন্দরাজ, অত কাতর হইবেন না, একটু ধৈর্য্য ধরুন সব দিক্ বিবেচনা করিয়া। আপনি শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ব্রজবাসিগণের মধ্যে, যদি এত ধৈর্য্যহারা হন আপনি তাহা হইলে সান্ত্বনা দিবে কে অপর সকলকে? আপনাদের যিনি দুধের গোপাল তিনি একমাত্র পরমাশ্রয় নিখিল জীবনিবহের।

সমস্ত রাত্রি কাটিয়া গেল নন্দরাজের সঙ্গে উদ্ধব মহারাজের কৃষ্ণকথা আলাপে। কেহ আর শয্যায় গা দিলেন না, উপস্থিত হইল ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত। বহির্গত হইলেন উদ্ধব মহাশয় স্নান আহ্নিক করিবার জন্য। বাহির হইয়াই শুনিতে লাগিলেন ঘোষপল্লীতে দধিমন্থনের ধ্বনি।

ব্রজে কতিপয় গোপী আছেন যাঁহাদের কৃষ্ণানুরাগ বিভ্রান্ত-প্রধান। অর্থাৎ তাঁহাদের কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি হয় ঘন ঘন। কৃষ্ণ ব্রজেই আছেন, তাঁহাদের সঙ্গেই আছেন এইরূপ তাঁহাদের মনে হয়, দিবারাত্রমধ্যে অধিকাংশ সময়ই। তাই তাঁহারা শয্যা হইতে উঠিয়াই দধিমন্থন কার্য্যে প্রবৃত্ত হন গোপালের জন্য, যেমনটি তাঁহারা করিতেন কৃষ্ণ ব্রজে থাকার সময়। আবার কোন কোন গোপ-জননীর প্রতি আদেশ আছে নন্দরাজার প্রত্যহ

ক্ষীর নবনীত তৈয়ারী করিবার জন্য, ইহা নিত্য মথুরায় পাঠান হয় ভৃত্যের মাধ্যমে। ঐ সকল আদেশপ্রাপ্তা জননীরাও নিযুক্ত হন প্রত্যূষে দধিমন্থন কার্য্যে।

যাঁহারা দধিমন্থন করিতেছিলেন হাতে ছিল তাঁদের মণিবলয়। প্রদীপ জ্বলিতেছিল অদূরে। প্রদীপের ছটায় উজ্জ্বলতর মণিবলয়ের দীপ্তি। "দীপদীপ্তৈর্মণিভির্ব্বিরেজুঃ" চঞ্চল হইয়াছিল তাঁহাদের বক্ষের হার ও কুর্ণকুণ্ডল মন্থনরজ্জু আকর্ষণের দোলনে। অরুণবর্ণ কুম্‌কুমে তাঁহাদের গণ্ডস্থল ছিল অরুণিম। তন্মধ্যে দোদুল্যমান মণিকুণ্ডলের আভা হইয়াছিল অতীব নয়ন-আকর্ষী। মন্থন চঞ্চলা গোপবধূগণের ছায়াসম্পাত হইয়াছিল দেয়ালের ভিত্তিতে, সেই শোভা দেখিতে দেখিতে যমুনার ঘাটে আসিলেন উদ্ধব স্নানের জন্য।

বৈজয়ন্তীমালা ছিল উদ্ধবের কণ্ঠে। নিজ কণ্ঠের মালা যাত্রাকালে পরাইয়া দিয়াছিলেন নিজ হাতে গোবিন্দ। উদ্ধবের অঙ্গের অন্যান্য পরিচ্ছদও শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদী, কোনটি বা নিজ হাতে পরান। উদ্ধবের প্রাণ চাহিতেছিল না জলে নামিয়া ঐ সকল সিক্ত করিতে, তাই সেইসকল তীরে রক্ষা করিয়া অবতরণ করিলেন স্নানের ঘাটে। স্নানান্তে ব্যাপৃত হইলেন আহ্নিককৃত্যে, তীরে সুখাসনে উপবেশন করিয়া। তখনও কাণে আসিতেছিল দধিমন্থনের ধ্বনি, শুধু ধ্বনি নহে তাহার সঙ্গে করুণ সুরলহরী।

দধিমন্থনকালে প্রেমাবেশে উচ্চৈঃস্বরে গান করিতেছিলেন ব্রজাঙ্গনাগণ। গানের বিষয়বস্তু ছিল প্রাণগোবিন্দের রূপ, গুণ, সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যের কথা। কণ্ঠে ছিল বিরহের বেদনা তাই সুরের

মধুরিমায় ধিক্কার পাইতেছিল স্বর্গের কিন্নর বিদ্যাধরেরা। কণ্ঠধ্বনি ও মন্থনধ্বনি পরস্পর আলিঙ্গনবদ্ধ হইয়া তুমুল রোল তুলিয়াছিল গগনমণ্ডলে, তাহা সর্ব্বলোকের কর্ণে প্রবেশ করতঃ দূর করিতেছিল দশ দিকের অমঙ্গল। "নিরস্যতে যেন দিশামমঙ্গলম্।"

আহ্নিক করিতে করিতে উদ্ধব শ্রবণ করিতেছিলেন কৃষ্ণানুরাগিণীগণের কণ্ঠোৎসারিত মধুর কৃষ্ণনাম ধ্বনি। এমনই আত্মহারা হইয়াছিলেন উদ্ধব ঐ ধ্বনিতে, যে তাঁহার রসনায় স্ফুরিত হইতেছিল না সন্ধ্যাবন্দনার মন্ত্রাদি। পুনঃ পুনঃই মনে হইতেছিল তাঁহার ঐ গোপীকণ্ঠের গীতধ্বনি তাঁহার উচ্চারিত মন্ত্র অপেক্ষা কোটিগুণ মধুর ও মঙ্গলদ।

কোনপ্রকারে নিত্যকর্ম শেষ করিয়া তীরে উঠিলেন ভক্তরাজ উদ্ধব। কৃষ্ণপ্রসাদী বস্ত্র ও মাল্যাদি পুনরায় ধারণ করিতে লাগিলেন। এই সময় প্রভাত হইয়া গিয়াছে। সূর্য্যের কিরণ-সম্পাত হইয়াছে ব্রজের বৃক্ষলতার গায়। কতিপয় নরনারী বহিরঙ্গণে আনাগোনা করিতেছে আর নানা কথা বলাবলি করিতেছে তোরণে বিরাট রথ দর্শন করিয়া।

"দৃষ্টা রথং শাতকৌম্ভং কস্যায়মিতি চাব্রুবন্"

এতবড় স্বর্ণরথ! এ রথ তো পল্লীর কাহারও নয়। গো-শকটের ব্রজপল্লী, এখানে এতবড় রথ কোথাকার? কেহ বলিল চেন না তোমরা, এ রথ, এতো রাজধানী মথুরার রথ। বক্তার কণ্ঠ গদ্‌গদ হইয়া উঠিল। অপর বলিল—অহো, মথুরার রথ চিনিব না? আমাদের বক্ষের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে মথুরার রথের চাকা। কত অশ্রু ঢালিয়াছি মথুরার রথের চাকা

ধরিয়া। মথুরার রথের চাকার দাগ আজও অক্ষুণ্ণ আছে ব্রজের মাটিতে ও ব্রজবাসীর বুকেতে !

অপর কেহ বলিল—অহো ! এই কি সেই রথ, যে রথে আসিয়াছিল কংসের স্বার্থসাধক অক্রূর, যে কমলনয়নকে লইয়া গিয়াছে মথুরায় ব্রজের কক্ষ হইতে ছিনাইয়া ? সকলে আকুলি ব্যাকুলি করিয়া সেই রথ দেখিয়া নানা কথা বলাবলি করিতে লাগিল।

কেহ প্রশ্ন তুলিল—সেই রথ আবার কেন ব্রজে এল, সেই অভিশপ্ত রথ কি উদ্দেশ্য লইয়া আবার দেখা দিল এই পল্লীতে ? এখানে ত সব মরিয়া রহিয়াছে, এ মৃতের শ্মশানে আবার ক্রূর-শিরোমণি অক্রূরের রথ কেন ? কেহ বা উত্তর করিল, শুন বলি, অক্রূরের পুনরাগমনের হেতু, মৃতের শ্মশানে আবার আসিবার প্রয়োজন বলি—তাহার মনিব, হীন কংসবেটা মরিয়া গিয়াছে তা ত জান। লোক মরিয়া গেলে বাকি থাকে শ্রাদ্ধশান্তি প্রেতকার্য্য। শ্রাদ্ধকার্য্যে দান করিতে হয় পিণ্ড, সে পিণ্ডের প্রয়োজনে অক্রূর আসিয়াছে। অক্রূর ত' জানে বৃন্দাবনের লোকগুলিকে বধ করিয়া গিয়াছে, এখন আসিয়াছে সেই মৃত মনুষ্যগুলির হৃৎপিণ্ড সব তুলিয়া নিতে কংসের শ্রাদ্ধে পিণ্ডদানের জন্য। এ ছাড়া আর কোন হেতু নাই কংসের রাজধানীর রথের পল্লীর শ্মশানে আসিবার।

উদ্ধব মহাশয়ের কর্ণে প্রবেশ করিল আলোচনারত ব্রজাঙ্গনা-গণের এই মর্ম্মঘাতী ভাষা। ব্যথাহত প্রাণের অমন আর্ত্তিভরা কথা, অমন হৃদয়বিদারী উক্তি আর কোন দিন কর্ণগত হয় নাই

উদ্ধবের। বিরহবিধুরা গোপীকুলের অন্তরভরা যে কত তাপ, তাহার কিঞ্চিৎ আঁচ পাইলেন উদ্ধব এই কথার মাধ্যমে। উদ্ধবের মনে হইল তাঁহার ব্রজে আসা উচিত ছিল ধূলায় গড়াইয়া, ওই রথে আসা ঠিক হয় নাই। আবার মনে হইল এই বিরহার্ত্ত ব্রজবনে সে যেন নিতান্তই অসুন্দর, এখানে আসাই অশোভন হইয়াছে। ধরিত্রীদেবী বিদীর্ণা হইলে এখন ওই রথের সঙ্গে তিনি ভূ-বিবরে লুকাইয়া যাইয়া অসুন্দরতা দূর করিতেন। ইহাই জাগিতে লাগিল অপরাধ-সংকুচিত উদ্ধব মহারাজের অন্তরে।

॥ চৌদ্দ ॥

অগ্রসর হইতেছেন উদ্ধব মহাশয়। অতীব ভারাক্রান্ত হৃদয়ে চলিতেছেন তিনি। চারিদিক্ হইতে তাঁহার উপর পড়িতেছে নরনারীর সমুৎসুক দৃষ্টি। ঘিরিয়া ফেলিল তাঁহাকে তাঁহারা সর্ব্বতোভাবে। "সর্ব্বাঃ পরিবব্রুরুৎসুকাঃ।" বলাবলি করিতে লাগিলেন তাঁরা পরস্পর—

অহো! কে গো ইনি! আমাদের দিকে ধীর পদবিক্ষেপে অগ্রসর হইতেছেন। ইঁহার গায়ের বর্ণটি শ্যামের মতই শ্যামল। কটীর ধটিখানি পীতাম্বরের মতই পীত। মুখখানি চাঁদের মত লাবণ্যযুক্ত। তার মধ্যে চক্ষু দুইটি নূতন পদ্মের পলাশের মত "নবকঞ্জ-লোচনম্।" ইঁহার বাহু দু'টি ব্রজসুন্দরের মতই

জানুপর্য্যন্ত লম্বিত, ঠিক তাঁরই মত বর্ত্তুল ও স্থূল। ইহার করে বেণু নাই বটে, কিন্তু বেণুকরের মতই টুকটুকে করতল, চম্পক-কলিকার মত করের অঙ্গুলিগুলি। বয়সটিও নব-কিশোর। গমনভঙ্গীতেও নটবর। সর্ব্বাঙ্গে সৌন্দর্য্যের উচ্ছ্বাস উপচিয়া পড়িতেছে। কে ইনি? শ্যাম বটে, শ্যাম নন।

শ্রীমান্ উদ্ধবের রূপ ও বেশ দর্শনে বিস্ময়মগ্না ব্রজবধূগণ। একে অপরকে বলিতেছে—সখী রে! আমাদের ব্রজসুন্দরের সমবয়স, সমরূপ, সমবেশ এই বিশ্বজগতে আর কেহ আছে বলিয়া জানিতাম না। রূপে গুণে শ্যামসুন্দর অসমোর্দ্ধ, কিন্তু আজ এ কী দেখিতেছি! আমাদের শ্যামনাগরেরই মত একরূপের মানুষ, সেই গতিভঙ্গীতেই অগ্রসর হইতেছেন আমাদের দিকে। বসনভূষণ যা' কিছু ইহার অঙ্গে দেখিতেছি সবই শ্যামসুন্দরের মত।

অপর এক সখী বলিতেছেন—সখী রে! ইহার বসনভূষণ শ্যামের মত এ কথা কেন বলিতেছ—ইহা শ্যামের মত নহে, শ্যামেরই। ওঁর কটির পীতাম্বর, গায়ের উত্তরীয়, কণ্ঠের মালিকা, অঙ্গের অলংকার—ওসব অচ্যুতের মত নয়, অচ্যুতেরই। তাঁর শ্রীঅঙ্গে ব্যবহৃত দ্রব্যাদিতে সর্ব্বদা লাগিয়া থাকে নিরুপম তাঁর দেহগন্ধ। সে সৌরভ চিনিতে অন্যের ভুল হইতে পারে—আমাদের নাসিকার ভুল হইবার তো কথা নয়। চির পরিচিত অনন্যসাধারণ শ্যামের অঙ্গসুরভি আমাদের নাসিকায় সদা প্রবাহিত। মনে হয় ঐ সকল দ্রব্য শ্যাম অঙ্গ হইতে খুলিয়া রাখিবার সঙ্গে সঙ্গে ইনি পরিধান করিয়া আসিয়াছেন।

তাই ভাবি কে হবেন ইনি? শ্যামের বসন ভূষণ, কিন্তু শ্যাম নয়।

শ্রীকৃষ্ণ যেদিন ব্রজ হইতে চলিয়া যান, সেইদিন ভাবী বিরহকাতরা ব্রজবধূগণ আলুথালুবেশে ছুটিয়া ঘরের বাহির হইয়া আসিয়াছিলেন অক্রূরের রথকে বাধা দিতে। 'আবার আসিব' বলিয়া কৃষ্ণ চলিয়া যাইবার পর নিয়ত রোদনপরায়ণা গোপীগণ আর ফিরিয়া নিজ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারেন নাই। কুঞ্জবনের ভিতরে, বাহিরে ও পথে পথেই তাঁহারা সতত 'হা কৃষ্ণ, হা কৃষ্ণ' বলিয়া তপ্ত অশ্রুপাত করিতেছেন। তাঁহারা যে স্থানে আছেন সেস্থান সাধারণ মানবের দুরধিগম্য। নিকট দিয়া সাতবার আনাগোনা করিলেও কুঞ্জের পথসকল চক্ষুর গোচরীভূত হয় না।

আজ অন্যের অগম্য সেই কুঞ্জবীথি ধরিয়া উদ্ধব অগ্রসর হইতেছেন। কৃষ্ণের জন বলিয়াই ইহা সম্ভব হইয়াছে। অথবা অঙ্গে কৃষ্ণের প্রসাদী দ্রব্যাদি থাকাতেই এইরূপটি হইতে পারিয়াছে। শাস্ত্রে আছে ভক্তগণ ভগবান্‌কে বলেন—

"ত্বয়োপযুক্ত স্রগ্‌গন্ধো বাসোঽলঙ্কারচর্চিতাঃ।
উচ্ছিষ্টভোজিনো দাসাস্তব মায়াং জয়েম হি॥"

হে নাথ! তোমার মায়া দুরত্যয়া বটে, কিন্তু আমরা তোমার দাসেরা তাহাকে জয় করি অনায়াসে। তোমাতে অর্পিত মালা, তোমার ব্যবহৃত বস্ত্র, অলঙ্কার, সুগন্ধ দ্বারা ভূষিত দেহে থাকি বলিয়া তোমার মায়ার আবণরকে আমরা গ্রাহ্য করি না। যার দেহে থাকে শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদী দ্রব্য, মায়া তাহার নিকট হইতে

লজ্জায় অবনত হইয়া বহু দূরে সরিয়া পড়ে। তাই আজ কুঞ্জের পথে ছিল যে যোগমায়ায় পর্দ্দাখানি, তাহা অনায়াসেই অপসৃত হইয়া গিয়াছে শ্রীমান উদ্ধব মহাশয়ের পথের অগ্রে।

উদ্ধবকে আসিতে দেখিয়া কেহ কেহ যেমন ইনি কে জানিবার জন্য আলোচনা করিতেছেন, কেহ কেহ আবার ইনি যে কৃষ্ণের জন, কৃষ্ণের বার্ত্তাবহ "সন্দেশহরঃ রমাপতেঃ" তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন। কারণ, কৃষ্ণের নিজজন ছাড়া ঐ নিভৃত কুঞ্জের পথে পা দিতে পারে এমন সাধ্য কার আছে? আর কৃষ্ণের প্রিয়জন ছাড়া কৃষ্ণের প্রসাদী দ্রব্যাদির অধিকারীই বা অন্য হইবে কিরূপে?

ব্রজাঙ্গনাগণ শ্রীউদ্ধবকে শ্রীকৃষ্ণতুল্যরূপ দর্শন করিয়াছেন। এটি কিন্তু অতীব আশ্চর্য্যের বিষয় যে, তাঁহারা তাঁহাকে-শ্রীকৃষ্ণই ইনি, এইরূপ মনে করিয়া ছুটিয়া আসিয়া জড়াইয়া ধরেন নাই। কৃষ্ণের সঙ্গে কিঞ্চিৎ কথঞ্চিৎ সাম্যদর্শনে তাঁহারা তমালকে কৃষ্ণ মনে করেন, মেঘকে কৃষ্ণ মনে করেন, যমুনার কালো জলকে কৃষ্ণ মনে করেন গাঢ় অন্ধকারকে জড়াইয়া ধরিয়া চুম্বন করেন। কিঞ্চিৎমাত্র সাদৃশ্য থাকায় অপ্রাণীতে যাঁহাদের ঘন ঘন কৃষ্ণভ্রান্তি —তাহারা আজ কিন্তু উদ্ধবের মত একটি জীবন্ত ব্যক্তি দর্শনেও কৃষ্ণভ্রান্তিতে পতিত হইলেন না।

হৃদয়ের বিশুদ্ধ ভাবই তাঁহাদের অভ্রান্ত চক্ষু। উদ্ধবকে কৃষ্ণ মনে করিয়া আলিঙ্গন করিলে রসের রাজ্যে উহা নিতান্তই দোষাবহ হইয়া পড়িত। গোপীদের চিত্তের বিমল ভাবই তাঁহাদের ধর্ম্মমর্য্যাদার রক্ষক। লক্ষ্মী, পার্বতী, অরুন্ধতী, যাঁহাদের সতীত্ব

শোষা যোষা মৃগাণামিব

দবদহনসন্ত্রস্তনেত্রা বিসৃষ্টাঃ ॥"

—তাঁহাদের অত্যন্ত ক্ষীণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। কেশপাশ নিতান্ত অযত্নে আলুথালু। তাঁহাদের পরিহিত বস্ত্রখণ্ডে কত মলিনতা। তাঁহাদের অঙ্গকান্তির সমুজ্জ্বল ছটা আজ নিষ্প্রভ, ঠিক ধূমভস্মাবৃত অগ্নির মত।

শ্রীকৃষ্ণ-বদন দর্শনের সুতীব্র লালসায় তাঁহাদের চক্ষুগুলি সুব্যগ্র, পিপাসার্ত্ত, সুচঞ্চল। সুদীর্ঘ দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগে তপ্ত বাতাসের চাপে ও তাপে তাঁহাদের অরুণাধরগুলি যেন বিমর্দিত, বিদলিত। শ্রীমুখপদ্মের মধ্যস্থলগুলি সর্ব্বাধিক বিশুষ্ক ও বিশীর্ণ। যে মহাভীতির ছবি থাকে দাবানল-তপ্ত বনমৃগীর চাহনীতে, তাহাই আজ সুপ্রকট কৃষ্ণবিরহ-ভীতা গোপাঙ্গনা-কুলের শ্রীমুখে ও চোখে! বিরহরসের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে আজ বনপ্রান্তে বিরাজমানা ব্রজরামাগণ উদ্ধবের গোচরীভূতা হইলেন কোনও অনির্ব্বচনীয় সৌভাগ্যের ফলে।

অতি নিকটস্থ উদ্ধবকে ব্রজবধূগণ রমাপতির সন্দেশবাহক দূত বলিয়া জানিলেন। জানিয়া বসিতে দিলেন একটি ক্ষুদ্র আসন। শত জীর্ণ-শীর্ণ ছিন্ন মলিন সে আসনখানি—কৃষ্ণহারা গোপিকার অন্তরেরই তুল্য। পূজ্যজনের প্রদত্ত আসন প্রতিগ্রহ সদাচার-সম্মত নয়। উদ্ধব কৃষ্ণদাসাভিমানী। প্রভুর প্রিয়াগণ কর্ত্তৃক প্রদত্ত আসনে উপবেশন করিলে শুদ্ধ আচারের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়। কৃষ্ণদাস তাহা পারেন না। উদ্ধব তাই ঐ আসনে বসিতে পারিতেছিলেন না, পক্ষান্তরে যিনি আসন দিয়া বসিতে

আদেশ করিয়াছেন তাঁহার আদেশ লঙ্ঘনেও অপরাধের আশঙ্কা —তাই আসন ও আদেশ— দুই এর মর্য্যাদা রক্ষা করিলেন উদ্ধব আসনখানিকে দক্ষিণ-হস্ত দ্বারা স্পর্শ করতঃ অবনতশিরে আসনের পার্শ্বে ভূতলে উপবেশন করিয়া।

শ্রীগ্রন্থে মূল শ্লোক "উপবিষ্টমাসনে" এইরূপ উল্লেখ আছে। ঐ সপ্তমী বিভক্তিটি সামীপ্যাধিকরণে প্রযুক্ত এরূপ জানিয়া ব্যাকরণেরও মর্য্যাদা রাখিতে হইবে। আসনের সমীপে বসিলেন শ্রীমান উদ্ধব। পূর্বে কিন্তু তাঁহাকে কোনও দিন দর্শন করেন নাই গোপরামাগণ। তথাপি তাঁহারা তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিলেন চিরপরিচিতজনের মতই। পদ্মের কোষে থাকে মধু, তারই গন্ধে মধুপ আসিয়া পদ্মকে ঘিরিয়া বসে। উদ্ধব ভক্ত, নিয়ত কৃষ্ণপাদপদ্মধ্যানরত। উদ্ধবের বুকের মধ্যে আছে শ্রীকৃষ্ণ-চরণাম্বুজ। তাহারই সৌরভে আকৃষ্ট হইয়াই বুঝি বা অলিকুলের মত গোপরামাগণ উদ্ধব-পদ্মকে বেষ্টন করিয়া বসিলেন।

॥ পনর ॥

বিজাতীয় ভাবের অগোচর ব্রজনিকুঞ্জ। সেই নিকুঞ্জপথে আসিতেছেন উদ্ধব। ইহাতেই গোপবালাগণ বুঝিয়াছেন যে, ইনি রমাপতির নিজ লোক এবং কোন বিশেষ বার্ত্তাবহ। এক গোপিকা অতি ক্ষীণকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—

"জানীমস্ত্বাং যদুপতেঃ পার্ষদং সমুপাগতম্"

তুমি যদুপতির একজন পার্ষদ। এটা আমরা সকলেই বুঝিতে পারিতেছি। যদি বল পরিচয় না দিতেই বুঝিলেন কি করিয়া? —তবে বলি, শোন। তুমি আমাদের চক্ষুর কাছে অপরিচিত বটে, কিন্তু গায়ের যে গন্ধ তাহা আমাদের ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের কাছে চির পরিচিত। পরিচয় গ্রহণে চক্ষুরই যে একচেটিয়া অধিকার এমন কোন আইন নাই। নাসিকার যোগ্যতাও প্রশ্নাতীত। অন্যের কথা জানি না, আমাদের নাসিকা অভ্রান্ত। অঙ্গগন্ধে আমরা তোমাকে চিনিয়াছি তুমি যদুপতির লোক।

গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের নাম বলিতে বলিয়াছেন, "যদুপতি"। গোপিকাদের সঙ্গে সমপ্রাণতায় শ্রীশুকদেবও বলিয়াছেন "রমাপতি"। এখন আর কৃষ্ণ ব্রজবল্লভ নাই। সে-সম্বন্ধের ভিত্তি ছিল প্রীতি, তাহা সে মুছিয়া ফেলিয়াছে। প্রীতিকে মুছিয়া আদর করিয়াছে ঐশ্বর্য্যকে। ব্রজপতি তাই রমাপতি হইয়াছেন। ব্রজজন ভুলিয়া মজিয়া আছেন যদুগণ সঙ্গে। তাই ব্রজনাথ না বলিয়া যদুনাথ,

যদুপতি বলাই সঙ্গত। ফুলটি গাছে থাকিলে গাছের পরিচয়। ছিঁড়িয়া কেহ মালায় পুরিলে মালারই পরিচয়। ব্রজের প্রাণসর্বস্ব গোচারক রাখালরাজ আজ রাজবংশীয় যাদবগণের অধীশ্বর। সুতরাং নব পরিচয়ই ভালো, পুরাণো কথায় কাজ কি? অবলুপ্ত সম্বন্ধের অপপ্রয়োগের উপযোগিতা কোথায়?

হাঁ উদ্ধব, তোমাকে চিনিলাম যদুপতির লোক, গায়ের গন্ধে। আর যদি বল তাঁর লোক না হয় হইলাম, তাঁর যে পার্ষদ তা কি করিয়া জানিলেন, তা বলি শোন। পার্ষদ চিনিয়াছি—মূল্যবান অলঙ্কারে ও বসনে। পরিচ্ছদই ত রাজপুরুষদের পরিচায়ক। রাজপুরুষ তুমি, পোষাকেই পরিচয়। রাজপুরুষ নিজ পরিচ্ছদ ছাড়িয়া প্রায়শঃই পথ চলে না। আর বিশেষ করিয়া দীনহীনা কাঙ্গালিনীদের চমক দিতে হইলে বসনভূষণের জৌলুস অপরিহার্য্য।

আচ্ছা, তোমাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করি—এই মূল্যবান বেশভূষায় কি তুমি নিজেই সাজিয়া আসিয়াছ অথবা তোমার প্রভু এই বনবাসিনী কাঙ্গালিনীদিগকে তাঁর ঐশ্বর্য্য দেখাইবার জন্য নিজেই তোমাকে সাজাইয়া গোজাইয়া পাঠাইয়া দিয়াছেন? আরও একটি কথা জানিবার আছে—এই গো-ব্রজে তুমি কি স্বয়ং-প্রবৃত্ত হইয়া আসিয়াছ অথবা কেহ প্রেরণ করিয়াছে? তুমি স্বয়ং-প্রবৃত্ত হইয়া আসিয়াছ এমত মনে হয় না। কেন না, এই গরু চরাবার মাঠে রাজপুরুষদের কোন প্রয়োজন থাকিতে পারে না। তবে মনিব যদি আদেশ করিয়া থাকেন "ভত্রে'হ প্রেষিতঃ" তবে সবই সম্ভব। দাস হইয়া মালিকের হুকুম লঙ্ঘন

করিতে পার নাই তাই আসিয়া থাকিবে। যদি বলি কর্ত্তাই বা তোমাকে এই গরুর মাঠে পাঠাইবেন কেন? আমরাও তাই ভাবি পাঠাইবেন কেন? কি কার্য্য সাধনের জন্য?

যদি বল আমাদিগকে খবর দিবার জন্য পাঠাইয়াছেন, তাহা আমরা কখনই বিশ্বাস করিতে পারি না, কারণ আমরা তাঁহার কেহই নই, তিনিও আমাদের কেহই না। তাঁর সহিত আমাদের কোন সম্বন্ধই নাই বা ছিল না। হাঁ ছিল বটে একটি সম্বন্ধ—প্রীতির সম্বন্ধ—যেটি স্বীকৃতিতেই বাঁচে, অস্বীকৃতিতে মরিয়া যায়। সুদীর্ঘ অস্বীকৃতির ফলে সে সম্বন্ধ চিরতরে ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। সুতরাং এই গরুর মাঠে তাঁহার স্মরণযোগ্য কিছু আছে বলিয়া ত আমাদের মনে হয় না।

"গোব্রজে তস্য স্মরণীয়ং ন চক্ষ্মহে"

তবে না, কথাটি ঠিক হয় নাই। একটি স্থান আছে বটে, যেখানকার সম্বন্ধ সে অস্বীকার করিতে পারে না কোন মতেই। যেমন একটি ঘট তৈয়ারী করিতে কুম্ভকারের চক্র লাগে, দণ্ড লাগে ও মৃত্তিকা লাগে। ঘট ইচ্ছা করিলে চক্র ও দণ্ডকে অস্বীকার করিতে পারে—গর্ব্বে বলিতে পারে, আমার সৃজন কার্য্যে কোন চক্র বা দণ্ড লাগে নাই। কিন্তু মৃত্তিকাকে সে কখনও অস্বীকার করিতে পারে না। ঘট কখনও বলিতে পারে না আমার নির্ম্মাণকার্য্যে মাটি লাগে নাই।—কেন না—মাটিতো এখনও তাহার দেহময়, তার সত্তাই তো মৃন্ময়, সুতরাং মৃৎকে অস্বীকার করিবার তার কোন উপায় নাই। সেইরূপ তোমাদের যদুপতি আমাদের সকলের সঙ্গে সকল সম্বন্ধ

অস্বীকার করিতে পারে—কিন্তু পিতামাতা ব্রজরাজ ব্রজেশ্বরীর সঙ্গে সম্বন্ধ অস্বীকার করিতে পারিবে না কিছুতেই। পিতৃমাতৃ-সম্বন্ধ গৃহত্যাগী মুনিঋষিরাও ত্যাগ করিতে পারে না "মুনেরপি সুদুস্ত্যজঃ"। নন্দ যশোদা হইতেই তাঁহার ঐ দেহখানি। তাঁহাদের নিত্য আদরেই তুষ্টপুষ্ট ও বর্দ্ধমান হইয়াছে তাঁহার ঐ প্রাণহরা কান্তিখানি। অতএব তাঁহাদিগকে ভুলিয়া যাওয়া সম্ভব হয় নাই। কারণ, তাঁহাদের সহিত সম্বন্ধ ত্যাগ করিলে নিজ অস্তিত্বই বিলুপ্ত হইয়া পড়ে। তাই সম্ভবতঃ তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা দিবার জন্য ব্রজে পাঠাইয়াছেন।

নন্দ যশোমতীর স্নেহের অনুবন্ধন দুস্ত্যজ। তাই মধুপুরী হইতে মধুপতি তোমাকে এখানে পাঠাইয়াছেন। তা বেশ, ভাল কথাই! তবে মনে বড় খেদ ওঠে একথাটা ভাবিতেই যে, কাঙ্গালের ছেলে যদি ভাগ্যবশতঃ রাজপদবী লাভ করে, তাহা হইলে কাঙ্গাল পিতামাতার পুত্রকৃত এইরূপ অবমাননাই লাভ করিতে হয়। একদিন যাঁহাদের বুকভরা স্নেহে লালিত পালিত পোষিত হইয়াছেন, আজ কিনা তাঁহাদের সংবাদ নিতে বাড়ীর চাকর পাঠাইয়াছেন—নিজে আসিতে পারেন নাই!

তা ভালই, একটা কথা বলি,—তোমার গায়ের যে এই মহার্ঘ্য বসন ভূষণ ইহা কি তুমি নিজে পরিধান করিয়া আসিয়াছ, কিংবা তিনি নিজ হাতে পরাইয়া দিয়াছেন—পিতামাতাকে দেখাইবার জন্য? মধুপুরীর ঐশ্বর্য্যের জৌলুস পিতামাতাকে দেখাইয়া তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা দিবার জন্য?

তা ভাল কথাই। যদি পিতামাতাকে সংবাদ দিতে আসিয়াছ

তুমি মথুরার রাজদূত, তাহা হইলে পথ ভুলিয়া দিশাহারা হইয়া এদিকে আসিয়াছ কেন? সেখানে যাইবার এ ত রাস্তা নয়। তুমি এখান হইতে বাহির হইয়া, ঐ দিককার রাস্তা ধরিয়া যাও। যথাসম্ভব দ্রুত যাও। পিতামাতাকে দেখা দেও। তাঁহারা তোমাকে দেখিয়া মহানন্দসিন্ধুর মাঝে ডুবিয়া যাইবেন—কারণ পুত্র খবর পাঠাইয়াছে পিতামাতাকে, বিরহকাতর পিতামাতাকে, শতছিন্ন ধূলিমলিন বস্ত্রে আবৃতদেহ নন্দ যশোদাকে খবর দিতে ভৃত্য পাঠাইয়াছে, মথুরার ঐশ্বর্য্য দিয়া তাহার দেহ সাজাইয়া মা বাবাকে নিজ বৈভবের জৌলুস দেখাইতে। ইহা জানিয়া দেখিয়া পিতামাতার আনন্দের আর পরিসীমা থাকিবে না। যাও, শীঘ্রই যাও, এপথ ছাড়িয়া ঐ পথে অগ্রসর হও।

গোপীদের কথায় উদ্ধব যেন মরমে মরিয়া গেলেন। তাঁহার মনে হইল ঐরূপ মূল্যবান পোষাক পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া তাঁহার ব্রজে আসা নিতান্তই অশোভন হইয়াছে। ব্রজে আসিবার কালে ঐ সাজে যখন কৃষ্ণ নিজ হাতে সাজাইয়া দিয়াছিলেন তখন তাঁহার মনে হইয়াছিল তাঁহার জীবন ধন্য। আর এখন উদ্ধব বিরহ-মলিন গোপরামাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া নিজেকে ও নিজের বস্ত্রালংকারগুলিকে সহস্র ধিক্কার দিয়া ভাবিলেন, ধরিত্রী-জননী যদি এখনই কৃপা করিয়া দুইখণ্ডে বিভক্ত হইতেন তাহা হইলে তাঁহার গর্ভে প্রবেশ করিতাম। সেখানে কোন গাঢ়ান্ধকারে প্রবেশ করিয়া কোন মহাবেদনার ঘনমসী নিজ বদনে ও বসনে মাখিয়া আসিতাম। তাহা হইলে বুঝি বা ঐ বিরহমলিনতার পার্শ্বে দাঁড়াইবার কিঞ্চিৎ

যোগ্যতা হইত আমার। মর্ম্মে মর্মে তীব্র ধিক্কারের দংশন অনুভব করিতে লাগিলেন উদ্ধব—গোপীর বিরহ-মলিনতার কাছে তাঁহার ভূষণের ছটা যে কত বিড়ম্বিত! নির্ম্মম আত্মগ্লানিভরা বুকে দাঁড়াইয়া রহিলেন উদ্ধব সর্ব্বংসহা ধরণীর বুকের দিকে চাহিয়া।

———

॥ ষোল ॥

ব্রজাঙ্গনাগণ বলিলেন—"শ্রীদাম সুবল প্রমুখ কৃষ্ণসখাগণ মথুরা হইতে ফিরিয়া আসিয়া তোমার নাম বারংবার বলিয়াছে আমাদের কাছে। আরও শুনিয়াছি তোমার রূপ-গুণ, বেশভূষা অনেকাংশে কৃষ্ণেরই মত। তাই তোমাকে চিনিতে আমাদের বিলম্ব হয় নাই। তোমার সম্বন্ধে আরও কথা কাণে আসিয়াছে। মধুপুরীতে কৃষ্ণের রসিক-সখাগণের মধ্যে তুমিই না কি সর্বশ্রেষ্ঠ। তাই আমরা মনে করিতেছি একটা কথা জিজ্ঞাসা করিব তোমাকেই!

বল দেখি উদ্ধব, কোন্ প্রীতি নষ্ট হইয়া যায়, আর কোন্ প্রীতি থাকে চিরকাল? আমাদের ত মনে হয়, যে প্রীতি হৈতুকী তাহাই বিনাশ্য, আর যে প্রীতি অহৈতুকী তাহাই অবিনশ্বর। যে কোন বস্তুই হউক আর ভাববন্ধনই হউক যাহার উৎপত্তির মূলে কোন হেতু আছে তাহাই নাশপ্রাপ্ত হইবে

হেতুর নাশে। আর যাহার কোন কারণ নাই—যাহার প্রকাশ স্বতঃ সহজ, অহৈতুকী, তাহা কোনও কালে বিনাশ্য নহে। অহৈতুকী প্রীতি তাহা হইলে অবিনাশী।

ইহা যদি ঠিক হয়, উদ্ধব, তাহা হইলে এই জিজ্ঞাসা জাগে —তোমার প্রভুর সঙ্গে আমাদের প্রীতির সম্বন্ধ একেবারেই মুছিয়া গেল কিরূপে? তোমার প্রভুকে আমরা যে প্রীতি করিতাম, তাহাতে কোন কারণই ছিল না। কোনও প্রয়োজন সিদ্ধির মতলব ছিল না। আর যে তিনিও আমাদের প্রীতি করিতেন, তাহাতেও কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধির অভিসন্ধি ছিল না। এ বস্তু ত বিশুদ্ধ। প্রীতির এতাদৃশ সম্বন্ধ সমূলে নাশ হইল কোন্ পথে? ঐরূপ কারণহীন শ্রদ্ধা প্রীতিকে তোমার প্রভু একেবারে মুছিয়া ফেলিলেন কোন্ কৌশলে?

শুন উদ্ধব, হেতুজ-প্রীতি বিনাশ্য, তাহার দৃষ্টান্ত জগৎ ভরিয়া আছে বহু বহু। কিন্তু উহার বিপরীত দৃষ্টান্ত একটিও নাই। শোন, নাশশীল প্রীতির দুই চারিটি প্রমাণ দেখ। ভ্রমর-গুলি ফুলকে ভালবাসে, কত গুণ গায়, কত মুখ চুম্বন করে কিন্তু ঐ প্রীতি স্থায়ী হয় না, উহা নাশপ্রাপ্ত হয় যখন মধু ফুরাইয়া যায়। প্রীতির হেতু ছিল মধু। 'তৎসত্ত্বে তৎসত্ত্বা তদসত্ত্বে তদসত্ত্বা'। কামুক পুরুষ রমণীদের উপর প্রীতির অভিনয় করে —স্বার্থসিদ্ধির জন্য। সার্থটি সিদ্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রীতির পাত্রের প্রতি অনাদর দৃষ্ট হয়। "পুংভিঃ স্ত্রীষু কৃতা যদ্বৎ সুমনঃস্বিব ষট্পদৈঃ" গণিকাগণও প্রীতি দেখায় ধনী যুবকদের প্রতি। ততদিনই দেখায়, যতদিন তাহাদের ধন থাকে। ধন

ফুরাইয়া গেলেই প্রীতির নাশ ঘটে। প্রীতির হেতুই হইল ধনপ্রাপ্তি। ঐ স্বার্থ লইয়াই করে প্রীতির অভিনয়। ঐ উপাধির অভাবে প্রীতি পরিণত হয় শূন্যতায়। "নিঃস্বং ত্যজন্তি গণিকাঃ।" প্রজারা রাজাকে ভালবাসে, তার মূলেও কিন্তু উপাধি আছে। রাজা প্রজাপুঞ্জের কল্যাণ করিবেন এই হইল মূল হেতু। রাজার যখন প্রজাপালনের শক্তি না থাকে বা থাকিলেও প্রজার মঙ্গল কার্য্যে উদাসীন থাকেন, পরম রাজভক্ত প্রজারাও তখন বিদ্রোহ সৃষ্টি করে রাজার বিরুদ্ধে। কল্যাণ পাইব এই হেতু বা উপাধির উপরে রাজা-প্রজার প্রীতি স্থাপিত। হেতু নাশে প্রীতি নাশ অবশ্যভাবী "অকল্পং নৃপতিং প্রজাঃ"।

বিদ্যার্থী ছাত্রগণ আচার্য্যকে 'প্রীতি করে ততদিনই, যতদিন পর্য্যন্ত নিজের বিদ্যার্জ্জন কার্য্য পরিসমাপ্ত না হয়। অধ্যয়ন শেষ হইয়া গেলে আর অধ্যাপকের অনুসন্ধান করে না। কারণ, বিদ্যাধ্যয়নরূপ স্বার্থোপাধি লইয়াই ছাত্রগণ অধ্যাপককে প্রীতি করিত, তাহার অভাবে প্রীতি থাকিবে কিরূপে? "অধীতবিদ্যা আচার্য্যম্।" পুরোহিতেরা যজমানের প্রতি প্রীতি প্রদর্শন করে ততক্ষণই, যতক্ষণ যজমান দক্ষিণাদি দান না করেন "ঋত্বিজো দত্তদক্ষিণম্।" পুরোহিতের প্রীতির হেতু ছিল দক্ষিণা লাভ। সেটি ফুরাইলে প্রীতির স্থিতি হইবে কী অবলম্বনে? পক্ষিকুল বৃক্ষকে ভালবাসে. দলে দলে আসিয়া বসে তাহার শাখায় কিন্তু কতদিন —যতদিন ফলবান্ থাকে বৃক্ষটি। ফল ফুরাইলে আর একটি পাখীও ফিরিয়া তাকায় না সেই বৃক্ষের দিকে। উপাধি ছিল ফলভোগ। ফল গেল, প্রীতির অভিনয়ও গেল "খগা বীতফলং

বৃক্ষং”। পথিকেরা পথ চলিতে চলিতে গৃহীর গৃহে অতিথি হয়। সেই গৃহীর প্রতি ততক্ষণই তাহারা আদর প্রদর্শন করিয়া থাকে, যতক্ষণ তাহাদের ভোজনরূপ কার্য্যটি নিষ্পন্ন না হয়। ভোজনরূপ স্বার্থ সম্বন্ধ লইয়া গৃহীর প্রতি অতিথির প্রীতি। ভোজন নিষ্পত্তি হইয়া গেলে আর আদর করিবে কেন? “ভুক্তাঃ চাতিথয়ো গৃহম্।” মৃগগণ বনের প্রতি প্রীতি প্রদর্শন করে, যতক্ষণ বনটি দাবানলে পুড়িয়া না যায়। দাবানল-দগ্ধ বনের প্রতি মৃগের আর আদর থাকে না কারণ, অরণ্যে বাসরূপ স্বার্থোপাধি লইয়াই মৃগগণের বনের প্রতি ভালবাসা। বাসরূপ প্রয়োজন সিদ্ধির অভাবে আর বনের প্রতি আদর থাকিবে না “দগ্ধং মৃগাস্তথারণ্যং”। যাহারা জার, তাহার পর-রমণীকে ভোগ করিয়াই ত্যাগ করে। সাময়িক প্রীতির কৃত্রিম অভিনয় হয় মাত্র, বস্তুতঃ প্রীতির সৃষ্টি সেখানে হয় না। ভোগরূপ উপাধিহেতুই মিলন। তদভাবে পরিত্যাগ। এই সকল সহৈতুকী, সকৈতব, সোপাধিক প্রীতির কথা। কিন্তু উদ্ধব তোমার প্রভুকে আমরা যে প্রীতি করিয়াছি, তাহাতে কোন দিনই ছিল না কোন প্রয়োজনসিদ্ধির অভিসন্ধি। আর সেও কত প্রীতি করিয়াছে আমাদিগকে, কোন প্রয়োজনসাধনের মতলব তাহাতেও কুত্রাপি লক্ষ্য করি নাই। তাহাই যদি হইল, তবে ওই অহৈতুকী, অকৈতব ভালবাসায় কেন আসিল বিরহের প্রবল সন্তাপ? কৈতব মানে ছলনা। শুনিয়াছি কৈতবহীন অর্থাৎ খাঁটী প্রেমে বিরহ নাই। উদ্ধব, তুমি যদি রসিকের সখা রসিকজন হও, তাহা হইলে উত্তর দিতে পারিবে এই

প্রশ্নের। আর যদি না পার, বুঝিব তুমি অন্য শাস্ত্রে মহা পণ্ডিত হইলেও রসশাস্ত্রে নিতান্ত অনভিজ্ঞ।

শোন উদ্ধব, আমরা যতখানি বেদনাহত প্রভুর বিরহে, তদপেক্ষা অধিক মর্ম্মাহত নিরুপাধি প্রীতিতে যে কলঙ্ক লাগিল এই ভাবনায়। যে প্রীতির মধ্যে কৃত্রিমতা ছিল না এতটুকু, তাহাতে কেন ঘটিল এমন দুরন্ত বিরহ? কৃত্রিম প্রীতির বহু দৃষ্টান্ত তোমাকে দিয়াছি যাহাতে প্রয়োজন মিটিয়া গেলেই প্রীতি নিঃশেষ হইয়া যায়। আজ আমাদের প্রীতিও যখন ফুরাইয়া গেল, তখন ইহাও এই কৃত্রিম প্রীতিরই একটি নিদর্শন, জগতের লোক এইরূপ ভাবিবে। নির্দ্দোষ বস্তুকে লোক দোষযুক্ত মনে করিবে। আমাদের এই ঘটনায় জগতের লোক আর কেহ কোন দিন আমাদের প্রাণনাথকে ভালবাসিবে না। অহো! ইহা অপেক্ষা মর্ম্মাঘাতী ঘটনা আর কী হইতে পারে? বল উদ্ধব, এমন হইল কেন?"

শ্রীমান্ উদ্ধব মহা পণ্ডিত, 'সর্ব্ব শাস্ত্রপারঙ্গম'। কিন্তু এই প্রশ্নের উত্তর দিতে সে সর্ব্বতোভাবে অপারগ। ঐরূপ যে একটা প্রশ্ন উঠিতে পারে ইহাও উদ্ধবের ধারণাতীত। তাহার প্রভু শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে ঐরূপ জিজ্ঞাসাও যে কেহ করিতে পারে, ইহা তাহার ভাবনা-রাজ্যের সীমান্তেও নাই। স্তব্ধ হইয়া উদ্ধব কেবল অভিনব প্রশ্নকারিণীদের বেদনাভরা কণ্ঠের অভিমানপূর্ণ বাক্য শুনিতে লাগিলেন। জীবনে কখনও এমনটি শোনেন নাই উদ্ধব। অবাক বিস্ময়ে শুনিতেই লাগিলেন।

উত্তর না পাইয়া মনে ভাবিলেন ব্রজরামাগণ, অ-রসজ্ঞের

কাছে রসের প্রশ্ন নিতান্তই ভুল হইয়াছে। ইহার ফল মনোবেদনাই মাত্র। তাহা কে বলিয়া দিবে ব্রজসুন্দর কেন ত্যাগ করিলেন এই হতভাগিনীদিগকে? এই কথা বলিতে বলিতে তাঁহাদের মনপ্রাণ ও দেহের সমস্তগুলি ইন্দ্রিয় ও বৃত্তি শ্রীকৃষ্ণভাবনাময় হইয়া গেল। ভালমন্দ অনুসন্ধান করিবার সামর্থ্য আর তাঁহাদের রহিল না।

ইতি গোপ্যো হি গোবিন্দে
গতবাক্‌কায়মানসাঃ।
কৃষ্ণদূতে সমায়াত উদ্ধবে
ত্যক্তলৌকিকাঃ॥
১০।৪৭।৯

নামটি যাঁহার কৃষ্ণ—স্থাবর জঙ্গম নরনারী সবাইকে আকর্ষণ করাই যাঁহার স্বভাব, সেই কৃষ্ণের দূত উদ্ধবকে দর্শন করিয়া গোপীগণ নিরতিশয়ভাবেই কাতর হইয়া পড়িলেন। লৌকিক বিচার ব্যবহার ভাবনা তাঁহাদের বিন্দুমাত্র রহিল না। অপরিচিত বা নূতন পরিচিত বিদেশী উদ্ধবের সম্মুখেই তাঁহারা নিঃসঙ্কোচে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁহাদের রহস্যময়ী প্রেমের কথা বলিয়া আকুল ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

হা কৃষ্ণ, হা ব্রজনাথ, হা গোপীবল্লভ, হা আর্ত্তিনাশন, এইরূপ মর্ম্মবেদনাযুক্ত ভাষায় ডাকিতে ডাকিতে ব্রজরমণীগণ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। মথুরার দিকে মুখ করিয়া ঊর্দ্ধ বাহু হইয়া তীব্র ব্যথাভরা সুরে বলিতে লাগিলেন—হে ব্রজপ্রাণ, একটিবার আসিয়া দেখিয়া যাও তোমার ব্রজের দশা। বাল্যাবধি আমরা

তোমা ছাড়া কিছু জানি না। তোমারি জন হইয়া আজ ডুবিয়া যাইতেছি আমরা নিবিড় শোকের গভীর সাগর তলে। একটিবার ব্রজে আসিয়া শ্রীচরণতরী-দানে রক্ষা কর। তখন উচ্চকণ্ঠে এইরূপ বিলাপে অতিথি উদ্ধব কি মনে করিবেন এই লোকলজ্জা তাঁহাদের একবিন্দুও থাকিল না। শ্রীশুক তাই কহিয়াছেন, তাঁহারা 'ত্যক্তলৌকিকাঃ'—তাঁহারা প্রাণ খুলিয়া গান করিতে লাগিলেন। প্রাণপ্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের বাল্যবেলার মধুর লীলা-সকল স্মরণ করিয়া, বর্ণনা করিয়া গাহিতে লাগিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের মধুকৈশোরের যে সকল মাধুর্য্যময় খেলা, একের পর এক তাঁহাদের স্মৃতিপথে উদিত হইতে লাগিল। তাহা স্মরণ করিয়া ব্রজবধূগণ উন্মাদিনীর মত গান করিতে লাগিলেন—

"গায়ন্ত্যঃ প্রিয়কর্ম্মাণি রুদন্ত্যশ্চ গতহ্রিয়ঃ।
তস্য সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য যানি কৈশোরবাল্যয়োঃ ॥"

১০।৪৭।১০

ভাবাবিষ্টা উন্মাদিনী ব্রজরামাগণের তীব্র ব্যাকুলতাভরা আর্ত্তিবাণী শুনিতে লাগিলেন উদ্ধব মহারাজ। এমন কথা, এমন ব্যথা, এমন নিদারুণ ভাষা শ্রুতিগোচর হয় নাই আর কোনদিন কোনও লোকের। উদ্ধব ধন্য মনে করিতে লাগিলেন আপনার জীবনকে। অন্তরের গোপনে বলিতে লাগিলেন—

"বন্দে নন্দব্রজস্ত্রীণাং পাদরেণুমভিক্ষ্ণশঃ।
যাসাং হরিকথোদ্‌গীতং পুনাতি ভুবনত্রয়ম্ ॥"

১০।৪৭।৬৩

ত্রিজগৎ পবিত্র করে যাঁহাদের কণ্ঠোদ্‌গীর্ণ হরিকথাগীতি, আমার মাথার ভূষণ করি তাঁহাদের পাদরেণু। শিরে তুলিয়া এঁদের পদধূলি সার্থক করি আমি আমার জ্ঞানশুষ্ক এই জীবন।

॥ সতের ॥

উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে গোপীকাগণ কয়েক পা অগ্রসর হইলেন। উদ্ধব অনুগমন করিলেন। নিভৃত নিকুঞ্জের অন্তঃপুরে কৃষ্ণবিরহের মূর্ত্তিমতী বিগ্রহ পড়িয়া আছেন, অষ্টসখীপরিবৃতা। অন্য সকল সখীগণ আসিয়া তাঁহাদিগকে ঘিরিয়া বসিলেন। উদ্ধব দেখিলেন, মধ্যস্থলে এক অনন্যসাধারণ মহাদেবী মূর্ত্তি শায়িত আছেন, কি ভাবে?—

"সখী-অঙ্কে হিম বপু রসনা অবশ।
পাণিতল ধরাতলে শেষ দশা দশ॥"

—হরিকথা

বিরহ-বেদনার ঘনায়িত বিগ্রহ দেবী অতি ক্ষীণকণ্ঠে সখীদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছেন—সখিরে, কি আর বলিব, গোকুল পতির বিচ্ছেদ-সন্তাপ "বিশ্লেষ-জন্মাজ্বরঃ" পুটপাক হইতেও অধিকতর উত্তাপযুক্ত "উত্তাপী পুটপাকতোঽপি" তীব্র জ্বালা, কালকূট বিষ অপেক্ষা চিত্তক্ষোভকারী "গরলগ্রামদপি ক্ষোভণঃ" বজ্র হইতেও দুর্ব্বিসহ "দম্ভোলেরপি দুঃসহঃ" বক্ষমগ্ন

শেল হইতেও মর্ম্মঘাতী। ভীষণ বিসূচিকা-রোগীর জ্বালা হইতে কোটীগুণ অধিক। এই ভয়ঙ্কর বিরহ-সন্তাপ প্রতিক্ষণে আমার মর্ম্মস্থল চূরমার করিয়া দিতেছে। "মর্ম্মণ্যন্ত ভিনত্তি।" সখী, এ তাপ আর সহ্য হয় না। এ দেহ বাঁচাইয়া রাখিবার আর প্রয়োজনও দেখি না। এ ব্যর্থ জীবন এখনই ত্যাগ করিব। ললিতা বলিলেন—"রাধে, দেহত্যাগ করিলে কি কৃষ্ণ পাবি?" শ্রীমতী কহিলেন—আমার বিশ্বাস নিশ্চয়ই দেহ ত্যাগ করিলে কৃষ্ণ পাব। আমি পৌর্ণমাসী দেবীর মুখে শুনিয়াছি, মানুষ যে সঙ্কল্প করিয়া দেহত্যাগ করে মৃত্যুর পর সে সেই গতিই লাভ করে। ইহাই আমার ভরসার কথা—আমি এই সঙ্কল্প হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে ধারণ করিয়া প্রাণত্যাগ করিব যে, মৃত্যুর পর আমার দেহেতে যেটুকু মাটির অংশ আছে সেটুকু মথুরায় যে পথে প্রাণনাথ নিত্য গতায়াত করেন সেই পথের ম্যাটির সঙ্গে মিশিয়া যাউক। যেন তাঁর চরণযুগল নিয়ত হিয়ায় ধারণ করিতে পারি। দেহান্তে আমার এই শরীরে যেটুকু জলের ভাগ আছে তাহা, মথুরায় যে বিহার-দীর্ঘিকায় নিত্য স্নানাবগাহন করেন আমার শ্যামসুন্দর, সেই সরসীর জলের সঙ্গে মিশিয়া যাউক, তাহা হইলে স্নানকালে প্রাণদয়িতের অধর চুম্বন করিতে পারিব। স্নানান্তে মথুরেশ যে দর্পণে নিজ বদনবিম্ব দর্শন করেন, আমার দেহের তেজাংশ সেই দর্পণের সঙ্গে মিশিয়া থাকুক—আমার দেহান্তে এই থাকিবে আমার সঙ্কল্প। আমার শরীরের বাতাস যেটুকু তাহা মিশিয়া থাকুক তাঁহার তালবৃন্তে, আর যেটুকু এই হত-ভাগিনীর দেহের আকাশাংশ তাহা যে গৃহে করেন তিনি রজনী

যাপন. সেই গৃহের আকাশের সঙ্গে একাকার হইয়া যাউক। এই আমার মরণের সঙ্কল্প সার্থক হইলে, মরিয়াই কৃষ্ণ পাইব আমার সমগ্র সত্তাটাকে দিয়া। ইহা অপেক্ষা সুখের আর কি আছে?

ক্ষণকাল নীরব রহিয়া শ্রীমতী রাধা আবার প্রলাপ বলিতেছেন। "—না, আমার ত মরা হয় না। মরণে বড় বাধা—তিনি আবার আসিবেন এই শ্রীমুখের উক্তি।" হঠাৎ আকাশের দিকে চাহিলেন শ্রীরাধা। দেখিলেন, গগনে একটা কাক উড়িতেছে, সে মথুরার অভিমুখে চলিয়াছে দেখিয়াই তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন—'শোন হে বায়স—তুমি মথুরায় চলিয়াছ, একটি কথা শুনিয়া যাও—বৃন্দাবন হইতে বাহির হইয়া আর কোন দিকে না গিয়া বরাবর চলিয়া যাও মধুপুরীতে। সেখানকার রাজাকে প্রণাম করিয়া "বন্দনোত্তরং" কহিবে আমার কথা "সন্দেশ বদ"—কোন গৃহে যদি আগুন লাগে তবে মানুষের প্রথম কর্ত্তব্য কোন গৃহপালিত পশু থাকিলে দরজা খুলিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া। আমার এই দেহগৃহে প্রবল আগুন লাগিয়াছে. সে-ই লাগাইয়াছে এই অগ্নি। তা'কেই বলিও আমার প্রাণপশুটা বাহির হইতে পারিতেছে না "দগ্ধুং প্রাণপশুং শিখী বিরহভূরিন্ধে মদঙ্গালয়ে।" বাহির হইতে না পারার কারণ এই দরজায় অর্গল আঁটা আছে। তাঁহাকে বলিও অর্গল যেন খুলিয়া দিয়া যান। যদি জানিতে চাহেন অর্গল কি? বলিও "আবার আসিব" এই আশার বাণীই অর্গল "আশার্গল-বন্ধনম্।"

আবার কিয়ৎকালে সকল সখীদের লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—

"যমুনা-তটিনী-কূলে, কেলিকদম্বের মূলে,
মোরে লয়ে চললো ত্বরায়।
অন্তিমের বন্ধু হয়ে, যমুনা-মৃত্তিকা লয়ে,
সখী মোর লিপ সর্ব্বগায়॥
শ্যামনাম তদুপরি, লিখ সব সহচরী,
তুলসী মঞ্জরী দিও তায়।
আমারে বেষ্টন করি, বল সবে হরি হরি,
যখন পরাণ বাহিরায়॥"

—হরিকথা

বিরহকাতরতার এই নিদারুণমূর্ত্তি শ্রীমান্ উদ্ধব দেখিতে লাগিলেন বিস্ফারিত নেত্রে, শুনিতে লাগিলেন উৎকর্ণে—দিব্য উন্মাদিনীর দিব্য প্রলাপ উক্তি। দেখিতে দেখিতে শুনিতে শুনিতে তাঁহার দেহ-প্রাণ মন-বুদ্ধি চৈতন্য সবই যেন এক বিপুল বেদনানুভূতির মধ্যে একাকার হইয়া যাইতে লাগিল। উদ্ধব চিনিলেন—যাঁহার কথা বহু শুনিয়াছি, ঘুমের মধ্যেও আমার প্রভু যাঁহার নাম বলিয়া নিঃশ্বাস ফেলেন—এই সেই "শ্রীরাধা।"

শ্রীশুকদেব শ্রীরাধার নাম করেন নাই, বলিয়াছেন—"কাচিৎ।" (ক = প্রেমসুখে, আ = সমন্তা, চিৎ = জ্ঞানং যস্যাঃ)। অর্থাৎ, শ্রীকৃষ্ণকে প্রেম করিয়া যে অখণ্ড সুখ, তাহা যাঁহার অনুভবে আছে পরিপূর্ণরূপে, তিনিই "কাচিৎ।" এই প্রেমসুখ অনেকেই অনুভব করিতে পারেন বটে, কিন্তু প্রেমের পরিপূর্ণতা না থাকায় অনুভবেরও পূর্ণতা হয় না। পরিপূর্ণ

কৃষ্ণপ্রেমসুখ অনুভব হয় একমাত্র শ্রীরাধাতে, কারণ তিনি মাদনাখ্য মহাভাবময়ী। সুতরাং জগতে একমাত্র শ্রীরাধারই নাম "কাচিৎ।" সুকৌশলে শ্রীশুক শ্রীরাধার নাম করিয়াছেন—

"বুঝিবে রসিকজন না বুঝিবে মূঢ়।"

।। আঠার ।।

কৃষ্ণ বিরহভরা শ্রীরাধা, উদ্ধব মহারাজের নিকটে দশটি শ্লোক বলিয়াছেন। "বলিয়াছেন" না বলিয়া প্রলাপ বকিয়াছেন বলাই ঠিক। গৌড়ীয় বৈষ্ণব-আচার্য্যগণ বলেন—উদ্ধবের সমীপে বিচিত্রতাময় "জল্প" করিয়াছেন। দশটি শ্লোককে তাঁহারা "চিত্রজল্প" নামে অভিহিত করেন।

"চিত্রজল্প" কথাটি আচার্য্যপাদগণের একটি পরিভাষা। পরিভাষাটির তাৎপর্য্য অনুভব করিতে হইলে আচার্য্যপাদগণের আস্বাদিত রসতত্ত্ব সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা প্রয়োজন। তাহাই পূর্ব্বাহ্নে করা যাইতেছে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের অনুভবে জগতের পরতত্ত্ব প্রেম। প্রেম হইতেই জগতের উৎপত্তি—প্রেমেই স্থিতি—প্রেমেই পরিণতি। শ্রুতিমন্ত্রে রহিয়াছে জগৎ আসিয়াছে আনন্দ হইতে, জগৎ চলিতেছে আনন্দের অভিমুখে। বেদ তাই আনন্দকেই ব্রহ্ম বলিয়াছেন। "আনন্দং ব্রহ্ম"। গৌড়ীয় আচার্য্যগণের

মতে আনন্দের পরাকাষ্ঠাই "প্রেমপদবাচ্য" "আনন্দ-চিন্ময় রস প্রেমের আখ্যান।" প্রেমের অভিব্যক্তি প্রেমিক-প্রেমিকার ভাব-বন্ধনের মধ্যে।

"যদ্ভাববন্ধনং যূনোর্বুধৈঃ প্রেমা নিগদ্যতে।" (শ্রীরূপ)

যে ভাব-বন্ধন অনিত্য, তাহা প্রেম নহে। যে ভাব-বন্ধন অজর, অমর, অবিনাশী তাহাই প্রেম। ধ্বংস হইবার সর্ব্ববিধ কারণ রহিয়াছে তথাপি ধ্বংস হয় না যে ভাব-বন্ধন, তাহাই প্রেম। "সর্বথা ধ্বংসরহিতং সত্যপি ধ্বংসকারণে।" এই ভক্ত-ভগবানের ভাব-বন্ধনই প্রেমপদবাচ্য হইতে পারে। লৌকিক কোন সম্বন্ধই ঐ পদের বাচ্য হইতে পারে না।

ইক্ষুরস গাঢ় হইলে গুড় হয়। গুড় গাঢ় হইলে চিনি হয়। চিনি গাঢ় হইলে মিছরি হয়। মিছরি গাঢ় হইলে সিতামিছরি, খণ্ডমিছরি হয়। সেইরূপ প্রেমবস্তু ক্রমশঃ গাঢ়তাপ্রাপ্ত হইতে হইতে—স্নেহ-মান-প্রণয়, রাগ-অনুরাগ, ভাব-মহাভাব, রূঢ়-মহাভাব, অধিরূঢ়-মহাভাব ও মাদনাখ্য-মহাভাবে পরিণত হয়। স্তরগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় এইরূপ—

প্রেম যখন গাঢ়তর হয় তখন চিত্তরূপ দীপকে উদ্দীপ্ত করে "চিদ্দীপদীপনম্" এবং হৃদয়কে দ্রবীভূত করে "হৃদয়ং দ্রাবয়ন্" তখন তাহার নাম "স্নেহ"। অন্তরে স্নেহ জন্মিলে কৃষ্ণের রূপ দর্শনে কখনও নয়নের তৃপ্তি হয় না।

"কোটি আঁখি নাহি দিল সবে দিল দুই।
তাহাতে নিমেষ দিল কি দেখিব মুই॥"

স্নেহের উদয় হইলে কৃষ্ণকথা শ্রবণে কর্ণের কিছুতেই তৃপ্তি হয়

না। আরও শুনিতে সাধ হয়। কৃষ্ণনাম জপ করিতে রসনার তৃপ্তি হয় না পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিতে ইচ্ছা হয়।

"না জানি কতেক মধু, শ্যাম নামে আছে গো,
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।"

এখানে প্রেম, স্নেহে পরিণত হইয়াছে। স্নেহ দুই প্রকার। । ঘৃতস্নেহ ও মধুস্নেহ। ঘৃতস্নেহ শ্রীকৃষ্ণের আদরে কৃতার্থ হইয়া যেন বিগলিত হইয়া যায়। মধুস্নেহ কৃষ্ণের আদরে গাঢ়তাপ্রাপ্ত হইয়া দৃঢ়তর হয়। তাহাতে কৃষ্ণের সুখাতিশয্য হয়। ঘৃতস্নেহ স্বয়ং আস্বাদ্য নহে, অন্যের সঙ্গে মিলিত হইলে আস্বাদ্য। মধুস্নেহ স্বয়ংও আস্বাদ্য, অন্যের সঙ্গে মিলনেও আস্বাদ্য।

মধুস্নেহ উৎকৃষ্ট প্রাপ্ত হইলে নবতর মাধুর্য্যের উদয় হয়। তখন তাহা কি যেন কি এক অদ্ভুত উপায়ে অতি প্রিয় প্রেমাস্পদের প্রতি অদাক্ষিণ্যভাব ধারণ করে। তখন তাহার নাম "মান"। মানে কৃষ্ণের অত্যাদরেও উপেক্ষা দৃষ্ট হয়। শেষে তীব্র বিরহদশা উদিত হয়।

"কাঁদিয়া কহয়ে পুনঃ ধিক্ মোর বুদ্ধি।
অভিমানে হারাইলাম কানুগুণনিধি॥"

মান গাঢ়তাপ্রাপ্ত হইয়া যখন বিশ্রব্ধ রূপ ধারণ করে তখন তাহাকে বলে "প্রণয়"। বিশ্রব্ধ শব্দের অর্থ অভিন্নমনন। নিজ দেহ মন প্রাণ বুদ্ধির সহিত কৃষ্ণের দেহ মন প্রাণ বুদ্ধির অভিন্নতা মনে হয়। তখন প্রেমের নাম প্রণয়। প্রগাঢ় প্রণয়ে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে দেহপ্রাণ-মনের ঐক্যভাবনাহেতু শ্রীরাধার বাহিরে পরিচ্ছদাদিও নীলবর্ণ হয়। অন্তরের ঐক্য যেন বাহিরে ব্যক্ত হয়।

"নীলিম মৃগমদে, তনু অনুলেপন,
নীলিম হার উজোর।
নীল বলয় সনে, ভুজযুগ বন্ধন,
পহিরণ নীলনিচোল ॥"

এই প্রণয় গাঢ়তর হইলে তাহার নাম হয় "রাগ।" অন্তরে রাগের উদয় হইলে প্রিয়তমের জন্য অতিশয় দুঃখও সুখ বলিয়া মনে হয়।

"তোমার লাগিয়া, কলঙ্কের হার,
গলায় পরিতে সুখ।"

রাগের গাঢ়তর অবস্থার নাম "অনুরাগ।" তখন নিত্য-নবায়মান প্রিয়কে নব-নব ভাবে আস্বাদনে সাধ জাগে, কেবল সাধ জাগে না—সামর্থ্যের উদয় হয়। "সোই পিরীতি, অনুরাগ বাখানিতে, তিলে তিলে নূতন হোয়।" শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্য যে কৃষ্ণেই আছে তাহা নহে। অনুরাগী ভক্তের নয়নের উপর উহা নির্ভরশীল। যেমন অনুরাগ বাড়ে, তেমন সৌন্দর্য্য বাড়ে।

"আমার মাধুর্য্য নিত্য নব নব হয়।
স্ব স্ব প্রেম অনুরূপ ভক্ত আস্বাদয়।"

অনুরাগদশায় আর একটি ঘটে অভিনব ব্যাপার। প্রিয়সঙ্গে মিলনকালে এক কল্পকে এক ক্ষণ বলিয়া মনে হয়। "গত যামিনী জিত দামিনী।" ব্রহ্মরাত্রি ব্যাপিয়া রাসলীলা হইল, গোপীদের মনে হইল বিদ্যুতের মত রাত্রিটা আসিল আর চলিয়া গেল। আবার তদ্বিপরীত, প্রিয়ের বিরহকালে এক ক্ষণার্দ্ধকে যুগশত বলিয়া মনে হয়। "যুগায়িতং নিমিষেণ।" আর

একটি অদ্ভুত ব্যাপার হয় অনুরাগ দশায়—যাহাতে কৃষ্ণের সুখ হয় তাহাতেও গোপীকার অনিষ্ট আশঙ্কা জাগে। রাসরজনীতে বিরহিণীরা বিলাপ করিতে করিতে বলিয়াছেন—

আমাদের কর্কশ স্তনের উপর কৃষ্ণ, তোমার কোমল চরণকমল রাখিলে পাছে তুমি ব্যথা অনুভব কর এই ভয়ে "ভীতাঃ শনৈঃ দধীমহি কর্কশেষু" কত সন্তর্পণে ধীরে বুকের উপর চরণপদ্ম রাখি। আর সেই চরণে তুমি বিচরণ করিতেছে বনে বনে—যেখানে আছে কত শীলতৃণাঙ্কুর। একথা ভাবিতে মস্তক ঘূর্ণিত হইতেছে। তবে কি আমাদের কঠিন বক্ষস্পর্শে কৃষ্ণের চরণতল কঠিন হইয়াছে? —অথবা কোমল চরণস্পর্শে বনপথের পাথরখণ্ডগুলি কোমল হইয়া গিয়াছে!—এই সকল ভাবনা অনুরাগবতীর লক্ষণ।

অনুরাগ যখন "স্বসংবেদ্যদশা" প্রাপ্ত হইয়া "যাবদাশ্রয়বৃত্তি" হয় তখন তাহাকে 'ভাব' বলে। অনুরাগ এমন এক অনির্বচনীয় পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হয়, যাহা কেবল নিজের অনুভবের বিষয়—তাই বলিয়াছেন স্বসংবেদ্য দশা আর যতখানি উৎপন্ন হওয়া সম্ভব সবখানি একই সময় হইলে যাবদাশ্রয়বৃত্তি।

ভাবের উদয় হইলে অন্তরের অবস্থা বাহিরে প্রকাশ পায়। অশ্রু, কম্প, পুলক, স্বেদ, বৈবর্ণ্য, স্বরভঙ্গ, স্তম্ভ ও প্রলয়—এই আটটি সাত্ত্বিক ভাব বাহিরে প্রকাশিত হইলে বুঝিতে হইবে অন্তরে ভাব উদ্দিত হইয়াছে।

ভাব গাঢ়তর হইলে মহাভাবে পরিণত হয়। যখন সাত্ত্বিক ভাবগুলি সাধারণভাবে প্রকাশিত হয় তখন রূঢ় মহাভাব। যখন

অসাধারণভাবে একই কালে সবগুলি ভাব সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয় তখন অধিরূঢ় মহাভাব। এই অধিরূঢ় মহাভাবের ঘনীভূত মূর্ত্তিই শ্রীমতী রাধা। আমাদের দেহ যেমন রক্তমাংসে গঠিত, শ্রীরাধার দেহ সেরূপ নহে। তাঁহার "প্রেমের স্বরূপ দেহ প্রেম-বিভাবিত।" স্বর্ণালঙ্কারের যেমন সবটাই সোণা—শ্রীরাধার সেইরূপ সবটাই মহাভাব। অধিরূঢ় মহাভাবের মোদন ও মাদন দুই ভেদ। মোদনাখ্য মহাভাব শ্রীরাধার উদয় হইলে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং অভিভূত হইয়া পড়েন। মোদনাখ্য মহাভাবের কাছে শ্রীকৃষ্ণ ঋণ স্বীকার করেন। জগন্মোহন কৃষ্ণ—তাঁর মোহিনী শ্রীরাধা। মাদনাখ্যমহাভাববতী বলিয়াই শ্রীরাধা জগদাকর্ষণ-কারী শ্রীকৃষ্ণকে আকর্ষণ করেন। প্রগাঢ় মিলন আনন্দ আস্বাদনে মাদনে পরিণত হয়। মাদন সর্ব্বভাবোদ্গমোল্লাসী। একই মাদনকালে সর্ব্ববিধ ভাবের উদয়।

মোদনাখ্য মহাভাব বিরহদশায় মোহন নামে অভিহিত হয়। "পরিশেষদশায়াং মোহনো ভবেৎ।" বিরহের তীব্রতা হেতু অষ্টসাত্ত্বিকভাব বিশেষভাবে সুদীপ্ত হইয়া ওঠে। এই অবস্থায় শ্রীরাধা অসহ্য দুঃখ সহ্য করিয়াও শ্রীকৃষ্ণের সুখ কামনা কনের।

"সে সব দুঃখ কিছু না গণি।
তোমার কুশলে কুশল মানি॥"

মোদনাখ্য মহাভাব তীব্র বিরহদশায় ভ্রমসদৃশ কোন অনির্বচনীয় বিচিত্রতা "ভ্রমাভা কাপি বৈচিত্রী" প্রাপ্ত হইলে তাহাকে দিব্যোন্মাদ বলে। দিব্যোন্মাদ অবস্থায় উদ্ঘূর্ণা ও চিত্রজল্প প্রভৃতি নানাবিধ ভেদ।

উদ্‌ঘূর্ণা দশায় শ্রীরাধা প্রবল বিরহকালে, শ্রীকৃষ্ণ আসিবেন মনে করিয়া কখনও বাসরশয্যার ন্যায় কুঞ্জগৃহে শয্যা রচনা করেন। কখনও খণ্ডিতা ভাব অবলম্বনে কোপনা হইয়া নীল আকাশকে তর্জ্জন গর্জ্জন করেন। কখনও বা অভিসারিকা হইয়া নিবিড় অন্ধকারকে কৃষ্ণ মনে করিয়া প্রগাঢ়ভাবে জড়াইয়া ধরেন। এই সকল উদ্‌ঘূর্ণা ভাবের লক্ষণ।

আবার প্রবল বিরহকালে শ্রীকৃষ্ণের সুহৃদের সহিত সাক্ষাৎ হইলে অন্তরে গূঢ় রোষবশতঃ বহুভাবময় যে জল্প তাহাই চিত্র-জল্প। চিত্রজল্পের দশ প্রকার ভেদ। শ্রীমান উদ্ধবমহারাজকে দেখিয়া শ্রীরাধা যে প্রলাপ বলিয়াছেন তাহাতেই চিত্রজল্পের দশবিধ ভেদ প্রপঞ্চিত হইয়াছে। রসিকজনসমাজে এই শ্লোক দশটি ভ্রমরগীতা নামে অভিহিত।

———

॥ উনিশ ॥

শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে দিব্যোন্মাদ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন। সর্বাঙ্গে কম্পাদি বিকারসমূহের উদ্‌গম হইয়াছে। কথা বলিতে গেলে শব্দগুলি লুণ্ঠিত হইতেছে। নয়নযুগল হইতে অশ্রুধারা বিগলিত হইতেছে। তাহাতে ব্রজবন নদীমাতৃক দেশের তুল্য হইয়াছে। অঙ্গে পুলক সাত্ত্বিক উদ্‌গমে কণ্টকিত হওয়ায় কাঁঠাল ফলের সদৃশ হইয়াছে। ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছা দশা দেখা দিতেছে। মূর্চ্ছা হইতে কথঞ্চিৎ চেতনা লাভ করিয়া বলিতেছেন— সখি, কাননে কোকিল ডাকিতেছে, ওকে নিষেধ কর, কর্ণপটহে বজ্রাঘাতের মত লাগিতেছে। চাঁদ আলো দিতেছে, ওকে ঢাকিয়া রাখ, দেহে দাবাগ্নি-দহন বোধ হইতেছে।

"অতি শীতল মলয়ানিল মন্দ মন্দ বহনা,
হরি বিমুখ হামারি অঙ্গ মদনানলে দহনা।"

—মূর্চ্ছা প্রাণসখীকে আবার ডাকিয়া আন, একমাত্র অই এখন আমার শ্রেষ্ঠ আশ্রয়।

বিরহে শ্রীরাধার প্রাণ কণ্ঠাগত দেখিয়া লীলাশক্তি যোগমায়া তীব্র বেদনার মহাসমুদ্রে মানের এক নব তরঙ্গ তুলিয়া বিরহিণীর প্রাণরক্ষার ব্যবস্থা করিলেন। দুর্ব্বিষহ বিরহাগ্নির মধ্যে মান। এ কিন্তু এক বিচিত্র কথা। তবু মাদনাখ্য মহাভাবসায়রে কিছুই অসম্ভব নয়। অনন্তভাবের অভিনব বিকাশে মহাভাবসিন্ধু নিত্য তরঙ্গায়িত।

শ্রীরাধা ভাবনেত্রে দেখিলেন—শ্রীকৃষ্ণ কোন মথুরাবাসিনী প্রিয়জনার সঙ্গে আনন্দ করিতেছেন। তারপর তাহাকে ছাড়িয়া শ্রীরাধার কাছে আসিয়াছেন। তাঁহাকে দেখিয়াই বিরহিণী মানিনী হইয়াছেন। অনেক চেষ্টা করিয়া মানভঞ্জন করিতে না পারিয়া তিনি চলিয়া গিয়াছেন। তারপর এক কালো ভ্রমরকে দূত করিয়া তাঁহার নিকট পাঠাইয়াছেন—মান-প্রসাদনের জন্য। ভ্রমর আসিয়া শ্রীরাধার শ্রীচরণের পার্শ্বে গুঞ্জন করিতেছে।

এই সমস্ত ব্যাপারটা শ্রীরাধার স্ফূর্ত্তি। বিরহের তীব্রতায় স্ফূর্ত্তিকে সাক্ষাৎকার মনে হইতেছে। ভাবিতেছেন—

"আয়াতি চ মম নিকটং
যাতি চ নিহ্নুত্য মাথুরং নগরম্।"

প্রাণবল্লভ অন্যের অলক্ষিতে আমার কাছে আসে, আবার গুপ্তভাবে চলিয়া যায়। সুতরাং "কাশ্চন রামা রময়তি রমণঃ স তত্রাপি।" সুতরাং মথুরা নগরেও তাঁর অনেক প্রিয়তমা আছে—নতুবা গুপ্তভাবে আসিয়া আবার চলিয়া যান কেন? ভাবিতে ভাবিতে সেই মথুরাবাসিনীকে যেন দেখিতেছেন। তার সঙ্গে শ্যামের মিলন দেখিতেছেন—"ধ্যায়ন্তী কৃষ্ণসঙ্গমম্।" দেখিতেই মানের উদয়। মহাবিরহের দুঃখের সমুদ্রের মধ্যে মানের যেন একটি ক্ষুদ্র দ্বীপের উদয় হইল।

শ্রীরাধা দেখিলেন—শ্রীকৃষ্ণ-প্রেরিত কালো ভ্রমরা পায়ের কাছে ঘুরিতেছে। তার শ্মশ্রু পীতবর্ণ। পদ্মের পীত-পরাগে পীতিমাভ হইয়াছে—মধুকরের মুখের অগ্রভাগ। উহা দেখিয়া তাঁহার মান আরও দৃঢ় ও দুর্জ্জয় হইয়া উঠিল। মানভঙ্গ অবস্থায়

নির্বেদনামক সঞ্চারীভাবের ঢেউ আসিল। তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দোষদৃষ্টিবশতঃ পর্য্যাপ্ত-বুদ্ধি আসিল। অশেষ দোষের আকর শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিতে আর কোন প্রয়োজন নাই, এই ভাব অন্তরে উদয় হওয়ায় ভ্রমরকে বলিতে লাগিলেন। ঠিক এই সময় শ্রীমান্ উদ্ধব আসিয়া শ্রীরাধার নিকটে দণ্ডায়মান হইয়াছেন। ভাববিহ্বলা শ্রীরাধা উদ্ধবকে দেখিতে পান নাই। কিন্তু বলিতেছেন যাহা, তাহা সবই শুনিতেছেন উদ্ধব। শ্রীরাধা বলিতেছেন---

"মধুপ কিতববন্ধো মা স্পৃশাঙ্ঘ্রিম্"

আরে রে কপটের বন্ধু, তুই ধৃষ্টতা করছিস কেন আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া। এখান হইতে এখনি চলিয়া যা। তোর পক্ষে ধৃষ্টতাও অনুপযুক্ত নয়, কারণ মদ্যপান করেছিস তো। তোর প্রভু ত মধুপতি, তাই এত মধুপান করেছিস। প্রভু ভৃত্যের মিলন ভালই হইয়াছে। মধুপতির দূত মধুপ। দেখ সখীগণ, এই দূতকে যত সরল মনে করিতেছ তত সরল নয়। মদের নেশায় বিক্ষিপ্তচিত্ত হওয়ায় সরল মনে হইতেছে। কিন্তু মস্তকের কম্পন ও অব্যক্ত শব্দ শুনিয়া বুঝা যাইতেছে যে, ও কত ধূর্ত্ত।

ওরে কিতববন্ধো, কপটের মিত্র! সে কপটের চূড়ামণি, তুই তদপেক্ষাও কপটতার প্রতিমূর্ত্তি। ভীষণ কপটতা না থাকিলে কপটকে ছল না করিয়া তাহার সহিত বন্ধুত্ব করা চলে না। যে সকলকে ঠকায়, তাকে যে ঠকাইতে জানে সেই কপটের বন্ধু। ঠকাইবার কৌশল হইল বাহিরে সরলতার প্রকাশ।

শ্রীরাধার কথাগুলি উদ্ধব মহারাজ শুনিতেছেন। তাঁহার ইচ্ছা হইল শ্রীমতীর পাদপদ্মে প্রণতঃ হইবেন। এই ভাবিয়া একটু অগ্রসর হইলেন। শ্রীরাধা উদ্ধবকে দেখেন নাই। ভাবনেত্রে ভ্রমরকে দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন—"ওরে ধূর্ত্তের মিত্র, তুই আমার পা স্পর্শ করিস্ না। যদি প্রণাম করিবার একান্ত ইচ্ছা হইয়া থাকে, তাহা হইলে দূর হইতে প্রণাম কর্। আমাকে ছুঁসনে "মা স্পৃশাঙ্ঘ্রিং"; তোর মত মদ্যপ আমার পা ছুঁইলে পা অপবিত্র হইবে। এ পায়ের গৌরব তো জানিস না। তোর অপবিত্র সখা কত সময় এই পা স্পর্শ করিয়া সুপবিত্র হইয়াছে।"

শ্রীরাধা এই কথা বলার পরে ভ্রমর যেন সরিয়া অন্যদিকে গিয়াছে। তাহা দেখিয়া কহিলেন—"তুই আমার সখীদের পা ধরিতে চাস্? ওদের পা ছোঁয়ারও অধিকার তোর নাই। তোর বন্ধু কত সময় আমার পা ছুঁতে সাহসী না হইয়া ওদের পা ছুঁয়ে ধন্য হয়েছে। যা সরে যা।"

উদ্ধব মহারাজ মনে মনে বলিতেছেন—'আমি প্রভুর নিকট হইতে আসিয়াছি। তোমার শ্রীচরণ স্পর্শ করিবার অধিকার আমার আছে।" শ্রীরাধা ভাবকর্ণে শুনিতেছেন—ঐরূপ কথা যেন ভ্রমর বলিতেছে। শুনিয়া উত্তর করিলেন—"তুই পা স্পর্শ করতে পারতিস্, যদি মদ খেয়ে না আসতিস্। যদি বলিস্ মদ খাই নাই, তবে শোন্—নিশ্চয় খেয়েছিস্ তার প্রমাণ দেই।

তুই যে বেশে আমার কাছে এসেছিস্ ঐ বেশে মাতাল ছাড়া আর কেহ আসে না। মদে যার মস্তক ঘূর্ণিত সে ঐ বেশে আসে। যদি বলিস্ বেশে কি দোষ হইয়াছে, তবে বলি শোন্—

তোর শ্মশ্রু রাঙ্গা কেন? কুঙ্কুম মেখেছিস্। কোথায় পেয়েছিস্ এত কুঙ্কুম? আমার মথুরাবাসিনী সপত্নীগণের বুকের কুঙ্কুম। উহা লেপে দিয়েছিল শ্যামসুন্দরের বক্ষমালিকায় গাঢ় পরিরম্ভণ-কালে। সেই মালায় তুই বসেছিলি—তখন তোর মুখে ঠোঁটে লেগে গেছে সেই "সপত্নী-কুচবিলুলিতমালাকুঙ্কুম।" এই মুখ নিয়া আসিয়াছিস্ আমার মান ভাঙাইতে? ধিক তোর ধৃষ্টতা।

নিশ্চয়ই মদ খেয়েছিস্—না হইলে এমন ভ্রষ্টবুদ্ধি হয় না। প্রিয়ের সঙ্গলাভে ধন্যা সপত্নীর বক্ষের কুঙ্কুম—যাহা দেখিলে শরীর ক্রোধে জ্বলিয়া যায়—তাহার দ্বারা অঙ্গভূষণ করিয়া আসিয়াছিস্ আমার মান ভঞ্জন করিতে!

দেখ, ভ্রমর, তোর প্রয়োজন নাই আমার মানভঞ্জন করিবার। তুই মথুরায় চলিয়া যা। সেখানে গিয়া মথুরাবাসিনী নাগরীদের মানভঞ্জন কর। সেখানে অনেক মানিনী আছে। একজনের মানভঞ্জন করিতে করিতে আর একজন মানবতী হইবে। তাই তোর জীবন কাটিয়া যাইবে মানপ্রসাদনকার্য্যে। ওখানে যখন তোর এত কাজ তখন এখানে এসেছিস্ কেন?

"তাহার কুঙ্কুম লৈয়া, নিজ শ্মশ্রু রাঙাইয়া,
তুমি কেন ব্রজপুরে এলা।
যার দূত তুমি হেন জন,
মানিনী মথুরা নারী, তার প্রসাদ কর হরি,
যদুসভায় পাবে বিড়ম্বন।

(উজ্জ্বলচন্দ্রিকার অনুবাদ)

চিত্রজল্পের দশবিধ ভেদ। তন্মধ্যে এই প্রথম। ইহার নাম "প্রজল্প"। ইহার লক্ষণ—

অসূয়েৰ্ষ্যামদযুজা যোঽবধীরণমুদ্রয়া
প্রিয়স্যাকৌশলোদ্গারঃ
প্রজল্পঃ স প্রকীর্ত্তিতঃ।

অসূয়া, ঈর্ষ্যা ও গর্ব্ব এই তিন সঞ্চারী ভাবের সহিত অনাদর প্রকাশে কৃষ্ণের অচতুরতার উদ্গারকে প্রজল্প কহে। শ্লোকে "কিতব" শব্দের মধ্যে অসূয়ার প্রকাশ হইয়াছে। সপত্নী শব্দের আড়াল দিয়া ঈর্ষ্যা ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে। অঙ্ঘ্রীং মা স্পৃশ—আমার পা ছুঁসনে, এই কথার মধ্যে গর্ব সুপরিস্ফুট রহিয়াছে। মানিনীর মান প্রসাদন জানে না, কাহাকে দূত রাখিতে হয় তাহা জানে না। দূত জানে না কিভাবে মানভঞ্জনে আসিতে হয়—এই সকল মন্তব্যের মধ্যে প্রিয় কৃষ্ণের অকৌশলের উদ্গার। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ যে এই সকল কার্য্যে অচতুর, অপটু তাহা পুনঃ পুনঃ ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বলা হইয়াছে। সুতরাং দিব্যোন্মাদ শ্রীরাধার চিত্রজল্পের মধ্যে এই উক্তিসকল 'প্রজল্প' লক্ষণে লক্ষিত হইয়াছে।

শ্রীরাধার কথাগুলি শুনিলে মনে হয় যেন অনেক চিন্তা বিচার করিয়া বলিয়াছেন। বস্তুতঃ তাহা নহে। প্রত্যেকটি উচ্চারিত শব্দই মহাভাবময়ীর ভাবের উদ্গার।

———

॥ কুড়ি ॥

শ্রীরাধা ভাবচক্ষে দৃষ্ট ভ্রমরকে লক্ষ্য করিয়া ভাবময় প্রলাপ বকিতেছেন। শ্রীমান উদ্ধব তাহা শ্রবণ করিতেছেন ; শ্রীরাধার ভাব ও ভাষা যে কত গভীর অনুরাগের নিভৃত তলভূমি হইতে সমুদ্ভূত তাহা অনুভব করিবার সামর্থ্য নাই উদ্ধবের। উদ্ধব মনে মনে ভাবিতেছেন, কৃষ্ণকে ইনি এত কঠোরভাবে নিন্দা করিতেছেন। সচ্চিদানন্দে কি নিন্দাকার্য্য সম্ভব ?

শ্রীরাধার ভাবদৃষ্ট ভ্রমর গুন্ গুন্ করিতেছে। গুঞ্জনের মধ্যে রাধা ভাবকর্ণে শুনিতেছেন, ভ্রমর যেন বলিতেছে—প্রভুকে এত নিন্দা করিতেছেন কেন ? তিনি কোন দোষের কাজ ত করেন নাই। শ্রীরাধা বলিতেছেন—শোন্ তবে ভ্রমর, তার দোষের কথা। তার দোষ অতি গুরুতর, তা কেবল আমাদেরই অনুভব-গোচর। অন্যে জানে না।

সে আমাদের ধর্ম্মকর্ম্ম নাশ করিয়াছে। কোন অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা নহে—নিজ অধর-সুধা পান করাইয়া। "সকৃদধরসুধাং স্বাং মোহিনীং পায়য়িত্বা"। এই ভূমণ্ডলে কোথাও নাহি তার অধরসুধার তুলনা। ঐ বস্তু পান করাইয়া ধর্ম নাশ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। যদি বলিস্ আমরা পতিব্রতা হইয়া কেন পান করিতে গেলাম তার অধর-সুধা, তা-ও বলি শোন্।—

এই সুধা 'মোহিনী' মোহকারী, আমাদের বুদ্ধিনাশকারী। চিত্তে তুরন্ত লালসার উদ্গম হয় তাঁর মধুর অধরখানি দর্শনমাত্র,

না, যদি করিস, তাহা হইলে পরিণামে পরিত্যক্তা হইয়া আমাদের মতই কাঁদিতে হইবে।

"সকৃদধরসুধাং স্বাং মোহিনীং পায়য়িত্বা
সুমনস ইব সদ্যস্তত্যজেঽস্মান্ ভবাদৃক্।
পরিচরতি কথং তৎপাদপদ্মং নু পদ্মা
হ্যপি বত হৃতচেতা উত্তমশ্লোকজল্পৈঃ॥"

ভাঃ ১০।৪৭।১৩

এই শ্লোকটিতে চিত্রজল্পের দ্বিতীয় ভেদ 'পরিজল্প' অঙ্গটি প্রকাশ পাইতেছে। পরিজল্পের লক্ষণ—

"প্রভোর্নির্দ্দয়তাশাঠ্যচাপল্যাদ্যুপপাদনাৎ।
স্ববিচক্ষণতা-ব্যক্তির্ভঙ্গ্যাঃ স্যাৎ পরিজল্পিতম্॥"

প্রভুর নির্দ্দয়তা, শঠতা ও চপলতা প্রতিপাদন করতঃ ভঙ্গিপূর্ব্বক যেখানে নিজের বিচক্ষণতা জানান হয়, তাহাই পরিজল্পের দ্বিতীয় ভেদ।

শ্লোকে 'সদ্যস্তত্যজে' সদ্য ত্যাগকার্য্যে কৃষ্ণের নির্দ্দয়তার কথা; 'মোহিনীং পায়য়িত্বা' মোহনকারী অধর-সুধা পান করাইয়া আমাদিগকে অমর করিয়া লইয়াছে যাহাতে চিরকাল দুঃখ দিতে পারে এই কথায় কৃষ্ণের শঠতার প্রকাশ। "ভবাদৃক্" পদে ভ্রমরের সঙ্গে দৃষ্টান্তে চঞ্চলতার প্রকাশ ও "পদ্মা অপি বত হৃতচেতাঃ", পদে লক্ষ্মীর সারল্য ও অল্পবুদ্ধির কথা উল্লেখে নিজের বিচক্ষণতা প্রকাশিত হইয়াছে।

"কিমিহ বহু ষড়ঙ্ঘ্রে! গায়সি ত্বং যদূনা-
মধিপতিমগৃহাণামগ্রতো নঃ পুরাণম্।

বিজয়সখসখীনাং গীয়তাং তৎপ্রসঙ্গঃ
ক্ষপিতকুচরুজস্তে কল্পয়ন্তীষ্টমিষ্টাঃ ॥" ভাঃ ১০।৪৭।১৪

উদ্ধব মহারাজ স্তব্ধ হইয়া শ্রীমতীর সংলাপ শুনিতেছেন। ভ্রমর গুন্ গুন্ করিয়া গান করিতেছে। শ্রীরাধার মনে হইতেছে মধুকর শ্রীকৃষ্ণের গুণ কীর্ত্তন করিতেছে। ইহাতে কোপান্বিতা হইয়া বলিতেছেন—"ওরে মধুকর! তুই বহুপ্রকারে মধুপতির গুণগাথা এখানে কেন গাহিতেছিস্, "কিমিহ বহু ষড়ংঘ্রে গায়সি ত্বং যদূনামধিপতিম্?" যদি বলিস্, 'গান গাওয়া আমার স্বভাব তাই গাই", আমি বলি, গান গাও তাতে বাধা দেই না, কিন্তু এই ধৃষ্ট ব্যক্তিটির গুণগাথা ছাড়া আর কি কোন গান নাই? যদি বলিস্, "উনি আমাদের মনিব, ওঁর গুণই আমাদের গাহিতে হইবে।" যদি হইবে তাই হউক, কিন্তু এস্থান ছাড়িতে হইবে। এই স্থান ছাড়া কি আর জায়গা নাই পৃথিবীর পৃষ্ঠে তোর গান গাহিবার?

যাহারা গৃহ-হারা তাহাদের সম্মুখে যাহারা ঐশ্বর্য্যশালী গৃহশালী তাহাদের কথা শুনানোর কি দরকার? শুধু তাই নয়, আমাদের গৃহহীন করিবার একমাত্র কারণ যে ব্যক্তিটি, সেই যে এখন বাস করিতেছে মথুরায় ঐশ্বর্য্যময় গৃহে, এ কথা আমাদের কর্ণে দিবার দরকারটা কি? আমাদিগকে শ্রীহারা করিল যে, তার শ্রীর কথা আমাদিগকে শোনাইবার কি প্রয়োজন হইতে পারে? আমি গৃহহারা বনবাসিনী কাঙালিনী হইয়াছি কেন তাহা জানিস্? তোর ঐ বন্ধুটির জন্য। এখন সে আছে যদুবংশের ঈশ্বর হইয়া, আর আমরা রহিয়াছি বনে বনে মাথা

গুঁজিবার-স্থানশূন্য হইয়া। আমাদের এত কষ্ট যাঁর জন্য তাঁর গুণকীর্ত্তন করিতেছিস আমাদের নিকটে? ইহা অপেক্ষা নির্বুদ্ধিতার পরিচয় আর কি হইতে পারে?

যদি স্থান না পাস তাঁর গুণকীর্ত্তন করিবার, তাহা হইলে শোন্, উপদেশের কথা বলিয়া দেই। এখান হইতে মধুপুরী গিয়া তোর বধু যাদের দুঃখ-দৈন্য দূর করিয়াছেন তাদের কাছেই তাঁর গুণগান সুন্দর ও শোভনীয়। যাদবগণ এখন সুখময় জীবন যাপন করিতেছে তোর সখাদ্বারা প্রতিপালিত হইয়া। সুতরাং যদুপতির গুণ শ্রবণে যাদবরাই সুখলাভ করিবে।

আর শোন্, তোর সখা মধুপুরীর যে সকল নাগরীদের বক্ষ-বেদনা "কুচরুজঃ" দূর করিয়াছেন, তাদের কাছে গিয়া প্রাণ খুলিয়া গান কর্। তোর মুখে তাঁর গুণপনা শুনিলে মথুরানাগরীরা নিশ্চয়ই সুখসাগরে ভাসিবে। কারণ প্রিয়ের সঙ্গ ও প্রসঙ্গ দুই-ই সুখকর, যারা প্রেমাকৃষ্ট তাদের কাছে।

যদি ঐ কপাটিয়ার গুণগানই গাহিবি তাহা হইলে যাহাদের কথা বলিয়াছি তাহাদের নিকট গিয়া গান কর। আর যদি আমার কাছেই গান গাহিতে তোর মনের একান্ত সাধ জাগিয়া থাকে, তাহা হইলে বলি 'অন্য গান' কর্। 'অন্য গান' কি জানিস্ না? একটু অনুভবও কি নাই? বিরহের মহাদুঃখে সন্তপ্ত, গৃহহারা জ্ঞানহারা ব্রজবাসিগণের সভায় কোন্ গান গাওয়া চলে তাহা কি বুঝিতে পারিস্ না? শ্রোতার হৃদয়ের অবস্থা না বুঝিয়া যে সভায় গান করে, লোকে তাহাকে অযোগ্য

মনে করিয়া সভা হইতে উঠাইয়া দেয়। তাইত আমি তোকে এখান হইতে চলিয়া যাইতে বলিতেছি।

এই শ্লোকে বিজল্প নামক চিত্রজল্পের তৃতীয় ভেদের লক্ষণ স্ফুট।

"ব্যক্তয়াসূয়য়া গূঢ়মানমুদ্রান্তরালয়া
অঘদ্বিষি কটাক্ষোক্তির্বিজল্পো বিদুষাং মতঃ।"

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গূঢ় মান। বাহিরে অসূয়াযুক্ত বাক্য প্রকাশ। উক্তিগুলি কটাক্ষপূর্ণ। ইহাই বিজল্পের চিহ্ন।

এই শ্লোকের প্রত্যেকটি কথাই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কটাক্ষযুক্ত। মথুরায় যাহাদের "বক্ষঃবেদনা নাশ করিয়াছেন" ইত্যাদি বাক্যে গূঢ় মান সুব্যক্ত। "কেন গান করিতেছিস্" এই বাক্যে অসূয়া প্রকটিত হইয়াছে।

শ্রীরাধার কথা শুনিয়া উদ্ধব মহাশয় কিছু চিন্তা করিতে লাগিলেন। ভ্রমরের গুঞ্জনে শ্রীরাধা যেন উদ্ধবের অন্তরের ভাবনাই শুনিতে লাগিলেন। সখীকে সম্বোধন করিয়া শ্রীরাধা কহিলেন —দেখ সখি! ভ্রমর কি বলিতেছে, ও বলে, "আপনি আমাকে অতি কঠিন বাক্য আর বলিবেন না। মথুরাপুরের অঙ্গনারা পতিব্রতা। তাহারা কিছুতেই পরপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিবে না। তাহারা কখনও পতিপরায়ণতা-ধর্ম ছাড়িবে না। এ বিষয় আপনি ব্যর্থ ভাবনা ভাবিতেছেন।

শোন্ তবে ভ্রমর, মথুরার নারীগণ পতিব্রতা তা আমিও জানি। কিন্তু বল্ দেখি দেবলোকে, মর্ত্ত্যলোকে, পাতালে, এমন কোন্ নারী আছে যে তোর প্রভুর বশ্যতাপ্রাপ্ত না হইয়া

পারে? "দিবি ভুবি চ রসায়াং কাঃ স্ত্রিয়স্তদ্দুরাপাঃ" এই কথা আমি হিংসা বিদ্বেষবশতঃ বলিতেছি না। বলিতেছি তাহাদের কল্যাণ আকাঙ্ক্ষায়। আমরা তাঁকে বিশ্বাস করিয়া যে দুঃখ-সাগরে পড়িয়াছি, এই সাগরে আর কেহ না পড়ে, এই চিন্তায়। তাঁহার (কৃষ্ণের) ব্যবহারে প্রবঞ্চিত হওয়া খুবই স্বাভাবিক। কারণ, তাঁহার রুচির হাস্য এবং ভ্রূ-যুগলের সুন্দর বিলাসভঙ্গী প্রভৃতি অতীব সুন্দর বলিয়া অনেকেই মনে করে এবং ঐরূপ মনে করিয়া পরিণামে ঠকিয়া যায়। আমরা জানি, ভালভাবেই বুঝিয়াছি যে তাঁহার সকলই কপটতা ভরা। অন্তরেও কপটতা বাহিরেও হাস্য-লাস্য সকলই কুটিলতাপূর্ণ। যে উহাতে ভুলিবে সে-ই আমাদের মত দুর্দ্দশায় পতিত হইবে।

ওরে ভ্রমর, তুই কি বলিতেছিস যে, কৃষ্ণ যদি এতই দোষী তাহা হইলে আমাদের এখন পর্য্যন্ত কেন তাঁহার প্রতি এত লালসা? তাহার কারণ বলি শোন্,—স্বয়ং যে লক্ষ্মী, তিনি সর্ব্বেশ্বরী হইয়াও যেখানে তাঁর পদধূলি পতিত হয় সেইখানে গিয়া উপাসনা করিয়া থাকেন "চরণরজঃ উপাস্তে।" লক্ষ্মীরই যখন এই অবস্থা তখন আমাদের কি হইতে পারে "বয়ং কাঃ।" আমরা ক্ষুদ্র মানুষী, গোয়ালিনী, আমরা কেমন করিয়া পারি তাঁহার প্রতি আসক্তি ত্যাগ করিতে?

তোর কপট সখা সর্বাগ্রে বশীভূত করিয়াছে লক্ষ্মীদেবীকে। ইহারও কারণ আছে। নারীর প্রধানা লক্ষ্মীদেবী। তাঁহাকে বশীভূত রাখিতে পারিলে পৃথিবীর সকল নারীকেই প্রতারণা করা যাইবে এই উদ্দেশ্যেই।

যিনি নিতান্তই দুঃখদাতা তাঁর প্রতি আমাদের এখন পর্য্যন্ত এত আসক্তি কেন? ইহার উত্তর আর কি দিব। ঐ মনো-চোরের মায়া ছাড়া আর কোন কারণ আছে বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার 'উত্তমশ্লোক' নাম শুনিয়া আমরা ভুলিয়াছিলাম। দীন-জনকে দয়া করেন বলিয়াই 'উত্তমশ্লোক' ইহা মনে করিয়াছিলাম। এখন বুঝিলাম তাঁহার প্রত্যেকটি কথা, কার্য্য ও নাম কাপট্য-পরিপূর্ণ।

"দিবি ভুবি চ রসায়াং কাঃ স্ত্রিয়স্তদ্দুরাপাঃ
কপট! রুচিরহাসভ্রূবিজৃম্ভস্য যাঃ স্যুঃ।
চরণরজ উপাস্তে যস্য ভূতির্ব্বয়ং কা
অপি চ কৃপণপক্ষে হ্যুত্তমশ্লোকশব্দঃ॥" ভাঃ ১০।৪৭।১৫

এই প্রলাপ বাক্যে শ্রীরাধার চিত্রজল্পের উজ্জল্প নামক চতুর্থ ভেদটি প্রকটিত হইয়াছে। তাহার লক্ষণ—

"হরেঃ কুহকতাখ্যানং গর্ব্বগর্ভিতয়ের্ষ্যয়া।
সাসূয়শ্চ তদাক্ষেপো ধীরৈরুজ্জল্প ঈর্য্যতে॥"

গর্ব্বমিশ্রিত ঈর্ষ্যার সহিত শ্রীহরির কুহকতার বর্ণনা এবং অসূয়ার সহিত শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আক্ষেপকে পণ্ডিতেরা উজ্জল্প বলেন।

'লক্ষ্মী পাদপদ্ম' সেবা করেন ইত্যাদি কথায় গর্বভরা ঈর্ষা রহিয়াছে। দীনকে কৃপা করেন বলিয়াই উত্তমশ্লোক এই কথায় অসূয়াপূর্ণ আক্ষেপ স্পষ্ট। হরির কুহকতার কথাই শ্লোকে সুব্যক্ত। সুতরাং চিত্রজল্পের উজ্জল্প ভেদটি প্রকাশিত।

———

॥ একুশ ॥

নিজ শ্রীচরণকে পদ্ম মনে করিয়া ভ্রমর যেন উহাতে বসিয়াছে আর গুঞ্জন করিয়া শ্রীকৃষ্ণকৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা চাহিতেছে—এই আবেশে ভ্রমরকে লক্ষ্য করিয়া আবার বলিতে লাগিলেন—বিরহিণী শ্রীরাধাঠাকুরাণী দিব্যোন্মাদাবস্থায়।

"ওরে ভ্রমর তুই কি বলিতেছিস্,—তোকে একটুকুও সুযোগ দিলাম না, যে উদ্দেশ্যে আসিয়াছিস্, তাহা ব্যক্ত করিবার—এই কথা? শোন্, কথা কিছু বলিবারও নাই, শুনিবারও নাই। তুই সরিয়া যা আমার চরণ হইতে, এই স্থান হইতে দূরে অতি দূরে বিদায় হ। জানিতে আমার বাকী নাই তোর অন্তরের কথা।

তুই তোর মনিবের কাছে চাটুকারিতা বিদ্যা শিখিয়া এখন তাঁর দৌত্যকার্য্যে ব্রতী হইয়াছিস্। তোষামোদ করিবার ক্ষমতা তোর মনিব মুকুন্দের অসাধারণ তা জানা আছে আমার বিশেষভাবে। গুরুতর অপরাধে অপরাধী হইয়া শেষে গলবস্ত্রে "দেহি পদপল্লবমুদারম্" বলিয়া ভুলাইয়া দিত মন নিরুপম চাটুবাক্যে। সেই সব সম্ভাবনা এখন আর নাই। ঠেকে, দেখে, ভুগে শিক্ষা পেয়েছি খুবই। আর পারবি না ভুলাইতে—অচতুরা নই আমরা লক্ষ্মীদেবীর মত।

হারে ভ্রমর! আবার গুন্ গুন্ করিয়া কি বলিতেছিস্? বলিতেছিস্,—প্রিয়তমের সহিত বিবাদ না করিয়া সন্ধিসংস্থাপন করুন। মুখে আনিস্ না আর ও কথা। কপটতা চলিতে পারে

ততক্ষণই, যতক্ষণ উহা ধরা না পড়ে। আমরা মর্মে মর্মে ধরিয়া ফেলিয়াছি কপটীর কপটতা। যদি বলিস, কি কপটতা সে করিয়াছে? তা-ও কি বলিতে হইবে? তবে বলি শোন্—

ত্যাগ করিয়াছি সর্ব্বস্ব তাঁহার জন্য। পিতামাতা, পতিভ্রাতা, ইহ-পরলোক, সুখৈশ্বর্য্য ছাড়িয়াছি সবই তাঁর প্রীতির দায়ে। আর এত অকৃতজ্ঞ সে, এতটুকু দৃষ্টিপাত করে নাই সে আমাদের প্রতি। ভাবে নাই একটিবারও—তাঁকে ছাড়া আর কিছু জানে না যারা, তাদের ছাড়িয়া গেলে নিরাশ্রয়া ব্রজবালারা দাঁড়াইবে কোথায়। নিজ স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে সব ভুলাইয়া চরণে প্রপন্ন করিয়া ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন নির্ম্মমের মত আমাদিগকে। ঈদৃশ কঠোর শঠরাজের সহিত আর কোন কথাই উঠিতে পারে না সন্ধির।

"বিসৃজ শিরসি পাদং বেদ্ম্যহং চাটুকারৈ-
রনুনয়বিদুষস্তেঽভ্যেত্য দৌত্যৈর্ম্মুকুন্দাৎ।
স্বকৃত ইহ বিসৃষ্টাপত্যপত্যন্যলোকা
ব্যসৃজদকৃতচেতাঃ কিং নু সন্ধেয়মস্মিন্॥"

ভাঃ—১০।৪৭।১৬

তীব্র বিরহের দিব্যোন্মাদাবস্থায় চিত্রজল্প একটি অনুভাব। তাহার ভেদ দশবিধ। এই শ্লোকে "সংজল্প" নামক পঞ্চভেদ প্রকটিত। উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে শ্রীরূপ এইরূপ লক্ষণ করিয়াছেন সংজল্পের—

সোল্লুণ্ঠয়া গহনয়া কয়াপ্যাক্ষেপমুদ্রয়া
তস্যাকৃতজ্ঞতাদ্যুক্তিঃ সংজল্পঃ কথিতো বুধৈঃ।

যাহাতে আক্ষেপ-বাক্যে শ্রীকৃষ্ণের অকৃতজ্ঞতার কথা থাকে, আর থাকে নিগূঢ়ভাবে সোল্লুণ্ঠবচন তাহাকে বলে সংজল্প। সোল্লুণ্ঠবচনের অর্থ বিদ্রূপের সহিত প্রশংসোক্তি। এই শ্লোকে "বিসৃজ শিরসি পাদং"—"পা হইতে মাথা সরিয়ে নে"—এই বাক্যে আক্ষেপ ভঙ্গি আছে, অকৃতজ্ঞতার কথা স্পষ্টই আছে। অকৃতজ্ঞতাদি এই "আদি" অর্থে কঠোরতা, উপকারীকে পীড়া দেওয়ার প্রচেষ্টা ও হৃদয়শূন্যতার কথা বুঝায়। এই সবগুলিই রহিয়াছে শ্লোকে পূর্ণভাবে।

ক্ষণকালের জন্য নীরব রহিলেন শ্রীরাধা। ভাবসিন্ধুতে তরঙ্গ খেলিতে লাগিল নানাবিধ সঞ্চারিভাবের। "নির্ব্বেদ" নামক সঞ্চারী ভাবটি অতি গাঢ়তা প্রাপ্ত হইল। প্রাণসর্বস্ব প্রিয়জনের প্রতি রোষদৃষ্টি বাড়িয়া চলিল।

শ্রীকৃষ্ণের সহিত আমার সম্পর্কের কোন প্রয়োজন নাই—এই ভাবনার উদয় হইল প্রবলভাবে। অরসিক অভক্তজনের মত বৈরস্যময় কথা কহিতে লাগিলেন প্রণয়ের বিবর্তে হাবুডুবু খাইতে খাইতে।

শোন্ রে ভ্রমর! আর তুলিস্ না শ্যামের সঙ্গে সখ্যের কথা! তাঁহার কুটিলতা, নির্মমতা ও অধার্মিকতার পরিসীমা নাই। যদি বলিস্, "কি প্রমাণ পাইয়াছেন তাঁর নির্দ্দয়তার"? বলি তবে শোন্,—বানরের রাজা ছিল বালী। গোপনে থাকিয়া ওকে নৃশংসভাবে মারিয়াছিল বাণবিদ্ধ করিয়া। বানর বধ করে না হীন চরিত্র ব্যাধেরা পর্য্যন্ত, কারণ ওদের মাংস অভক্ষ্য। আর ব্যাধ-বিগর্হিত এই অশোভন কার্য্য করিয়াছিল সে

ধার্মিক-কুলের মুকুটমণি হইয়া—"মৃগেয়ুরিব কপিন্দ্রং বিব্যধে লুব্ধধর্মা।"

আবার দেখ,, সূর্পণখার নাসিকা, কর্ণ ছেদন ব্যাপারটা। এ কি বলিবার কথা! সূর্পণখার দোষ এইমাত্র যে, সে তাঁর রূপ দেখিয়া মোহিতা হইয়া তাঁহাকে স্বামী করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল। এই দোষে তাহাকে বিবাহ ত করিলই না, পরন্তু আর কেহ যাহাতে তাহাকে গ্রহণ না করিতে পারে এমন করিয়া দিল অঙ্গ কাটিয়া বিরূপা করিয়া "স্ত্রিয়মকৃত বিরূপাং।"

হাঁ, যদি বুঝিতাম তিনি তপস্বী-ব্রহ্মচারী, সত্যপালন-ব্রতে বনে আছেন, তাঁর কাছে বিবাহের প্রস্তাব নিতান্ত অশোভন কার্য্য হইয়াছে কিন্তু তা তো নয়, স্ত্রীটি সঙ্গে সঙ্গে হাত মিলাইয়া আছেন। যদি অপর কাহাকেও গ্রহণ করিতে ইচ্ছা নাই, তাহা হইলে অত রূপের সৌন্দর্য্য বিস্তার করিবার দরকার কি ছিল! রূপ দেখাইয়া মুগ্ধ করিয়া শেষে কিনা অমানুষোচিত অপমান! এই নির্ম্মমতা প্রকাশের কি ভাষা আছে?

আরও বলি শোন্ তার প্রাণহীনতার কথা। আর কে-ই বা না জানে, বলি মহারাজের লাঞ্ছনার কথা। দশরথেব পুত্র না হয় ক্ষত্রিয় ছিল। মারধর তাঁর করাই জাতিধর্ম। কশ্যপের পুত্র বামন ত ব্রাহ্মণকুমার, ব্রহ্মচারী। দেখে মনে হয় শান্তি-ক্ষান্তিগুণযুক্ত সদ্বিপ্র। বলিরাজের দোষটা কি? সে ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণকুমারকে আদর যত্ন ভক্তি করিয়া ত্রিপাদ ভূমি দানের প্রতিশ্রুতি দিয়াছে। বলির পূজা গ্রহণকালে দেখাইলেন কচি কচি পা, তারপর কোথা হইতে কিভাবে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ভীষণ

পা-গুলি বাহির করিলেন, সেই ইন্দ্রজাল ভেদ করিতে পারিল না কেউ। বড়ো বস্তুর মধ্যে ছোটো জিনিষ থাকিতে পারে, কিন্তু ছোট বস্তুর মধ্যে বড় জিনিষ কিভাবে থাকিতে পারে তাহা জীববুদ্ধির অগোচর। দুই ভীষণ পদবিক্ষেপে আক্রমণ করিলেন জগৎব্রহ্মাণ্ড। শেষে "তৃতীয় পা কোথায় রাখিব" বলিয়া ছল করিয়া তাহাকে বন্ধন করিয়া রাখিলেন নিয়া রসাতলে। ধর্মাত্মা বলি মহারাজের প্রতি দৌরাত্ম্যের কথা ভাবিতেও প্রাণ কাঁপিয়া উঠে। কাক যেমন কোন কোন মানুষের মাথার উপরের ভক্ষ্যদ্রব্য লুটিয়া খায়, আবার চঞ্চুর আঘাত করিয়া তাহাকে উত্তেজিত করিয়া তোলে, সে-ও সেইরূপ কাকের মত "ধ্বাঙ্ক্ষবৎ" দান পূর্ণ হইল না বলিয়া, নিজজন দ্বারা তাহাকে বন্ধন করিয়া রসাতলে পাঠাইয়া দিলেন। "বলিমপিবলিমত্ত্বাবেষ্টয়দ্।" অসিতবর্ণ (শ্যামবর্ণের) সঙ্গে মিতালির কথা আর তুলিস না। "তদলং অসিতসখ্যৈঃ" শ্যামবর্ণের মোহিনী শক্তি আছে দশরথের ছেলেও ছিল শ্যামবর্ণ, কশ্যপ মুনির ছেলেও ছিল শ্যামবর্ণ, আর তোর সখা মথুরাপতিও শ্যামবর্ণ। বুঝি বা ঐ বর্ণেরই দোষ। মোহিনীশক্তি আর নৃশংসতা—এই দুই ঐ বর্ণেরই চিরসঙ্গী।

শ্রীরাধার প্রণয়-বিবর্তের বাম্যোক্তি উদ্ধব মহাশয় শ্রবণ করিতেছেন। এমন উক্তি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কেহ করিতে পারে ইহা ছিল না তাঁহার কল্পনাতেও। শ্রীমতীর মহাভাবের অতল-সিন্ধুতে অবগাহন করিবার সামর্থ্য নাই উদ্ধবের। কেবল তীরে রহিয়া উহার মহিমাংশ অনুভব করিতেই তিনি অস্থির

হইয়া উঠিলেন। ভাবিতে লাগিলেন তিনি মানসে। এত নিন্দা করিতেছেন শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের কথাইত বলিতেছেন বারংবার। তা ছাড়া অন্য কথা ত শুনিতেছিনা এক মুহূর্ত্তের জন্যও। শ্রীরাধার ভাবনাদৃষ্ট ভ্রমর গুঞ্জন করিতেছে। ভাবকর্ণে শুনিতেছেন শ্রীমতী ভ্রমরের কথা। শুনিয়া বলিতেছেন ওরে মধুপ, অস্পষ্ট গুঞ্জন করিয়া কি কথা কহিতেছিস্। কহিতেছিস্ যে, যদি এতই দোষী তিনি, তাহা হইলে তোর এখানে আসা অবধি বারংবার ঘুরিয়া ফিরিয়া তাঁর কথাই কহিতেছি কেন? দোষী ব্যক্তির দোষ গাওয়াও গুণী ব্যক্তির পক্ষে শোভন কার্য্য নহে।

তার উত্তর বলি, তবে শোন্ রে অলি! শ্যামলের সঙ্গে বন্ধুত্বে আমার আর প্রয়োজন নাই বিন্দুমাত্রও একথা যথার্থই। তবে তাঁর লীলা-কথারূপ যে পরম সম্পদ, তাহা ত্যাগ করিতে আমি সম্পূর্ণ অসমর্থ। "দুস্ত্যজস্তৎকথার্থঃ।" তাঁকে ছাড়া যায় রে ভ্রমর, তাঁর কথাকে তো ছাড়া যায় না। তিনিও আমাদিগকে ছাড়িয়াছেন, আমরাও তাঁহাকে ছাড়িয়াছি—কিন্তু তাঁর কথা দুস্ত্যজ। তাঁকে হারাইয়া বাঁচিয়া আছি শুধু তাঁর কথা লইয়া। কথা ছাড়িলে আর বাঁচিব না। কথা যে ছাড়িতে পারিতেছি না, সেও আমাদের দোষ নয়। দোষ তাঁর কথারই। তাঁর কথা ছাড়িতে চায় না আমাদের রসনা। জানে, ছাড়িয়া দিলেই আমরা যাইব মরিয়া। আমরা মরিয়া গেলে এত কষ্ট ভোগ করিবে কাহারা? আমাদিগকে বধ করিতেও তাঁর ইচ্ছা নাই। সেও যেমন, তাঁর কথাও তেমন। নির্দ্দয়তায় দুই-ই সমকক্ষ।

"মৃগয়ুরিব কপীন্দ্রং বিব্যধেলুব্ধধর্ম্মা
স্ত্রিয়মকৃত বিরূপাং স্ত্রীজিতঃ কামযানাম্।
বলিমপি বলিমত্ত্বা-বেষ্টয়দ্ধ্বাঙ্ক্ষবদ্ য-
স্তদলমসিতসখ্যৈর্দুস্ত্যজস্তৎকথার্থঃ॥" ভাঃ ১০।৪৭।১৭

এই শ্লোকে চিত্রজল্পের 'অবজল্প' ভেদটি প্রকটিত হইয়াছে। পণ্ডিতেরা অবজল্পের লক্ষণ বলিয়াছেন—

"হরৌ কাঠিন্যকামিত্বধৌর্ত্ত্যাদাসক্ত্যযোগ্যতা।
যত্র সের্ষ্যংভিয়েবোক্তা সোঽবজল্পঃ সতাং মতঃ॥"

যে উক্তির তলায় থাকে ঈর্ষ্যা ও ভয়, আর উপরে ভাষায় থাকে শ্রীহরির কাঠিন্য, কামিত্ব, ধৌর্ত্ত্য ও আসক্তির অযোগ্যতা, তাহাই অবজল্প। সূর্পণখার নাসাকর্ণ-ছেদনে ও বালী-বধে কাঠিন্য। স্ত্রীজিত, স্ত্রীদ্বারা পরাজিত, তপস্বী হইয়াও সীতাসঙ্গী এই কথায় কামিত্ব। বলির প্রতি অত্যাচারে ধূর্ত্ততা, 'অসিত-সখ্যৈরলং'—শ্যামলের সঙ্গে সখ্যে আর প্রয়োজন নাই—এই পদে শ্যামে আসক্তির অযোগ্যতা প্রকাশিত হইয়াছে। শ্লোকের ব্যঞ্জনাতে আছে ঈর্ষ্যা আর ভয়। শ্যামলের সঙ্গে আবার বন্ধুত্ব হইলে আরও তাপ পাইতে হইবে এই ভয়। স্ত্রীজিত পদে সীতার প্রতি ঈর্ষ্যা।

দিব্যোন্মাদের ভাবতরঙ্গাঘাতে শ্রীরাধার এই সকল উক্তি। শ্রীকৃষ্ণ যে কত স্নেহময় ও কোমল তাহা যে শ্রীরাধা জানেন না, তাহা নহে। সূর্পণখার প্রতি ব্যবহার বাহ্যতঃ নির্দ্দয়তার মত প্রতীতি হইলেও বস্তুতঃ উহাও পরম করুণার নিদর্শন। ভক্ত সমাজে তাহা অবিদিত নহে। সূর্পণখা শ্রীরামকে স্বামীরূপে

চাহিয়াছে—সরলভাবেই চাহুক আর কপটভাবেই চাহুক। চাহিয়াছে যখন ভগবানকে স্বামীভাবে তখন তাহা সে পাইবেই। যখন বাসনা উদয় হইয়াছে ওর হৃদয়ে, ভগবানের ওকে গ্রহণ করিতেই হইবে পত্নীরূপে। কিন্তু একপত্নী-ব্রতধর শ্রীরাম অন্য নারী গ্রহণ করিতে পারেন না পত্নীরূপে। সুতরাং যতদিন না তিনি আবার আসেন বহুবল্লভ হইয়া ততদিন সূর্পণখাকে অপেক্ষা করিতেই হইবে।

এই অপেক্ষার সুদীর্ঘ সময় মধ্যে যদি অন্য কেহ তাহার পাণিগ্রহণ করে বা অন্য কাহারও প্রতি তার চিত্ত আকৃষ্ট হয়, তাহা হইলে শ্রীহরির ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু নামে দোষ স্পর্শিবে। তাই করুণানিলয় প্রভু তাহা হইতে দিবেন না। দ্বাপরে আসিবেন নন্দালয়ে বহুবল্লভ হইয়া যে চাহিবে চরণসেবা তাহাকেই গ্রহণ করিবেন। যতদিন না আসেন, ততদিনের জন্য সূর্পণখাকে এমন করিয়া রাখিতে হইবে, যাহাতে কোন পুরুষ আর তাহাকে না চায়, সেও আর কোন পুরুষকে না চায়। বিরূপ করায় সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল।

তারপর দ্বাপরে সেই সূর্পণখা আসিল কুব্জা হইয়া। জন্মাবধি তার এমন কুঁজ যে, কোন পুরুষ তাহাকে গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইবে না। ততদিন তাহাকে কুরূপ করিয়া রাখিলেন যতদিন স্বয়ং আসিয়া তার পাণিপীড়ন না করিলেন। সুতরাং সূর্পণখার বিরূপকরণে নির্দ্দয়তা নাই, করুণাই আছে। আর বালীবধও নির্দ্দয়তা নহে। বালীবধান্তে বালীর স্ত্রী তারা বিলাপ করিতে করিতে শ্রীরামকে ভৎ´সনা করিয়া যতগুলি প্রশ্ন তুলিয়াছিল

শ্রীরাম সে সবগুলিরই যুক্তসঙ্গত উত্তর দিয়াছিলেন। বালী মহাপাপ করিতেছিল কনিষ্ঠের সহধর্মিণীকে অঙ্কশায়িনী করিয়া। এই চরিত্রহীনতার জন্য সে দণ্ডার্হ। সুগ্রীব রামের বন্ধু। বন্ধুর শত্রু শত্রুই। হীনকর্ম্মা শত্রুকে বধ করা রামের কর্ত্তব্য। বালীর বর ছিল সম্মুখ সমরে কেহই তাহাকে বধ করিতে পারিবে না। সুতরাং অন্তরাল হইতে তীর ক্ষেপণে কোন দোষ হইতে পারে না।

বলি-ছলনাতেও ধূর্ত্ততা নাই, করুণাই আছে। দুই পদক্ষেপে বামনদেব ত্রিভুবন আক্রমণ করিয়া বলিকে কহিলেন, আর এক পা কোথায় দিব? বলি বলিলেন প্রভু আমারও আর স্থান নাই, আপনারও আর পা নাই। প্রভু বলিলেন যদি স্থান দিতে পার তাহা হইলে পা দিতে পারি। বলি ভাবিলেন সর্ব্বস্ব দিয়াছি বটে কিন্তু নিজেকে তো দেই নাই, তখন তিনি নিজ মস্তক পাতিয়া দিলেন। প্রভু বামনদেব তাহার আর একটি চরণদ্বারা গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহাকে পাতালে নিয়া গেলেন। পাতালে গিয়া তাঁহাকে বন্দী করিলেন এটা বড় কথা নয়—তাঁর দুয়ারে যে নিজে চিরতরে বন্দী হইয়া রহিলেন ইহাই প্রধান কথা। সকল কার্য্যেই করুণাময়ের করুণাধারা প্রবাহিত। মহাভাবসিন্ধুর সুগভীর বক্রভাবের তরঙ্গাঘাতে সঞ্চারীভাবের প্রবলতায় শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের গুণেও দোষাবিষ্কার করিতেছেন। ইহাই চিত্রজল্প।

শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্বলীলায় শ্রীরাম ও বামন ছিলেন। এই কথা বলিলে শ্রীরাধা, শ্রীকৃষ্ণ যে ভগবান্ ইহা জানেন এই রূপ প্রতিপন্ন

হয়। ঐশ্বর্য্যগন্ধহীন শ্রীরাধার শুদ্ধ মাধুর্য্যাবগাহী প্রেমে ঈশ্বর-বুদ্ধির লেশমাত্র থাকিতে পারে না ইহাও কথিত হয়। তিন প্রকারে এই জিজ্ঞাসার সমাধান সম্ভব।

১। শ্রীরাধা, তাঁর গণ, তথা অন্যান্য ব্রজজন জানেন, শ্রীকৃষ্ণ যে ভগবান্ এ সংবাদ। শ্রীকৃষ্ণসঙ্গে মিলনকালে আনন্দের উল্লাসে ঐ ঈশ্বরত্ব-বোধের উদয় হয় না। বিরহকালে মাঝে মাঝে ব্যক্ত হইয়া পড়ে। কটাহভরা দুগ্ধের মধ্যে এক টুক্‌রা তৃণ যেমন পরিদৃষ্ট হয় না, কিন্তু দুগ্ধ আগুনের উপর বসাইয়া জ্বাল দিলে ফুটিতে থাকে যখন, তখন মধ্যে মধ্যে ঐ তৃণখণ্ড দৃষ্টিগোচরে আসে, আবার তাহা ধরিতে ধরিতে হারাইয়া যায়। ব্রজপ্রেমের দুগ্ধকটাহে ঐশ্বর্য্যবুদ্ধি ঐরূপ তৃণখণ্ডের মত লুকাইয়া থাকে। বিরহের তাপে প্রীতিদুগ্ধ যখন উদ্বেলিত হয়, তখন দৃষ্টিপথে আসে আবার লুকাইয়া যায়। বিরহে ভগবদ্বোধক উক্তি রাস রজনীতে গোপী-গীতিতেও দৃষ্ট হয়। "ন খলু গোপিকানন্দনো ভবান্ অখিলদেহিনামন্তরাত্মধৃক্।"

২। শ্রীরাধা ও অন্যান্য ব্রজজনেরা শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান্ বলিয়া কখনও জানেন না। তিনি তাঁদের প্রেষ্ঠ, প্রিয়তম, শ্রেষ্ঠ নহেন। শ্রীকৃষ্ণ গোপীর জীবিতেশ্বর, কখনও জগদীশ্বর নহেন। তবে যে ঐরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়, তাহা, তাঁহাদের নিজেদের জানা বা বিশ্বাস করার কথা নয়—শোনা কথা মাত্র। গর্গাচার্য্য, পৌর্ণমাসী দেবী, নান্দীমুখী প্রভৃতির মুখে তাঁহারা শুনিয়াছেন যে কৃষ্ণ নাকি মানুষ নয়, ঈশ্বর। এই শোনা কথা প্রয়োজন হইলে তাঁরা ধার করিয়া প্রয়োগ করে। যেমন গরীব লোকের নিজেদের

ভাল কাপড় অলঙ্কার থাকে না, কোন বিশেষ অনুষ্ঠানে যাইতে হইলে তাহারা প্রতিবেশী ধনী-বন্ধুর মেয়েদের নিকট হইতে উহা ধার চাহিয়া লয়, আবার কার্য্যান্তে প্রত্যর্পণ করে। তদ্রূপ, শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বর, এই ভাবনা গোপীদের অন্তরের সম্পদ নহে। অন্যের নিকট হইতে ধার করা কথা। কৃষ্ণ-সঙ্গে মিলন কালে ঐ বস্তু তাঁহারা কখনও ধার করেন না। বিরহকালে, ক্রন্দনকালে নিবেদন প্রার্থনা করিতে বা বাম্যভাবের ওলাহন করিতে, তাঁহারা ঐ সব পরের দ্রব্য কিছু সময়ের জন্য ধার করিয়া ব্যবহার করেন মাত্র।

৩। এই শ্লোকে কৃষ্ণ যে অন্য লীলায় শ্রীরাম বা শ্রীবামন ছিলেন এমন কোন উক্তি নাই। "তদলমসিতসখ্যৈঃ" অসিতের সঙ্গে সখ্যে আর প্রয়োজন নাই, এইমাত্র আছে। অসিত পদে শ্যামবর্ণ। নির্ব্বেদ-সঞ্চারী ভাবের গাঢ়তায় শ্রীরাধার এস্থলে শ্যামবর্ণ মাত্রের প্রতি দোষদৃষ্টি উদ্‌গত হইয়াছে। শ্যাম-নাম উচ্চারণ করিতেও ভীতা হইয়া অসিতবর্ণ বলিয়াছেন। যাঁরা যাঁরা শ্যামবর্ণ, জগতে তাঁরা তাঁরাই কুটিল ও নির্দ্দয়। এত ভাল রাম, এত গুণে গুণী, তবু শুধু শ্যামবর্ণ বলিয়া সূর্পণখা ও বালীর প্রতি নির্দ্দয়তা করিয়াছেন। কশ্যপের পুত্র বামন, আজন্ম ব্রহ্মচারী ও নিঃসঙ্গ হইয়াও বলির প্রতি ধূর্ত্ততাচরণ করিয়াছেন—কেবল-মাত্র শ্যামবর্ণ বলিয়া। বর্ণগত সাম্যে রাম ও বামনের মত ভাল লোকও যখন নির্মম হইয়াছেন, তখন স্বভাবতঃ কুটিল যে যদুপতি, কালোবর্ণ হওয়ায় যে নির্দ্দয় ও কপটী হইবে ইহাতে আর সন্দেহ কি? সুতরাং শ্যামলের কৌটিল্যে ভীতা হইয়াই

শ্রীমতী ঐ সব উক্তি করিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণে ঈশ্বরবুদ্ধি হইতে নহে। বস্তুতঃ ঐ সকল কথা কোন বিচার-বুদ্ধি হইতে উদ্ভূত নহে, মহাভাবসমুদ্রের তরঙ্গমালার অসংখ্য উচ্ছ্বাসই এই সকল চিত্র-জল্পের মূল উৎস।

॥ বাইশ ॥

"পূর্ব্বজন্মে রাম হঞা, বালী কপি বিনাশিয়া,
যেহ কৈল ব্যাধের আচার।
সূর্পণখার নাসাকর্ণ, তাহা কৈল ছিন্ন ভিন্ন,
বড়ই নির্দ্দয় মন তার॥
পুনশ্চ বামন হঞা, বলির সর্ব্বস্ব লঞা,
দৃঢ় বন্ধন করিল তাহার।
হেন কৃষ্ণবর্ণ যে, তার সখ্য চাহে কে,
তবু তার কথা ছাড়া দায়॥"

মৃগয়ুরিব কপীন্দ্রং বিব্যাধেহলুব্ধধর্ম্মা
স্ত্রিয়মকৃতবিরূপাং স্ত্রীজিতঃ কামযানাম্।
বলিমপি বলিমত্ত্বা-বেষ্টয়দ্‌ধ্বাঙ্ক্ষবদ্ য-
স্তদলমসিতসখ্যৈর্দুস্ত্যজস্তৎকথার্থঃ॥

ভাঃ ১০।৪৭।১৭

"দুস্ত্যজস্তৎকথার্থঃ।" গোবিন্দের কথা-সম্পত্তি কদাপি ত্যাগ করিতে পারি না। তাঁর নির্দ্দয়তার চরম খবর জানিয়াছি। তাঁহাকে একান্তভাবেই ত্যাগ করিয়াছি। কিন্তু হায়! ছাড়িতে পারি নাই কেবল তাঁর কথা। এই কথা বলিতেই শ্রীরাধার মন কৃষ্ণকথার ভাবনায় ডুবিয়া গেল। একে ত রাধার স্বাভাবিক বাম্যভাব। তাহাতে আবার দিব্যোন্মাদ অবস্থা, তদুপরি কৃষ্ণ-প্রেরিত দূত মনে করিয়া ভ্রমরের দর্শনে মানবতী। তাই কৃষ্ণ-কথার দোষোদ্‌গার করিতে লাগিলেন, অনন্যসাধারণ বক্রিমায়।

তাঁর কথা রমণীয় বটে, কিন্তু আপাতকর্ণসুখকর। যে শোনে ঐ কথা, তারই ক্ষতি হয়। ধার্ম্মিক ব্যক্তি শুনিলে আস্থা হারায় ধর্ম্মের প্রতি। ধনী শুনিলে আদরশূন্য হয় সে ধনের প্রতি। ভোগী শুনিলে আসক্তি কাটিয়া যায় তার ভোগের প্রতি। বুঝিতে পারি না, কী মায়াময়ী মোহিনী শক্তি আছে তাঁর কথার মধ্যে। সেও যেমন মোহিনী, মোহিনীমূর্ত্তিতে শিবকে পর্য্যন্ত ভুলায়, তাঁর কথাও তেমনি—যে শোনে, তাকে ভুলাইয়া দিবে তার স্নেহ আদরের যাবৎ বস্তু।

ঐ কথার এক কণিকামাত্র আস্বাদ করিলে তার দ্বন্দ্বধর্ম্ম নাশপ্রাপ্ত হয়। স্ত্রী শুনিলে কমিয়া যায় তার পতির প্রতি প্রেম। পতি শুনিলে নষ্ট হয় পত্নীর প্রতি আসক্তি। পুত্রের নষ্ট হয় পিতা-মাতার প্রতি শ্রদ্ধা, পিতা-মাতার যায় সন্তানের প্রতি মমতা। কী যে মাদকতা তাঁর কথায়! কর্ণগত করিবে যে, তারই সর্ব্বনাশ। চিত্ত যাদের কোমল, অতীব স্নেহপরায়ণ, তারাও যদি শোনে কুটিল কৃষ্ণের কঠোর লীলার কাহিনী, অমনি

দয়ামায়াহীন নির্মম হইয়া পড়ে তারা। অতি দীনদরিদ্র মা বাপ ভাই বন্ধু স্ত্রীপুত্রকেও হেলায় পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারে, তাহারা তাহাতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না। এইরূপ স্নেহপ্রবণ ব্যক্তিদের নির্দ্দয়তা দেখিয়া মনে হয় কৃষ্ণকথা শ্রবণই ঐরূপ স্বভাব পাইবার পক্ষে হেতু। "সপদি গৃহকুটুম্বং দীনমুৎসৃজ্য দীনাঃ।"

নির্দ্দয় হইয়া সব ছাড়িয়া গিয়া অবশেষে তারা যদি নিজেরা কিছু সুখ লাভ করিত তাহা হইলেও কিঞ্চিৎ প্রবোধ দেওয়া যাইত। তাহাও হয় না। তাহারা পাখীর মত কুড়াইয়া খাইয়া ভিক্ষুধর্মে জীবন ধারণ করে "ভিক্ষুচর্য্যাং চরন্তি।" তাহারা যেন একেবারে পাখী হইয়া যায়। সেও আবার উড্ডয়নক্ষম পাখী নয়—হংস। ছোট হংস নয়—বড়, পরমহংস। এইরূপ লোকের সংখ্যা যে দুই চারজন তাহাও নহে। বহু "বহব ইহ বিহঙ্গাঃ।" তাঁর লীলাকথা শুনিয়া অশেষ দুঃখ বরণ করিয়াছে এরূপ মানুষের সংখ্যা সহস্র সহস্র। তারা ঐ কথা শোনার ফলেই দুর্গতি ভোগ করিয়াছে। যাহারা ঐসকল লীলাকথা গ্রন্থে লিখিয়া বা মুখে বলিয়া প্রচার করে, তাহারা পরপীড়ক সাধুবেশী ঘাতক। অপরকে দুঃখ দেওয়াই তাদের স্বভাব। পরের কষ্ট দেখিয়া সুখ পায় তারা। কেহ হরিকথা শুনিয়া অশ্রু ফেলিলে তাহারা সুখী হইয়া বাহবা দেয়।

শ্রীরাধা বাম্য স্বভাবে শ্রীকৃষ্ণকথার যে সকল মহিমা কীর্ত্তন করিলেন, মূলতঃ সবই তথ্য। ব্যাজস্তুতিতে শ্রীকৃষ্ণকথার সর্বোৎকর্ষই প্রকাশিত হইল। সত্যসত্যই হরিকথার এমনই

মোহন মাধুর্য্য যে, উহা যে ব্যক্তি কর্ণগত করে তারই জাগতিক বিষয়ে বৈরাগ্যের উদয় হয়। ব্রজের পথে অহর্নিশ পাখীর মত ভগবদ্‌গুণগানে সে মজিয়া থাকে। বনবাসী হইয়া মাধুকরী করিয়া দিন কাটায়। "বহব ইহ বিহঙ্গাঃ ভিক্ষুচর্য্যাং চরন্তি।" পাখী হইয়া ভিক্ষাবৃত্তিতে দিন কাটায়। কৃষ্ণকথা সজ্জনগণকে দুঃখ দেয়, সুতরাং তাঁহা ত্যাগ করাই উচিত। কিন্তু আমরা তাহা কিছুতেই ত্যাগ করিতে পারিতেছি না।

যদনুচরিতলীলাকর্ণপীযূষবিপ্রুট্‌-
সকৃদদনবিধূতদ্বন্দ্বধর্ম্মা বিনষ্টাঃ।
সপদি গৃহকুটুম্বং দীনমুৎসৃজ্য দীনা
বহব ইহ বিহঙ্গা ভিক্ষুচর্য্যাং চরন্তি॥

ভাঃ ১০।৪৭।১৮

অনুতাপ ভঙ্গিতে দোষের উদ্‌গার করায় এই শ্লোকে অভিজল্প নামক চিত্রজল্পের ভেদ প্রকটিত হইল। ইহার লক্ষণ—

"ভঙ্গ্যা ত্যাগৌচিতী তস্য খগানামপি খেদনাৎ।
যত্র সানুশয়ং প্রোক্তা তদ্‌ভবেদমভিজল্পিতম্‌॥"

শ্রীরাধিকা ভ্রমর-গুঞ্জন শুনিতেছেন। বিরহিণী ভাবকর্ণেই শুনিতেছেন। ভ্রমর বলিতেছে, দেবি, আগে প্রিয়তমের সন্দেশ শ্রবণ করুন। তারপর বিচার করিয়া যাহা হয় বলুন। শ্রীরাধা বলিলেন, না রে, আর শুনিব না। তাঁর কথা আর শুনিব না। সেই কপটীর কথা আর নহে। পূর্ব্বে অনেক শুনিয়াছি। তাঁর কুটিলতা-ভরা কথা "জিহ্মব্যাহৃতং" বিস্তর শুনিবার সুযোগ হইয়াছে। তাতে কি ফল হইয়াছে? হরিণীরা যেমন ব্যাধের

গান শোনে—"কুলিকরুতমিবাজ্ঞাঃ কৃষ্ণবধ্বো হরিণ্যঃ।"

ব্যাধের বাঁশীর গান শুনিয়া মুগ্ধ হইবার অর্থ হইল প্রাণত্যাগ, ব্যাধের নিষ্ঠুর বাণাঘাতে। তোর সখা কপটী কৃষ্ণের মিথ্যা বাক্যে মুগ্ধ হইবার ফলও তাহাই। তাঁর নখস্পর্শে যে তীক্ষ্ণ বিষ আছে তাহার অন্তর্দাহে জীবনান্ত হইতেছে। হরিণীরা তবু বাণাঘাতে মরিয়া যায়। আর জ্বালা থাকে না মরিয়া গেলে। আমরা মরিতে পারিতেছি না, ঐ নখস্পর্শের মধ্যে যে এক কণা অমৃত আছে, তার আস্বাদনের ফলে। বিষামৃতে মিলিত তাঁর স্পর্শ। বিষ দেয় মরণতুল্য জ্বালা, আর অমৃত মরিতে দেয় না—তাপ-জ্বালাকে চিরস্থায়ী করিয়া রাখে।

ওরে ভণ্ডের মন্ত্রী, ভণ্ডবিদ্যা-বিশারদ ভ্রমর চুপ করিয়া আছিস কেন? শোন্, বলি—অবন্য কৃষ্ণকথা চিরত্যাগ করিয়া অন্য কথা বল্ "ভণ্যতামন্যবার্ত্তা"। ঐ কথা ছাড়া সব কথাই শুনিব। সবই ভাল। তুই কি অন্য কথা কিছু জানিস না?

"বয়মৃতমিব জিহ্মব্যাহৃতং শ্রদ্দধানাঃ
কুলিকরুতমিবাজ্ঞাঃ কৃষ্ণবধ্বো হরিণ্যঃ।
দদৃশুরসকৃদেতৎ তন্নখস্পর্শতীব্র-
স্মররুজ উপমন্ত্রিন্! ভণ্যতামন্যবার্ত্তা॥"

ভাঃ ১০।৪৭।১৯

"অন্য কথা কহ মুখে, শুনি মনে পাই সুখে,
না করিহ কৃষ্ণের বর্ণন।"

এই চিত্রজল্পে অতি নির্বেদযুক্ত শ্রীকৃষ্ণকথার কুটিলতা ও দুঃখদায়কতার বর্ণনা হইয়াছে সঙ্গে সঙ্গে তৎকথা ভিন্ন অন্য কথায়

সুখদায়কত্বের ইঙ্গিত হইয়াছে। "আজল্প" নামক চিত্রজল্পের এই লক্ষণ—

"জৈহ্মাং তস্যার্ত্তিদত্বঞ্চ নির্ব্বেদাদ্ যত্র কীর্ত্তিতম্।
ভঙ্গ্যান্যসুখদত্বঞ্চ স আজল্প উদীরিতঃ॥"

প্রচণ্ড মানমতী হইয়া শ্রীরাধা এই সকল কথা বলিতেছেন। দিব্যোন্মাদের বিরহসমুদ্রের উপরে এই মান ভাসমান দ্বীপের মত। হঠাৎ এক ভাব-তরঙ্গে দ্বীপ যেন ভাসিয়া গেল। ভ্রমরকে দেখিতে না পাইয়া মানাপগমে কলহান্তরিতা অবস্থার উদয় হইল।

চরণে পতিত বল্লভকে ক্রোধযুক্তভাবে উপেক্ষা করিয়া শেষে যে তাপযুক্তা হয় সেই নায়িকাকে কলহান্তরিতা বলে।

"যা সখীনাং পুরঃ পাদপতিতং বল্লভং রুষা
নিরস্য পশ্চাত্তপতি কলহান্তরিতা তু সা।"

এখানে অবশ্য তিনি কৃষ্ণকে উপেক্ষা করেন নাই। কৃষ্ণ-প্রেরিত ভ্রমরকে উপেক্ষা করিয়াছেন। এই ভাবনায়ও শ্রীমতী অতীব বিষাদিতা হইলেন। "হায়! হায়!! কী অন্যায় কার্য্য করিলাম আমার মান প্রসাদনের জন্য প্রাণনাথ দূত পাঠাইলেন, আর হতভাগিনী আমি, কর্কশ বাক্যে তাহাকে উপেক্ষা করিলাম! অপমানিত হইয়া সে চলিয়া গেল। এখন কী করিব!" আকুল হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন বিরহিণী। আর প্রতি মুহূর্ত্তে ভ্রমরের আগমনপথে নেত্র অর্পণ করিয়া রহিলেন। যদি আবার আসে, আর অমন কঠোরভাবে উপেক্ষা করিব না। ভাবিতে ভাবিতে সহসা ভ্রমরকে দেখিতে পাইলেন। এবার

একটু সুর বদলাইয়া বলিতে লাগিলেন।—

প্রিয় সখে! আবার আসিয়াছ "পুনরাগাঃ"? তুমি কি চলিয়া গিয়াছিলে প্রাণ-প্রিয়তমের কাছে? তাঁর কাছে গিয়া কি বলিয়াছ আমার দুর্দ্দশার কাহিনী? সে কি তোমাকে আবার পাঠাইয়া দিয়াছে আমাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য? "প্রেয়সা প্রেষিতঃ কিম্।" "প্রিয়তম পাঠাইয়াছেন" প্রেমভরা আর্ত্ত কণ্ঠে এই কথা বলিতেই শ্রীরাধা নিদারুণ মূর্চ্ছাদশা প্রাপ্ত হইলেন।

মূর্চ্ছিতা শ্রীরাধার অবস্থা সন্দর্শনে উদ্ধব বিচলিত হইলেন, তাঁহার ধৈর্য্য বৈভব বিলুপ্ত হইয়া গেল। বিরহ শব্দটি অনেক শুনিয়াছেন আজ তাহার প্রকট মূর্ত্তি দর্শন করিলেন উদ্ধব মহাশয়। শুনিতে লাগিলেন তার প্রলাপোক্তি। মূর্চ্ছাদশাতেই মোহযুক্ত প্রলাপ বলিতে লাগিলেন বিরহিণী। "আমার কঠোর ব্যবহারে ক্ষুণ্ণ না হইয়া তুমি আবারও আসিয়াছ মধুকর? আহা! তোমার প্রিয়তা-ব্যবহারের ঋণ কি করিয়া পরিশোধ করিব?"

তুমি আমার নিকট কি বর চাও ভ্রমর, "বরয় কিমনুরুন্ধে" হে প্রিয় ভ্রমর,—তুমি আমার সম্মানিত অতিথি "মাননীয়োঽসি মেঽঙ্গ" তুমি আমার প্রিয়কারী। দূত তুমি, তোমাকে এক-পক্ষীয় মনে করিয়া আমি কটুক্তি করিয়া অন্যায় করিয়াছি। আমি আমার স্ব-বশে নাই। তুমি আমার ত্রুটি ধরিও না। তোমার কী অভিলষিত বস্তু তাই বল শুনি। যদি সামর্থ্যাধীন হয় তবে তাহা নিশ্চয়ই দিব।

পুনরায় ভ্রমর-গুঞ্জনে কাণ দিয়া বলিতে লাগিলেন। কি বলিতেছ তুমি দূত, আমাকে মথুরা লইয়া যাইতে চাও রথে

করিয়া তোমার প্রভুর নিকট ? অনুনয় করি দূত—এই কথাটা বলিও না। তুমি ত অরসজ্ঞ নও, অবিবেচকও নও। প্রাণনাথকে ঘিরিয়া আছে এখন সপত্নীরা। আমি সেখানে গেলে তাদেরও দুঃখ, আমারও দুঃখ। একে ত বিরহবেদনায় মর্মস্থল ভাঙ্গিতেছে—আবার তদুপরি সপত্নী-বিদ্বেষ-জ্বালা কেন দিবে ? যদি বল, না—সেখানে আমার কেহ সপত্নী নাই এ অসত্য কথা বলিও না। আমি দিব্য চক্ষে দেখিতেছি শ্রীবধূ বুক জুড়িয়া বসিয়া আছে। "সততমুরসি সৌম্য শ্রীর্ব্বধূঃ সাকমাস্তে।"

"সেথা আমি না যাইব, যায়া সঙ্গ নাহি পাব,
লক্ষ্মী হৃদে আছয় বসিয়া।"

যতদিন ব্রজে ছিলেন, তাঁর বুকভরা ছিল প্রেম। লক্ষ্মী স্থান পায় নাই। ছিল এক ক্ষীণ স্বর্ণরেখারূপে বুকের এক পার্শ্বে। এখন ঐশ্বর্য্য অন্তর জুড়িয়া আছে তাঁর। লক্ষ্মী এখন আর স্বর্ণ-রেখারূপে নাই। বধূরা সেই বক্ষবিলাস করিতেছে। তুমিই বল দেখি ভ্রমর—এমত অবস্থায় আমি কি করিয়া যাইতে পারি তাঁহার নিকট ? সুতরাং তুমি তাঁহাকেই লইয়া আইস আমার নিকটে। ইহাই শ্রীরাধার অন্তরের গূঢ় লালসা।

প্রিয়সখ ! পুনরাগাঃ প্রেয়সা প্রেষিতঃ কিং
বরয় কিমনুরুন্ধে মাননীয়োঽসি মেঽঙ্গ।
নয়সি কথমিহাস্মান্ দুস্ত্যজদ্বন্দ্বপার্শ্বং
সততমুরসি সৌম্য ! শ্রীর্বধূঃ সাকমাস্তে॥

ভাঃ ১০।৪৭।২০

এই শ্লোকে শ্রীলক্ষ্মীর প্রতি ঈর্ষ্যা আছে। দূতের প্রতি সম্মাননা আছে। আবার তার বর অঙ্গীকার করিয়াও অনৌচিত্য বোধে অস্বীকার করা আছে। এই শ্লোকে পূর্বের মত উদ্ধত ভাব নাই। অনুদ্ধতভাবে বিনয় সহকারে স্তুতি আছে। যুক্তির অবতারণ, আছে। ইহার নাম প্রতিজল্প।

দুস্ত্যজদ্বন্দ্বভাবেঽস্মিন্ প্রাপ্তির্নার্হেত্যনুদ্ধতম্।
দূতসম্মাননেনোক্তং যত্র স প্রতিজল্পকঃ॥

তাঁর পার্শ্বে তাঁর প্রিয়াগণ আছে, সুতরাং সেখানে যাওয়া উচিত নয়, এই যুক্তি প্রদর্শনপূর্বক, বিনয়ের সহিত দূতকে সম্মাননাযুক্ত যে প্রলাপোক্তি তাহাকে প্রতিজল্প বলে।

কথা বলিতে বলিতে হঠাৎ শ্রীরাধার প্রণয়-কোপ ও তজ্জনিত বাম্যভাব দূর হইয়া গেল। কিন্তু ভ্রমরকে তখন দেখিতেছেন। মনে হইল শ্রীরাধার, কৃষ্ণদূতের প্রতি ব্যবহার খুব রুক্ষ হইয়াছে। অনুতাপযুক্ত অন্তরে স্বগত বলিতে লাগিলেন—আহা! কি অন্যায়ই করিলাম, প্রাণপ্রিয়তম আমাকে সান্ত্বনা দিতে দূত পাঠাইয়াছেন, আর আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম না যাহা জিজ্ঞাসা করা একান্তই প্রয়োজন—শুধু ওকে আর তাঁকে ভৎর্সনাই করিলাম। এই ভাবনায় কতকটা সারল্য, দৈন্য ও উৎকণ্ঠা দেখা দিল। গদ্‌গদকণ্ঠে নয়নজলে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"ভ্রমর, আর্য্যপুত্র কি বর্ত্তমানে মথুরাতেই আছেন? "অপি বত মধুপুর্য্যামার্য্যপুত্রোঽধুনাস্তে।" ভ্রমরের গুঞ্জনে শ্রীরাধা শুনিলেন, "হাঁ মধুপুরীতেই আছেন।" "যদি থাকেন," শ্রীরাধা বলিলেন, "তাহা হইলে পিতা নন্দ ও মাতা যশোমতীর কথা কি

তাঁর স্মরণপথে আছে ? "স্মরতি সঃ পিতৃগেহান্" ব্রজের আত্মীয়-গণের কথা সখাগণের কথা কি তাঁর মনে আছে ? যদি বল আছে, তাহা হইলে ব্রজে আসে না কেন ? আসিয়া একবার দেখিয়া যাওয়া উচিত, তাঁর অভাবে ব্রজের গৃহগুলির কি অবস্থা হইয়াছে। তৃণ, ধূলি ও মাকড়সার জালে ভরা ব্রজের বাড়ীঘরগুলির কথা কি দিনান্তেও মনে করেন ? মনে করিয়া যদি আসেন তাহা হইলেই দেখিতে পাইবেন—যাহা ছিল একদিন পরমানন্দে ভরপূর, আজ তাহা আবর্জ্জনাপূর্ণ আঁস্তাকুড়। দিনান্তেও কি একটিবার সে কথা তিনি মনে করেন ? মধুকর ! আমাদের প্রিয়তম কখনও কি স্মরণ করেন এই দীনহীনা হতভাগিনী দাসীদের কথা ? কেহ মনে করাইয়া দিলে হয় ত মনে পড়ে। কিন্তু তাহা আমরা শুনিতে চাই না। কথার প্রসঙ্গে স্বতঃউৎসারিতভাবে কি কখনও আমাদের কথা শ্রীমুখে উচ্চারণ করেন "ক্বচিদপি স কথা নঃ কিঙ্করীণাং গৃণীতে ?"

কোন গাঁথা-মালা দেখিয়া কি কখনও বলেন, "আহা এই মালাখানি বড় সুন্দর, তবে ব্রজসুন্দরীদের গাঁথামালার মত মনোহারী নয়।" প্রিয়জনদের রচিত শয্যায় শয়ন করিতে গিয়া কখনও কি বলেন, "আহা, এই শয্যারচনার কি পারিপাট্য। কিন্তু ব্রজললনাদের শয্যারচনার নৈপুণ্য আর কোথাও দেখি নাই।" দর্পণে নিজ শ্রীঅঙ্গের শোভা দেখিতে দেখিতে কোনও সময় কি হঠাৎ বলিয়া উঠেন—"যত সুন্দর বস্ত্রালঙ্কারই পরি না কেন ব্রজাঙ্গনাদের অনুরাগে রচিত বন-ফুলে গুঞ্জহারে সাজিয়া যে সুখ, সে সুখ আর কোথাও মিলে না।" মথুরার কোন সেবাদাসীকে

ডাক দিতে গিয়া ভুলবশতঃ কি কখনও ব্রজের এই দাসীগণের নাম ধরিয়া ডাকিয়া ফেলেন? মধুকর! এই দাসীরা তাঁর অযোগ্য সেবিকা ছিল। অন্যের সেবা দেখিয়া কি কখনও এই দীনদুঃখিনীদের অক্ষমতার কথা তাঁর মনে জাগিয়া উঠে?

হায় রে ভ্রমর! কী আর জিজ্ঞাসা করিব? কেবল একটিমাত্র জিজ্ঞাস্যই আছে অন্তর ভরিয়া। অগুরুর হইতেও মনোহর তাঁহার বাহুর গন্ধ। অগুরু ও চন্দন-বৃক্ষের নিকটস্থ বৃক্ষও যেমন অগুরু-চন্দন গন্ধ পায়—তাঁর করস্পর্শে আমাদের অঙ্গেও অগুরু-গন্ধ খেলিত। সেই পরশমণির স্পর্শে আমার এই হীন দেহও স্বর্ণবর্ণ হইয়া গিয়াছিল। আজ তাঁর বিহনে সেই বর্ণও নাই, আর সে গন্ধও নাই।

ভ্রমর রে! আবার কবে আসিবেন এই ব্রজে সেই ব্রজ-জীবন, কবে আসিয়া বিশাল বাহুখানি দিবেন আমাদের মাথায়? "ভুজমগুরুসুগন্ধং মূর্দ্ধন্যধাস্যৎ কদা নু" কবে শিরে হস্ত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া অভয় দিবেন, যেন এমন বিরহাগ্নিতাপে আর কখনও দগ্ধীভূত হইতে না হয়। আবার কবে এই ভাগ্যহীনাদের কণ্ঠ আলিঙ্গন করিবেন অগুরু-সুগন্ধ সুবর্ত্তুল বাহুখানি দ্বারা, কবে আত্মসাৎ করিয়া লইবেন এমন নিবিড়ভাবে, যেন অনন্ত জীবনেও আর ছাড়াছাড়ি না হয়!

> অপি বত মধুপুর্য্যামার্য্যপুত্রোঽধুনাস্তে
> স্মরতি স পিতৃগেহান্ সৌম্য! বন্ধূংশ্চ গোপান্।
> ক্বচিদপি স কথা নঃ কিঙ্করীণাং গৃণীতে
> ভুজমগুরুসুগন্ধং মূর্দ্ধন্যধাস্যৎ কদা নু॥
>
> ভাঃ ১০।৪৮।২১

দশবিধ চিত্রজল্পের এইটি শেষ। এটির নাম সুজল্প। ইহার লক্ষণ এই—

"যত্রার্জ্জবাৎ সগাম্ভীর্য্যং সদৈন্যং সহচাপলম্।
সোৎকণ্ঠঞ্চ হরিঃ স্পৃষ্টঃ স সুজল্পো নিগদ্যতে ॥"

দিব্যোন্মাদ অবস্থার বিচিত্রতাময় প্রলাপ বলিতে বলিতে যখন সরলতা আসে, গাম্ভীর্য্য, দৈন্য, চাপল্য ও উৎকণ্ঠার সহিত দূতকে প্রিয়ের কথা জিজ্ঞাসা করে, তখন তাহাকে সুজল্প বলে।

"ঋজুতা গাম্ভীর্য্য দৈন্য সোৎকণ্ঠা চপল।
সুজল্প জিজ্ঞাসা করে সংবাদ সকল ॥"

এই শ্লোকে, "আর্য্যপুত্র কি মথুরায় আছেন," এই বাক্যে প্রাণসারল্য। পিতার কথা, বন্ধুজনের কথা, আত্মীয়স্বজনের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াও নিজের কথা জিজ্ঞাসা না করায় গাম্ভীর্য্য প্রকাশ। এই দাসীদের কথা জিজ্ঞাসা করেন কি না—এই প্রশ্নে দৈন্য আছে। কবে আবার শ্রীহস্ত শিরে দিবেন—এই বাক্যে চাপল্য ও উৎকণ্ঠা সুস্পষ্টই রহিয়াছে।

শুধাই বিনয়ে অতি, মথুরার প্রাণপতি
পিতৃগৃহ স্মরে কি কখন?
গোপগণে পড়ে মনে, এই দিব্য বৃন্দাবনে,
পড়ে মনে যত কেলিগণ?
মোরা চির কিঙ্করী, কভু কি স্মরণে হরি,
কথা কিছু কহে কি কখন?
তাঁর দীর্ঘ-ভুজদণ্ড, যাহাতে অগুরু গন্ধ,
শিরে কবে করিবে অর্পণ ॥

কবে পুনঃ পাব দরশন।”

আবার কবে আমাদের অঙ্গ স্পর্শ করিবেন, এই কথা বলিতে বলিতে সেই আজানুলম্বিত সুবর্ত্তুল বাহুযুগলের কথা অন্তরে সমুদিত হওয়ায় রাধার অঙ্গে অষ্টসাত্ত্বিকভাবের বিকাশ হইল অতীব সুদীপ্ত ভাবে। অধিরূঢ় মহাভাবগুলি ফুটিয়া উঠিল সেই বর-অঙ্গে। ভূমি হইয়া গেল পঙ্কিল, নয়নের ধারায় ধারায়। সর্বদেহ কদলীপত্রের ন্যায় কম্পমান। সর্ব্বাঙ্গে স্বেদধারা গলিতে লাগিল। অজস্র লালাস্রাব হইতে লাগিল। শ্বাসরোধ হইয়া গেল।

“দশেন্দ্রিয় ছেড়ে গেল, নবদ্বার বন্ধ এ’ল,
শবপ্রায় পড়ে কলেবর।”

এমন ভীষণ দশা প্রাপ্ত হইলেন যে, দেহে প্রাণ আছে কি না, এর বোধও রহিল না। বিরহবেদনা একটি শব্দমাত্র ছিল অভিধানে। আজ উদ্ধব মহাশয়ের নিজের নয়নগোচরে বিরহার্ত্তির মূর্ত্তি প্রকটিত হইল।

———

॥ তেইশ ॥

ক্রমে ভাবশান্তি হইল শ্রীরাধার। চলিয়া গেল প্রণয়কোপ ও মান। উদয় হইল স্বাভাবিক বিরহের। শ্রীমান উদ্ধব এতক্ষণ দাঁড়াইয়াছিলের এক পার্শ্বে। আস্তে আস্তে সসম্ভ্রমে নিকটস্থ হইলেন। সাগরসঙ্গমে তরঙ্গ উঠিলে নৌকার মাঝি নৌকা লাগাইয়া রাখে এক পার্শ্বে ঢেউয়ের আঘাতে ভাঙ্গিয়া যাইবার ভয়ে। শ্রীরাধার মহাভাবসমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ দেখিয়া উদ্ধব মহারাজও ছিলেন সেইরূপ এতক্ষণ একটি পার্শ্বে দীনের মত দণ্ডায়মান। এখন কিঞ্চিৎ ভাবোপশম দেখিয়া নিকটবর্ত্তী হইলেন।

পরম আনন্দে, উল্লাসে, বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া বলিয়া উঠিলেন—"অহো"! যাহা দেখিয়াছেন ও শুনিয়াছেন তাহাতে উদ্ধবের অন্তরের যে অবস্থা হইয়াছে তাহার উত্তম বাহক "অহো" এই শব্দটিই। অক্ষর দুইটির মধ্যে যেন ভাবরাজ্যের গভীর ইতিহাস। যেন অন্তস্থলের নিরুপম উচ্ছ্বাস। বিস্ময়ের স্তব্ধতা ও আনন্দের মুগ্ধতা—এই দুই বহন করিয়া যেন উদ্ধবের কণ্ঠ হইতে বাহির হইয়া আসিল "অ-হো" এই দ্ব্যক্ষর অব্যয় শব্দটি।

রোরুদ্যমান ব্যক্তিকে সান্ত্বনাবাক্য বলা কর্ত্তব্য। কিন্তু সান্ত্বনার কোন ভাষাই পাইতেছেন না উদ্ধব মহাশয়, সারা বিশ্ব খুঁজিয়া। জগতের লোক কোন প্রিয়জনের অভাবে কাতর হইলে তাহাকে বলা চলে, এই জগতের সম্বন্ধ মিথ্যা এবং

পরমপুরুষের সঙ্গে সম্বন্ধেই সত্য ও আনন্দময়। এই কথা দিয়া যদি তাহাকে ব্যবহারিক জগতের সম্বন্ধ কিছুটা ভুলাইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে শোকার্ত্তের শোকশান্তি কতকটা সম্ভব হয়। কিন্তু ঐ জাতীয় সান্ত্বনা ত ওখানে অচল। এত তীব্র ব্যাকুলতা যাঁহাদের কৃষ্ণের জন্য, তাঁহাদিগকে কী করিয়া বলা চলিবে, আপনারা কৃষ্ণের জন্য কাঁদিবেন না। এ কথা বলিলে মহা অপরাধের কার্য্য হইবে। কারণ শ্রীকৃষ্ণের জন্য আর্ত্তিই জীবের জীবনে চরম পুরুষার্থ। সেই পুরুষার্থ এই ব্রজাঙ্গনারা লাভ করিয়াছেন, আমি উদ্ধব করি নাই। ইঁহাদিগকে দেখিয়া আমার ধিক্কার আসে। কি প্রকারে আমি বলিব ইঁহাদিগকে—কাঁদিবেন না। আমার বলিতে সাধ হয় আরও কাঁদুন, দেখি নয়ন ভরিয়া, শুনি শ্রবণ তৃপ্ত করিয়া—এই দুর্লভ ভাব ও ভাষা অনন্ত বিশ্বে আর কোথাও মিলিবে না।

উদ্ধব বলিলেন, আপনারা আপনারাই, আপনারা নিরুপমা, আপনাদের ভাবের তুলনা নাই। আপনারা "পূর্ণার্থা"। নিখিল পুরুষার্থশিরোমণি কৃষ্ণপ্রেম। সেই প্রেমস্বরূপে আপনারা পরিপূর্ণা। অন্যেরা এই সম্পদ অর্জ্জন করিবার জন্য কত সাধনা করে, আর আপনাদের ঐ সম্পদ নিজস্ব। কৃষ্ণপ্রেমধনের সার নির্য্যাস দিয়াই আপনাদের সত্তা গড়া। তাই আপনারা "লোক-পূজিতা," আপনাদের এই প্রেমকে সকলে পূজা করে; কিন্তু সহসা কেহ লাভ করিতে পারে না।

সর্ব্বাশ্রয় বাসুদেবে আপনাদের মন সর্ব্বতোভাবে অর্পিত হইয়াছে। এই পরিপূর্ণ সমর্পণ আর দেখি নাই। সংসারে

যত প্রকারের সাধনা আছে সকল সাধনার চরম লক্ষ্য—কৃষ্ণ-ভক্তি।

"শ্রেয়োভির্বিবিধৈশ্চান্যৈঃ
কৃষ্ণে ভক্তির্হি সাধ্যতে।"

দান, ব্রত, তপস্যা, হোম, জপ, স্বাধ্যায়, সংযম যত প্রকারের সাধন-ভজনের কথা শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে এবং সাধকেরা অনুশীলন করেন, সবগুলিরই চরমতম লক্ষ্য শ্রীগোবিন্দচরণে ঐকান্তিকী রতি। সেই পরমা রতি আপনাদের নিজস্ব পরম সম্পদ। অন্য সকলের যে ধন সাধ্য—আপনাদের তাহা সিদ্ধ। সুতরাং আপনারা এবং আপনাদের ভাব সর্ব্বলোকবাঞ্ছিত ও পূজিত। আপনারা সকলের আরাধ্য সম্পদ। যে প্রেমভক্তি সকলের কাম্য, আপনারা তার জীবন্ত মূর্ত্তি। সুতরাং আপনারাই সর্ব্বজীবের ভজনের ধন। উত্তমশ্লোক শ্রীগোবিন্দে আপনাদের ভক্তি "অনুত্তমা", যাহা অপেক্ষা উত্তম আর হইতে পারে না—সর্বোত্তমা, সর্বসাধ্য-শিরোমণি। সকল সাধ্যের যাহা অবধি, পরিসীমা তাহাতে আপনারা চিরস্থিত। দাহিকাশক্তি যেমন অগ্নির অর্জিত বস্তু নহে, অগ্নির সঙ্গে একাত্মতাবিশিষ্ট, মহাভাব-লক্ষণা ভক্তি সেইরূপ আপনাদের সত্তার সঙ্গে একীভূত। এই বস্তু "মুনীনামপি দুর্লভা"। এই মহাবস্তু এই মহাপ্রেমলক্ষণা ভক্তি আপনাদের দ্বারা জগতে 'প্রবর্ত্তিত' হইতেছে। কারণ আপনাদের মহানুরাগময়ী ভক্তিপূর্ণ কার্য্যকলাপের কথা যাঁহারা শ্রবণ করিবেন, তাঁহারাও আপনাদের মত গাঢ় আকুলতাপূর্ণ ভক্তিলাভে পূর্ণ হইবেন। যে বস্তু নিজের মত আর কাহারও মত

ময়, তাহার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিবার মত আর কোন ভাষা নাই। এই মহাভাবাত্মিকা ভক্তিও আপনাদের দেহ ছাড়া অন্য দেহ দ্বারা ধারণ করিবার ক্ষমতা নাই। সুতরাং এতাদৃশ বস্তুর গুণকীর্ত্তন করিবার শক্তি নাই। কেবল মর জগৎকে ধন্যবাদ দেই, যে এ বস্তু, ভাবময়ী আপনারা এই জগতে প্রকটিত হইয়া, শ্রীকৃষ্ণকে কেমন করিয়া ভালবাসিতে হয় তাহাই নিজেদের আচরণ দ্বারা প্রচার করিতেছেন। ব্রজ আছে বলিয়া ত্রিলোক ধন্য। আপনারা আছেন বলিয়া ব্রজ ধন্য।

শাস্ত্রে ত্যাগধর্ম্মের বহু কথা আছে। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কথা হইল— "সর্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।" এই মন্ত্রের মূর্ত্তি জগতে আপনারাই। আপনারা ছাড়া আর দেখি না, কারণ একমাত্র আপনারাই—

"দিষ্ট্যা পুত্রান্ পতীন্ দেহান্ স্বজনান্ ভবনানি চ।
হিত্বাবৃণীত যদ্যূয়ং কৃষ্ণাখ্যং পুরুষং পরম্॥"

আপনারা সব ত্যাগ করিয়া পতিরূপে বরণ করিয়াছেন নরাকৃতি পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ নামক পরম দেবতাকে। একমাত্র আপনারাই ইহা করিয়াছেন। অবশ্য এ কথা ঠিক, জগতে যাঁরাই কৃষ্ণলাভ করিয়াছেন সকলেই সর্বস্ব ত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু অন্য সকলের ত্যাগ ও আপনাদের ত্যাগে পার্থক্য আছে। অন্য সকলের ত্যাগ বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত, আপনাদের ত্যাগ অনুরাগের উপর স্থাপিত। সর্ব্বস্ব ত্যাগ করা উচিত, এই বিচারপূর্বক লোকে ত্যাগ করে, কিন্তু আপনারা ত্যাগ করিয়াছেন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগের আবেগে। কিছু যে ত্যাগ

করিয়াছেন তাহা আপনারা জানেন না। অন্যেরা যে ত্যাগ করে তাহা তাহারা অবগত থাকে। অন্যেরা ত্যাগ করে আগে, তার ফলে পায় ভগবানকে। আপনারা ভালবাসিয়াছেন সর্ব্বাগ্রে পুরুষোত্তমকে—তার ফলে পাইয়াছেন তাঁহাকে, আর সেই পাওয়ার ফলে হইয়া গিয়াছে সর্বস্বত্যাগ। অন্যের ত্যাগ সাধ্য, আপনাদের ত্যাগ স্বতঃ। শ্রীকৃষ্ণে গাঢ় অভিনিবেশের ফলে আপনাদের অন্য অনুসন্ধানই নাই। ত্যজ্য কি, গ্রাহ্য কি, জগজ্জীব এই শিক্ষা পাইল যে, গভীর অনুরাগের আবেগে যে কিছুই জানেন না। আপনাদের এই প্রগাঢ় আবেশময় আচরণে শ্রীকৃষ্ণপ্রীতি ও কৃষ্ণ ভিন্ন আন-তৃষ্ণা ত্যাগ—ইহাই পরম পুরুষার্থ এবং সর্বসাধ্য-শিরোমণি।

সর্বস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পরিপূর্ণ যে প্রেমভাব তাহাই সর্বাত্মভাব বা মহাভাব। মহাভাবের সামর্থ্য এই যে, নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে পূর্ণতমভাবে অন্তরাকাশে আবির্ভূত করাইয়া রাখে। সেই মহাভাব আপনারা বশীভূত করিয়া নিজ অধিকারে রাখিয়াছেন। "সর্বাত্মভাবোঽধিকৃতো ভবতীনামধোক্ষজে।"

মহাভাব প্রেমের অষ্টম কক্ষার গাঢ়তম বিলাস। অর্থাৎ প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব, মহাভাব—এইরূপে ক্রমশঃ গাঢ়ত্ব প্রাপ্ত হইয়া মহাভাব—বৈকুণ্ঠেশ্বরী লক্ষ্মীদেবীর পক্ষেও অলভ্য। এই মহাভাবের মূর্ত্তিমতী বিগ্রহরূপা আপনারা। বস্তুতঃ আপনাদের কদাপি কৃষ্ণবিরহ হইতে পারে না। কারণ, প্রেমবশ শ্রীকৃষ্ণ কখনও আপনাদিগকে ছাড়িয়া দূরে থাকিতে সমর্থ নহেন। সুতরাং আপনারা মহাভাগ্যবতী। আপনাদের

এই যে কৃষ্ণবিরহ, ইহা একটা বহিরঙ্গ ব্যাপার মাত্র। অন্তরে আপনারা কৃষ্ণময়ই রহিয়াছেন। বাহিরের এই বিরহের প্রকাশের অন্য কোন কারণ আমি খুঁজিয়া পাই না, এইটিমাত্র ছাড়া। আমি অনেক ভাবিয়া বুঝিয়াছি যে, আপনাদের এই বিরহ কেবলমাত্র আমার মত জীবাধমকে অনুগ্রহ করিবার জন্য। "বিরহেণ মহাভাগা মহান্ মেঽনুগ্রহঃ কৃতঃ"

প্রেম একটি মহাশক্তিশালী বস্তু। ইহা শুনিয়াছি, বিশ্বাসও করিয়াছি, কিন্তু কদাপি প্রেমের এমন মহামহিমা চাক্ষুষ করি নাই। জগতে কেহ করিয়াছে বলিয়াও জানি না। যদি আপনাদের বিরহ না হইত তাহা হইলে পরম দেবতা শ্রীকৃষ্ণ আমাকে আপনাদের কাছে পাঠাইতেন না। আর এই ব্রজে আ সবার পরম সৌভাগ্যের উদয় না হইলে মহাভাব-সমুদ্রের এই আশ্চর্য্য রসতরঙ্গ দর্শন করিয়া কৃতকৃতার্থ হইতে পারিতাম না। এই ব্রজে আগমন ও মহাভাববতী আপনাদের দর্শন এবং বেদনার্ত্তিময় নিরুপম উক্তি শ্রবণ—ইহা আমি আমার পরমাতি-পরম সৌভাগ্যের পরাবধি মনে করি। আপনারা যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন—'এই নিরুপাধি প্রেমে বিরহ হইল কেন?' তাহার উত্তর এই যে, এই জীবাধম উদ্ধবকে অনুগ্রহ করিবার জন্য। উদ্ধবের অধন্য জীবন ধন্যতম করিবার জন্য।

শ্রীমান্ উদ্ধব এইভাবে ব্রজাঙ্গনাগণের মহাভাবের মহতী মহিমা কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। ইহাতে তাঁহারা বিন্দুমাত্র সুখী না হইয়া আরও বিমলিনা হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা মনে মনে বলিতে লাগিলেন "উদ্ধব, তুমি কেমন মানুষ হে? যে

বেদনাহত, তাহার গুণকীর্ত্তনে কি কখনও তার ব্যথার উপশম হইতে পারে? শ্যাম-বিরহে আমরা মরণের দুয়ারে দাঁড়াইয়া আছি। এই সময় তুমি কি না আমাদের ভাবের প্রশংসা গাহিতেছ। যাহাদের মত হতভাগিনী সারা বিশ্বে নাই তাদের ভাব-মহিমা গান করিতেছ। তুমি কি এই প্রশংসাবাক্য দ্বারা আমাদের সান্ত্বনা দিতে ব্রজে আসিয়াছ? তুমি কি জান না, নিদারুণ পিপাসায় যার বুক শুকাইয়া গিয়াছে—একমাত্র পানীয় বস্তু ভিন্ন আর কিছুতেই তার কষ্টের উপশম হইতে পারে না। প্রাণকোটী প্রিয় শ্রীকৃষ্ণধনের কোন সন্দেশ যদি আনিয়া থাক তাহাই বল। কালোচিত প্রশংসাবাক্যে আমাদের বিরহাগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিও না।"

গোপিকাদের অন্তরের কথা তাহাদের ভাবভঙ্গি ও মুখশ্রীতে ফুটিয়া উঠিতেছিল। দর্শন করিয়া উদ্ধব আপনার ভুল বুঝিলেন ও বলিলেন "আপনাদের প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের সন্দেশ শ্রবণ করুন" "শ্রূয়তাং প্রিয়সন্দেশঃ।" ব্রজাঙ্গনাগণ কহিলেন—"উদ্ধব, আমাদের সেই সন্দেশ শ্রবণের কোন প্রয়োজন নাই—যাহাতে সত্বর তাঁহাকে পাওয়া যায়" তাহাই বল। উদ্ধব বলিলেন—"পরম উৎকণ্ঠিতা আপনাদের নিকট এখনই সত্বর কৃষ্ণপ্রাপ্তির সংবাদপূর্ণ সুখাবহ সন্দেশ "ভবতীনাং সুখাবহঃ" পরিবেশন করিব, শ্রবণ করুন"। এই বলিয়া উদ্ধব ব্রজাঙ্গনাদিগকে শ্রীকৃষ্ণের সন্দেশ বলিতে আরম্ভ করিলেন।

———

॥ চব্বিশ ॥

'শ্রীভগবানুবাচ' বলিয়া কথার সূচনা করিলেন শ্রীমান্ উদ্ধব। অন্তরের আশয় এই যে, হে গোপরামাগণ, শ্রীকৃষ্ণের বার্ত্তা আমি নিবেদন করিব আপনাদের কাছে অবিকৃত অক্ষরেই। যাহা তিনি বলিয়াছিলেন ঠিক তাহাই বলিব "তত্তদক্ষরেণৈব।" যদি তাঁহার বাক্যের ভাব গ্রহণ করিতে পারিতাম, তাহা হইলে তাঁহার বাহনভাষাকে এক আধটু ওলট পালট বলিলেও চলিতে পারিত। কিন্তু ভাব গ্রহণে আমি সম্পূর্ণ অক্ষম যে বাণীর, তাহার অক্ষর বদলাইবার দুঃসাহস আমার নাই। আমি তাঁহার কথাগুলি বহন করিয়া আনিয়াছি বটে, কিন্তু পত্রবাহক যেমন পত্রের শিরোনামাই দেখে, আমিও সেইরূপ উপরটাই দেখিয়াছি, ভিতরে কি তাৎপর্য্য তাহা লেখক জানেন আর আপনারা হয়ত বুঝিবেন। "নাহং বিবেক্তুং শক্নোমি," কিন্তু ভবত্য এব বিচারয়ন্ত্বিতি—শ্রীসনাতন।

শ্রীকৃষ্ণের প্রথম বাণী—আপনাদের নিকট প্রেরিত প্রথম সন্দেশ এই—

"ভবতীনাং বিয়োগো মে ন হি সর্ব্বাত্মনা ক্বচিৎ।"

শ্রীহরির উক্তিটি অতি ছোট, মাত্র একটি কথা—"সর্ব্বাত্মক আমার সঙ্গে আপনাদের কোন বিরহ হইতে পারে না।" কিন্তু এই এতটুকু কথার তাৎপর্য্য অতি গভীর।

শ্রীমান্ উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণের সংবিৎ-শক্তির মূর্ত্তি—জ্ঞান-প্রধান। তিনি শ্রীকৃষ্ণের বাক্যকে জ্ঞানপর বুঝিয়াছেন। গোপিকাগণ

শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনীশক্তির মূর্ত্তি—প্রেম-প্রধান। তাঁহারা প্রাণদয়িতের বাণীকে রসপ্রাধান্যে গ্রহণ করিয়াছেন। বাণার প্রেরক স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ নিজে নিত্যকাল যে শক্তিতে নিত্যলীলায় স্থিত, সেই সচ্ছক্তি বা সন্ধিনী-প্রধান নিত্যলীলাপর অর্থে উহা প্রেরণ করিয়াছেন।

কথাটির তিন প্রকার অর্থ। যেটি শ্রীকৃষ্ণের অন্তরে সেটি সৎপ্রাধান্যে সন্ধিনীসেবিত। যে অর্থ উদ্ধব গ্রহণ করিয়াছেন সেটি চিৎপ্রাধান্যে সংবিৎসেবিত। যে অর্থ ব্রজরামাগণ গ্রহণ করিয়াছেন সেটি আনন্দপ্রাধান্যে হ্লাদিনীসেবিত। আমরা প্রথমে তিনটি অর্থেরই কিঞ্চিৎ অনুধ্যান করিব। পরে ব্রজাঙ্গ-নাগণের গৃহীত অর্থেরই অনুসরণ করিব। তিন প্রকার অর্থের আলোচনার প্রথমে উদ্ধবগৃহীত অর্থ, তৎপর গোপীভাবিত অর্থ ও তদনন্তর শ্রীকৃষ্ণপ্রেষিত অর্থের আস্বাদন করিব। শ্রীশুকের করুণা ছাড়া ইহার মধ্যে প্রবেশ করিবার উপায়ান্তর নাই।

শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, "সর্বাত্মক আমার সঙ্গে আপনাদের কোন বিয়োগ হইতে পারে না।" এই কথায় উদ্ধব বুঝিয়াছিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ সর্বাত্মা। উপাদানরূপে ও অন্তর্য্যামিরূপে তিনি নিখিল বিশ্বের সর্ববস্তুতে ও সর্বব্যক্তিতে অনুস্যূত আছেন। সুতরাং তিনি গোপীগণের মন প্রাণ বুদ্ধি ইন্দ্রিয় যাহা কিছু সকলের আশ্রয়রূপে চিরবিরাজমান আছেন। অতএব তাঁহার সহিত ইঁহাদের এক মুহূর্ত্তের জন্যও বিরহ হইতে পারে না। দৃষ্টান্ত দিয়া বলিয়াছেন, আকাশ যেমন পৃথিবীর প্রত্যেক অণু-পরমাণুতে অনুগতরূপে বিদ্যমান, তিনিও সেইরূপ সকলের

আত্মায় অনুপ্রবিষ্ট। আত্মার আত্মা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ সর্বাত্মক। সুতরাং তাঁহার সহিত কাহারও বিয়োগ হওয়ার সম্ভাবনা নাই। সর্বদাই সকল বস্তুর সঙ্গে তাঁহার যোগ রহিয়াছে। বিয়োগ যেখানে নাই, বিরহের সেখানে সম্ভাবনা কোথায়? উদ্ধব 'সর্ব' অর্থে বুঝিয়াছেন বিশ্বের যাহা কিছু, আত্মা-পদে বুঝিয়াছেন পরমাত্মা। উদ্ধব ঠিকই বুঝিয়াছেন। জ্ঞানবাদের মতে পরমাত্মার সহিত কাহারও বিরহ হইতে পারে না।

এইবার দেখিব গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের এ বাক্য কী অর্থে গ্রহণ করিলেন। 'ভবতীনাং বিয়োগো মে ন হি সর্বাত্মনা ক্বচিৎ।' আমার সহিত তোমাদের সর্বাত্মক বিয়োগ নাই। বিয়োগ যাহা আছে, তাহা আংশিক মাত্র। কারণ তোমাদের ভিতর বাহির সর্বত্র আমি নিরন্তর স্ফূর্ত্ত হইতেছি। কোন সময়ই তোমাদের মনোবৃত্তি আমাকে ছাড়িয়া থাকে না। আমি তোমাদের দূরে আছি শুধু দেহ দ্বারা। মন প্রাণ বুদ্ধি দ্বারা তোমাদের সঙ্গে যুক্তই রহিয়াছি। আবার দেহ দ্বারাও মাঝে মাঝে যুক্ত হই।

তোমরা যাহাকে স্ফূর্ত্তি মনে কর, তাহা বস্তুতঃ আমারই সাক্ষাৎকার। তোমরা যখন বিরহে মূর্চ্ছিত হইয়া পড় তখন আমি আসিয়া আলিঙ্গন ও আদরাদি দ্বারা তোমাদিগকে সুখ-সাগরে ডুবাইয়া দিয়া মূর্চ্ছাভঙ্গ করি। কিন্তু জাগ্রত হইয়া তোমরা আমার দর্শনকে স্বপ্ন বলিয়া মনে কর। বস্তুতঃ উহা স্বপ্ন নহে, আমারই আগমন। আকাশ যেমন সর্ব্বভূতে অনুস্যূত, আমি কৃষ্ণও সেইরূপ।

তোমাদের মন প্রাণ বুদ্ধি ইন্দ্রিয়, গুণসমূহ সকলই ত আমাময়। আকাশ যেমন বস্তুর ভিতরে ও বাহিরে, আমিও সেইরূপ তোমাদের ভিতরে বাহিরে সর্বদা ঘিরিয়া আছি। সুতরাং বিরহ কোথায়? গোপিনীরা 'সর্ব' পদে বুঝিয়াছেন অন্তর বাহির, আর 'আত্মা' পদে বুঝিয়াছেন দেহ। উদ্ধবের ভাবনায় সর্বাত্মনা শব্দ কৃষ্ণের বিশেষণ। গোপীদের ভাবনায় এই শব্দ বিয়োগের বিশেষণ। সর্বাত্মক আমার সঙ্গে তোমাদের বিরহ নাই। আর, আমার সঙ্গে তোমাদের সর্বাত্মক বিয়োগ নাই। আংশিক আছে।

শুধু এই দেহের সঙ্গে তোমাদের সাময়িক অমিলন। বিরহের মধ্যস্থতায় অন্তরে বাহিরে স্বপ্নে জাগরণে সুষুপ্তি অবস্থায় তোমাদের সঙ্গে মিলনই বিদ্যমান। বিরহের সামর্থই এইরূপ যে, প্রিয়কে জগন্ময় দর্শন করায় "ত্রিভুবনমপি তন্ময়ম্।" বিরহে মিলনানন্দ সম্ভোগকে গভীরভাবে আস্বাদন করাইবার গুরু একমাত্র বিরহ। প্রিয়তমকে বিরহে যেরূপ গভীরভাবে আস্বাদন করা যায় মিলনে তাহা হয় না। মিলন সর্বদাই ভঙ্গের আশঙ্কায় চাঞ্চল্যের আবরণে আবৃত থাকে। বিরহ সততই ভঙ্গ-আশঙ্কা-আবরণ-মুক্ত ও স্বচ্ছন্দভোগালোকে সমুজ্জ্বল।

সম্ভোগে ভোগ হয়। বিপ্রলম্ভে ভোগ বর্দ্ধন হয়। 'বি' অর্থ বিশেষভাবে ভোগ। আর 'রহ' অর্থ নিত্য স্থিতি। তাই শ্রীকৃষ্ণ গোপিকাদের বলিয়াছেন—তোমাদের সঙ্গে আমার বিয়োগ নাই। মাধ্যমে অন্তরে বাহিরে স্বপ্নে জাগরণে মিলনই বিদ্যমান রহিয়াছে।

হ্লাদিনী-শক্তি ব্রজাঙ্গনাগণ স্বকীয় প্রেমানুভব-সিদ্ধ রসপ্রধান এই অর্থকে গ্রহণ করিয়াছেন।

এইবার শ্রীকৃষ্ণ নিজে কী অর্থে এই কথা বলিয়াছেন তাহা আলোচনা করা যাইতেছে। তিনি বলিয়াছেন—হে গোপ-রামাগণ! তোমাদের সহিত আমার বিয়োগ সর্ব্বতোভাবে নাই। শুধু এই প্রপঞ্চে প্রকট প্রকাশে আমাদের বিরহ। অপ্রকট প্রকাশে নিত্যলীলায় নিত্যমিলন রহিয়াছে নিত্যকালে। আকাশ যেমন বস্তুর মধ্যে লুকাইয়া আছে, আমিও সেইরূপ যেখানে তোমরা আমার বিরহে কান্দিতেছ সেইখানেই তোমাদের সঙ্গে অপ্রকট লীলাবিলাসে সর্বদা বিভোর আছি। নিত্যবৃন্দাবনে আমি নিত্যকাল নিত্যমিলনে স্থিত। তোমাদের সঙ্গে বিরহ কেবল এই ভৌম-বৃন্দাবনে। কী রূপে আমি নিত্যলীলায় আছি তাহাও বলিতেছি শোন। তোমাদের মন প্রাণ বুদ্ধি ইন্দ্রিয় ও গুণসমূহের একান্ত আশ্রয়—"গোপবেশ বেণুকর নবকিশোর নটবর" রূপেই আছি। অর্থাৎ তোমরা আমার যে বেণুবিলাসী শ্যামসুন্দর রূপটি ভালবাস, অপ্রকট প্রকাশে আমি নিত্য সেই রূপেই তোমাদের সঙ্গে বিলাস করিতেছি। "ভবতীনাং মন আত্মাশ্রয়াকারঃ শ্যামসুন্দরো বেণুবিলাসিরূপ এব সন্—শ্রীসনাতন।"

সুতরাং সর্ব্বাত্মায় বিরহ নাই। সর্বপদে প্রকট ও অপ্রকট। আত্মাপদে প্রযত্ন। প্রকট অপ্রকট উভয় অবস্থাতে তোমাদের সঙ্গে আমার বিরহ নাই। অপ্রকট নিত্যবিহারে নিত্য যোগ নিত্যকালই বিরাজমান আছে। সর্ব্বাত্মক শব্দ কৃষ্ণের সহিত

অন্বয় হইলে হইবে প্রেমানুভবসিদ্ধ অর্থ। ঐ শব্দ "নাই" ক্রিয়ার সহিত অন্বয়ে উপস্থিত হইবে নিত্যলীলাপর অর্থ।

অতঃপর শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠোক্ত আরও কতিপয় শ্লোক উদ্ধব মহাশয় উচ্চারণ করিয়াছেন। প্রত্যেক কথারই ঐরূপ তিন প্রকারের অর্থ। আমরা অনন্তর হ্লাদিনী শক্তিরূপিণী ব্রজবালারা যে অর্থ অনুভব করিয়া গ্রহণ করিয়াছেন তাহাই অনুসরণ করিব।

প্রাণদয়িতের বাণী শুনিয়া গোপীগণ বলিতেছেন, সত্যই তুমি আমাদের মনপ্রাণে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হও, কিন্তু যেমন করিয়া আমাদের কাছে স্ফূর্ত্তি হও, তেমন করিয়া তোমার কাছে আমরা ত স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হই না "সত্যমস্মাসু তথৈব ত্বং স্ফুরসি ত্বয়ি তু ন বয়ম্—শ্রীসনাতন।" তুমি যেমন আমাদের বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়কে আশ্রয় করিয়া সতত প্রকাশিত হও সেইরূপ তোমার মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয়ের আশ্রয়রূপে কি আমরা প্রকাশিত হই?

আরও একটি কথা আছে—মিলন বলিতে আমরা স্ফূর্ত্তি স্বপ্ন, স্বাপ্নিক অবস্থা ব্যতিরিক্ত অন্য অবস্থার মিলনকেই বুঝিয়া থাকি। স্বপ্নে দর্শন আমরা বিয়োগই বলিব। ইহার উত্তরে বলিতেছেন, হে ব্রজাঙ্গনাগণ, দেহটি লইয়া আমি তোমাদের নিকট হইতে দূরে মথুরায় আসিয়াছি বটে কিন্তু এখানে থাকিয়াও আমি নিজ আত্মাতে আত্মা, অর্থাৎ, মন দ্বারা তোমাদের সংযোগ-বিলাস সৃজন করি। কেবল সৃজন করি না, সম্যক্‌রূপে বাড়াই "সংবর্দ্ধয়ামি", লীলাকে ভাবনা দ্বারা পুষ্ট করিয়া ভোগ করি। তারপর বিলাসানন্তর আস্বাদনের জন্য সেটি ত্যাগ করিয়া আবার নবীন সংকল্প সৃষ্টি করি।

যদি তোমরা বল—কেমন করিয়া মন দ্বারা বিলাস সৃষ্টি করি, তাহা বলি শুন—আমার প্রতি তোমাদের যে অসীম মায়া অর্থাৎ কৃপা আছে তাহার প্রভাবে আমার মনোবুদ্ধি গুণসকল তোমাদের ভাবে ভাবিত হইয়া থাকে। তোমাদের ভাবভাবিত চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয় দ্বারা তোমাদের রূপ সাক্ষাৎকার করি। নাসিকায় তোমাদের অঙ্গ-গন্ধ পাই, ত্বকে স্পর্শ লাভ করি, সর্ব্বদেহে আলিঙ্গনাদি ভোগ করিয়া আনন্দরস-সাগরে ডুবিয়া থাকি। অতএব তোমরা যেমন নিরন্তর আমার রূপাদি অনুভব করিতেছ, আমিও তেমনি তোমাদের রূপাদি অনুভব করিতেছি, "ধ্যানেন প্রাপ্নোমি।" তোমাদের মহাভাববাসিত মনপ্রাণ তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত, সেইরূপ আমার ইন্দ্রিয়বর্গ তোমাদের সহিত মহাভাবে তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত। অতএব বাহিরে যে বিরহ ইহার উপর বেশী ভাবনা রাখিবে না। "কিমনয়া বহির্যোগদুঃখময়ভাবনয়েতি। —শ্রীসনাতন।"

গোপীগণ বলিলেন সত্যসত্যই প্রাণবল্লভ তোমার স্ফূর্ত্তি সাক্ষাৎকারের মতই মনে হয় আমাদের কাছে, কিন্তু সকল সময় তো সেটি হয় না। যখনই চক্ষু বুজিয়া থাকি তখন স্ফূর্ত্তি হয়, যখন চক্ষু খুলিয়া বাহিরে দৃষ্টি করি তখনই আবার বিয়োগ বেদনায় অবসন্ন হইয়া পড়ি। এই বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার উপায় কিছু আছে কি? এইরূপ জিজ্ঞাসার উত্তর দিতেছেন শ্যামসুন্দর

আমি আবির্ভূত হইয়া দর্শন-স্পর্শন আলিঙ্গনাদি বিলাস করিয়া থাকি তোমাদের সঙ্গে। সেই সময় তোমরা যাও আনন্দে

মূর্চ্ছিত হইয়া। পরে মূর্চ্ছা ভাঙ্গিলে উত্থিত হইয়া সকল ঘটনাকে তোমরা স্বপ্ন বলিয়া মনে ভাব। "ধ্যায়েত মৃষা স্বপ্নবদুত্থিতঃ" তোমাদের যে মন আমার সত্য মিলনকে স্বপ্ন বলিয়া ভাবনা করায় সেই মনকে নিরোধ করিতে পারিলেই "তন্নিরুন্ধ্যাৎ ইন্দ্রিয়াণি" ঐ বিরহবেদনা বিদূরিত হইতে পারে। জ্ঞানীরা বলেন, মনকে নিরোধ করিতে পারিলেই জীব ভবসিন্ধু—আমার বিরহসিন্ধু উত্তীর্ণ হইতে পারিবে।

———

॥ পঁচিশ ॥

গোপীগণ বিরহের তাপে দগ্ধীভূত হইতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ বক্তৃতা দ্বারা বলিতেছেন, তোমাদের সঙ্গে আমার বিয়োগ নাই। বিচার অপেক্ষা অনুভবের মূল্য সহস্রগুণ অধিক। অন্তরভরা বিরহ-বেদনার অনুভূতি, এই সময় বিচারমূলক ভাষায় বুঝাইয়া দেওয়া হইল—বিয়োগ কোথাও নাই। এই বিচারমূলক ভাষায় প্রাণ সিক্ত হয় না।

বিরহে স্ফূর্ত্তিতে সাক্ষাৎকার বলিয়া মনে হয়। তাহা হউক, তাই বলিয়া বিরহ নাই এ কথা কী বলা চলে! হে জীবিত-বল্লভ! তুমি দূরে আছ ঠিকই আছ দূরে। এই জন্যই বেদনা। কেন দূরে আছ, কবে আসিবে, ইহাই মাত্র আমরা জানিতে চাহি। ইহারই উত্তর বলিতেছেন—

যস্ত্বহং ভবতীনাং বৈ দূরে বর্ত্তে প্রিয়ো দৃশাং মনসঃ সন্নিকর্ষার্থং মদনুধ্যানকাম্যয়া।

আমি দূরে আছি। সত্যই দূরে আছি। কেন আছি তাই বলি। কংসকে বধ করা, বসুদেব, দেবকী, উগ্রসেনকে মুক্তি দেওয়া—ইহা ছিল অবশ্য কর্ত্তব্য। এই কর্ত্তব্যবোধ ব্রজ হইতে মথুরায় আনিয়াছে আমাকে। কংস বধের পর অনেকগুলি দায়িত্ব আসিয়াছে, তথাপি ঐগুলি পরিত্যাগ করিয়া কিছুদিনের জন্য যে ব্রজে যাইতে পারি না, তাহা নহে। তবু যে তোমাদের নয়নপথ হইতে দূরে রহিয়াছি ইহার কারণ, আমার এইটি স্বভাব। এই স্বভাবটি হইল স্বজন-প্রেমবিবর্দ্ধন-পরায়ণতা। প্রেম বাড়ান স্বভাবটি আমাকেও দুঃখ দেয়, আমার নিজজনদেরও দুঃখ দেয়। এই দৈহিক বিরহের ইহাই কারণ।

মথুরায় আছি মাত্র। চিত্তে যে সুখ আছে তাহা নহে। "কেবলং বর্ত্তে ন তু সুখেনাস্মীতি।" ব্রজে থাকাকালে তোমরা যখন তোমাদের নির্ম্মল দেহ মন আমাকে অর্পণ করিতে, তখন আমার সুখ হইত অসীম, আবার লজ্জাও হইত ভীষণ "চেতসি সদৈব লজ্জাজায়ত ইতি।" কেন না, তোমাদের দেহ মনে স্বসুখ-বাঞ্ছা নাই বিন্দুমাত্র। আমার দেহে তাহা রহিয়াছে পূর্ণমাত্রাতেই। তোমাদের দেহ মন আমাতে একনিষ্ঠ, আমার দেহ মন তোমাদের বহুজনে বহুনিষ্ঠ। তোমাদের প্রীতি অব্যভিচারী, আমার প্রীতি ব্যভিচারী। সুতরাং মিলনকালে তোমাদের দিকে দৃষ্টি করিলে আমার হইত তীব্র লজ্জার উদয়। আমার অদর্শনে তোমাদের প্রতিটি ক্ষণ শতযুগতুল্য মনে হয়।

উহা প্রত্যক্ষ দেখিয়া আমার মনে লালসা জাগিত, ঐরূপ আকুলতামাখা গাঢ় আবেগপূর্ণ অনুরাগ তোমাদের প্রতি আমার কিভাবে লাভ হইতে পারে।

বৃন্দাবনে অবস্থানকালে ঐরূপ ধ্যানের সুযোগ সুবিধা আমার কিছুতেই হইত না। তোমাদের সঙ্গে যখন মিলন হইত তখন থাকিতাম মিলনানন্দে। যখন বিরহ হইত তখন থাকিতাম সখাগণের বা জননীগণের সখ্য-বাৎসল্যরস-সাগরে ডুবিয়া। সুতরাং তোমাদের ধ্যান করিবার সময়ও হইত না, স্থানও পাইতাম না।

এখন আমি দেহ লইয়া দূর দেশে আসিয়াছি মথুরায়। এখন প্রচুর সময় ও স্থান মিলিয়াছে তোমাদের ধ্যান করিবার।

"মনসঃ সন্নিকর্ষার্থং মদনুধ্যানকাম্যয়া" ; মদনুধ্যান—মৎ-কর্তৃকং যদনুধ্যানং তৎকাম্যয়া হ্নদ্ধেতোরেব।

তোমাদের প্রতি আমার প্রেম-বৃদ্ধি-কামনাতেই মথুরায় রহিয়াছি। দেহের নিকটবর্ত্তিতা না থাকায় মনের সন্নিকর্ষ লাভ হইতেছে "দৃকসমীপবর্ত্তিত্বং, মনোদূরর্ত্তিত্ত্বং মনঃসমীপবর্ত্তিত্বে দৃগদূরবর্ত্তিত্বং আসক্তিবিষয়ীভূতস্য বস্তুনো ভবতি—শ্রীবিশ্বনাথ।" মথুরায় তোমাদের নিরন্তর অনুধ্যানের কামনা পূর্ণ হইতেছি। মথুরাবাসী ভক্তেরাও আমায় ভালবাসে; কিন্তু তাহাদের ভালবাসায় ঐশ্বর্য্য মিশ্রিত থাকায় আমার মনের পূর্ণ আবেগ নাই। সুতরাং অনাসক্ত মন লইয়া তোমাদের ধ্যানের সুবিধা হইতেছে।

পণ্ডিতেরা বলেন—বিরহ বিনা সম্ভোগরস পুষ্টি লাভ করে না।

"ন বিনা বিপ্রলম্ভেন সম্ভোগঃ পুষ্টিমশ্নুতে।"

যখন প্রিয়ের নিকটে থাকা যায়, তখন চক্ষুকর্ণাদির সহিত তাহার রূপ ও শব্দাদির সান্নিধ্য ঘটে বটে, কিন্তু মনের সান্নিধ্য ঘটে না। রূপের নিকট চক্ষু থাকে, কিন্তু মন থাকে চক্ষুর আড়ালে। সুতরাং রূপের সঙ্গে চক্ষুরই সাক্ষাৎ সম্বন্ধ ঘটে, মনের ঘটে পরোক্ষ সম্বন্ধ। পক্ষান্তরে প্রিয় যখন দূরে থাকে তখন চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণের বিরহ ঘটে। মনের সহিত রূপাদির খুব নিকট প্রগাঢ় সম্বন্ধ ঘটে। এই জন্য "মনসঃ সন্নিকর্ষার্থম" আমি নিজে ইচ্ছাপূর্ব্বক তোমাদের সান্নিধ্য ছাড়িয়া মথুরায় রহিয়াছি। এইস্থানে অবিরাম তোমাদের ধ্যান-সাধনায় আবিষ্ট রহিয়াছি। মদনুধ্যানকাম্যয়া—আমাকর্ত্তৃক তোমাদের অনুধ্যানের নিগূঢ় কামনাই মথুরায় সার্থকতা লাভ করিতেছে।

এই কথার উত্তরে গোপিকারা বলিতে পারেন—আমাদের প্রতি তোমার অনুরাগ বর্দ্ধিত হইতেছে ইহাতে আমাদের কি লাভ? "ভবতু নাম ভবতো ভাবসিদ্ধিস্তত্রাস্মাকং কিম্।" আমরা তোমার ভালবাসা কামনা করিয়া তোমাকে ভালবাসি না। তোমাকে প্রীতি করিয়াই আমরা সুখী, তাহার বিনিময়ে আমরা প্রীতি কুত্রাপি কামনা করি না। সুতরাং আমাদের প্রতি তোমার অনুরাগ বিবর্দ্ধিত হইলে আমাদের লাভ নাই। অতএব তোমার বিরহ-দুঃখে যে আমরা দগ্ধীভূত হইতেছি ইহার কোনও

প্রতিকারমূলক নির্দ্দেশ তোমার এত কথার মধ্যেও পাওয়া গেল না।

এইরূপ উত্তরের আশঙ্কায় শ্যামসুন্দর বলিতেছেন—

"যথা দূরচরে প্রেষ্ঠে মন আবিশ্য বর্ত্ততে।
স্ত্রীণাঞ্চ ন তথা চিত্তঃ সন্নিকৃষ্টেঽক্ষিগোচরে॥"

এই বিরহ দ্বারা তোমাদেরও আমার প্রতি প্রেমের আধিক্য ঘটিবে। প্রিয়জন দূরে থাকিলে নারীগণের মন যেমন তাহাতে আবিষ্ট হয়, চক্ষুর গোচর হইলে তাদৃশ হয় না। জাগতিক সাধারণ রমণী সম্বন্ধেই যখন এই কথা তখন তোমাদের মত মহাভাবময়ীদের সম্বন্ধে যে উহা কত গভীর সত্য তাহা আর বলিবার নহে "স্ত্রীণামন্যাসামপি কিমুত ভবতীনাম্।" সুতরাং পরস্পরের প্রেমবিবর্দ্ধনপরায়ণতারূপ আমার যে অত্যাগ্রহবিশিষ্ট স্বভাব, উহাই এই তীব্র বিরহের মূলীভূত হেতু। এই স্বভাবটি তোমরা সহ্য করিয়া আমাকে ক্ষমা করিবে। "মিথঃ প্রেম-বিবর্দ্ধনাভিলাষজো দুর্নিগ্রহোঽয়ং মম দুরাগ্রহো ভবতীভিঃ ক্ষন্তব্য ইতি ভাব—শ্রীসনাতন।"

গোপীগণ যদি বলেন— ক্ষমা চাহিয়া ক্ষতস্থানে ক্ষার নিক্ষেপ করিয়া কী ফল! কি করিলে আমাদের এই বিরহবেদনা দূর হইবে তাহাই বল শুনি। এই কথার উত্তর দিতেছেন—

"ময্যাবেশ্য মনঃ কৃষ্ণে বিমুক্তাশেষবৃত্তি যৎ।
অনুস্মরন্ত্যো মাং নিত্যমচিরান্মামুপৈষ্যথ॥"

প্রেম বৃদ্ধি করিবার আমার যে অত্যাগ্রহ তাহা দূর হইতে পারে তোমাদের আমাকে পাইবার আগ্রহের প্রবলতায়।

গোপীগণের আগ্রহের প্রবলতা আর কিভাবে প্রকটিত হইতে পারে তাহাই বলিতেছেন—

তোমরা তোমাদের মনকে অশেষ বিষয়বৃত্তি হইতে নিরুদ্ধ করিয়া আমাতে নিবিষ্ট করতঃ নিরন্তর আমায় স্মরণ কর, অচিরেই আমাকে প্রাপ্ত হইবে। আমাতেই, আমার নিত্য রূপেতেই চিত্ত নিবিষ্ট করিবে। আমার এই তমাল-শ্যামলকান্তি ব্রজসুন্দর যশোদানন্দন স্বরূপেতেই চিত্ত নিবেশ করিবে। আমা ভিন্ন চিত্তের আর যত শত প্রকার বৃত্তি আছে সকলই দূর করিয়া দিবে চিরতরে।

এই বিষয়ে আমার কোন স্বাধীনতা নাই "নতু মমাত্র স্বাতন্ত্র্যমিতি ভাবঃ।" এইরূপভাবে নিবিষ্টচিত্তে আমার নিত্যরূপ ধ্যানের এমনই অপরিসীম প্রভাব যে, ধ্যানকারীর সন্নিধানে আমার না যাইয়া উপায় থাকে না। আমাতে আবিষ্ট ভক্তের অনুরাগময় ধ্যান বলপূর্ব্বক টানিয়া লয় আমাকে তৎসন্নিধানে। এবার তোমরা যখন আমাকে পাইবে তখন নিত্যকালের মত পাইবে। আর আমি প্রেম-বর্দ্ধনের অত্যাগ্রহে তোমাদের নিকট হইতে আমার দেহ সরাইয়া লইব না।

সুতীব্রভাবে অনন্যমনে আমাকে ধ্যান করিলে যে আমাকে পাওয়া যায় সে বিষয়ে এক প্রমাণ তোমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি—

"যা ময়া ক্রীড়তা রাত্র্যাং বনেঽস্মিন্ ব্রজ আস্থিতাঃ।
অলব্ধরাসাঃ কল্যাণো মাপুর্ম্মদ্বীর্য্যচিন্তয়া॥"

সেই রাস-রজনীতে মুরলী বাদন করিয়া তোমাদিগকে

ডাকিয়াছিলাম, তাহা নিশ্চয়ই স্মরণ আছে। ঐ দিন তোমরা সকলে ছুটিয়া আসিলে, কিন্তু গৃহে অবরুদ্ধ হইয়া যাহারা আসিতে পারিল না, তাহাদের কী গতি লাভ হইয়াছিল তাহা জান ত?

বাধা পাওয়ায় তাহাদের মদ্বিষয়ক ধ্যান হইয়া উঠিল গভীরতর। ধ্যান-প্রভাবে তাহাদের গুণময় দেহবন্ধন টুটিয়া গেল। গুণাতীত দেহে তাহারা আমার অপ্রকট প্রকাশ শ্রীবৃন্দাবনে আমাকেই লাভ করিল, আমার নিবিড় আশ্লেষ লাভে তাহারা পরম আনন্দসিন্ধুনীরে নিমজ্জিত হইল।

শুন কল্যাণিগণ! গৃহাবরুদ্ধা সেই গোপীগণ তাহাদের গুণময় দেহ ত্যাগ করিয়া আমাকে পাইয়াছিল—তোমরা এই দেহেই আমাকে পাইবে। কারণ তোমাদের দেহ গুণাতীত চিদ্‌ঘন মহাভাবময়। তাহারা অপ্রকট-প্রকাশে ব্রজে আমায় পাইয়াছিল। তোমরা প্রকট-প্রকাশ এই বৃন্দাবনেই সাক্ষাৎ-ভাবেই আমাকে লাভ করিবে 'কল্যাণ্য ইতি সম্বোধ্য ভবত্যস্তু সাক্ষাদেব প্রাপ্স্যান্তি নতু জহুর্গুণময়ং দেহমিতি রীত্যেতি ব্যঞ্জিতম্।"

———

॥ ছাব্বিশ ॥

শ্রীমান্ উদ্ধবের মুখে প্রিয়তমের পরম সন্দেশ পাইলেন ব্রজাঙ্গনাগণ। ইহাতে তাঁহাদের মর্ম্মান্তিক বেদনা-সরসীর বক্ষঃস্থলে যেন প্রীতিরসের পদ্ম ফুটিয়া উঠিল। প্রিয়ের বাক্যে তাঁহাদের মানসে জাগিয়া উঠিল অতীত দিনের কতকগুলি মধুর স্মৃতি "তং সন্দেশাগতস্মৃতীঃ।"

মনে পড়িল রাস-রজনীর কথা। সেদিন যাহারা রাসে যাইতে পারে নাই, তাহাদের কথা। যাহারা গৃহমধ্যে অবরুদ্ধা হইয়া তীব্র বিরহের তাপে দগ্ধীভূত হইয়াছিল তাহাদের কথা। তাহারা গৃহে থাকিয়াই কৃষ্ণালিঙ্গন লাভ করিয়াছিল ধ্যানযোগে। তাহার ফলে মুক্তিলাভ করিয়াছিল তাহারা গুণময় দেহবন্ধন হইতে। গুণাতীত দেহে সেই দিন তাহারা শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিয়াছিল—মনে পড়িল তাহাদের সেই দিনের কথা।

ধ্যানেও লাভ হয় এবং সে লাভ সার্থক লাভ। এই বিশ্বাস জাগিল তাহাদের অন্তরে। বিরহ অবস্থাতে প্রেমকৃত যে প্রিয় সাক্ষাৎকার তাহা ভ্রান্তি নহে, স্ফূর্ত্তি-মাত্র নহে, প্রকৃতই প্রাপ্তি—প্রিয়ের কথায় বিশ্বাস জন্মিল তাহাদের এই কথায়। এক সখী অপর সখীকে কহিতে লাগিল, অনেক অতীত দিনের কাহিনী, নিজ নিজ স্মৃতিসমুদ্র মন্থন করিয়া।

"সখি, সে দিন সম্বিৎহারা ছিলাম যখন, প্রবল মূর্চ্ছায় মনে হইল প্রাণনাথ আসিয়াছেন। সেই হাসি, সেই চাহনী, সেই

স্নিগ্ধ স্পর্শ, সেই আদর-যত্ন। অঙ্গে অঙ্গ দিয়া সেই বিলাস-বিচিত্রতা। ডুবিয়া গেলাম সুখের সায়রে। মূর্চ্ছা যখন ভাঙ্গিল, মনে হইল স্বপ্ন দেখিয়াছি স্পর্শের সুখানুভূতি, অঙ্গের মনমাতান গন্ধ, বিলাসভোগের চিহ্নাদি সবই ছিল সুদীপ্ত, তবু মনে করিলাম স্বপ্ন। আজ বুঝিলাম, প্রিয়ের প্রেরিত প্রিয় বাণীতে, উহা স্বপ্ন নয়, সত্যই তিনি আসেন।"

ব্রজাঙ্গনাগণের অন্তরে আনন্দের পুলক আনিয়াছে, প্রিয়ের কথার মধ্যে দুইটি বিশেষ কথা। প্রিয়তম ইচ্ছা করিলে আসিতে পারেন, আসেন না আমাদের ধ্যান যাহাতে প্রগাঢ় হয় সেই জন্য। ধ্যানাবেশ গাঢ় হইলেই প্রাণদয়িতকে পাওয়া যাইবে। গোপীগণের অন্তরের তীব্র বিচ্ছেদ—দুঃখের শুষ্ক-মরুভূমির মধ্যে ঐ কথা দুইটি যেন পান্থপাদপের স্নিগ্ধ ধারা।

সকলে মিলিয়া উদ্ধবকে বলিলেন—শুন উদ্ধব, আমাদিগকে ভুল বুঝিও না। এই বিরহের দুঃখের মধ্যে তাঁহাকে পাইলেই আমরা সুখী হইব এই কথাই ঠিক নহে, তাঁহাকে পাইয়া আমরা সুখী হইব ইহা অপেক্ষা কোটীগুণ মুল্যবান সংবাদ আমাদের কাছে—তিনি সুখে আছেন। নিজ সুখার্থে আমরা বিন্দুমাত্র আকুল নহি। তাঁহার চিরসুখেই আমাদের মহামঙ্গল। এই কথা বলিয়া তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ-সুখের অভিনন্দন করিতে লাগিলেন। বলিলেন, "উদ্ধব, বড় সুখের কথা, দুরাত্মা কংস মরিয়া গিয়াছে "দিষ্ট্যাঽহিতো হতঃ কংসঃ।" যাদবেরা সাধুগণের শিরোমণি। তাহাদের উপর দুর্বৃত্ত কংস কী অত্যাচারটাই না করিয়াছে। যে ব্যক্তি দ্রোহ করে সজ্জনের সে স্বকৃত খাদেই ডুবিয়া

মরে। কংসও নিজের পাপেই শেষ হইয়াছে, কৃষ্ণ উপলক্ষ মাত্র।

আরও সুখের কথা, যারা কংসের অত্যাচারে অত্যাচারিত তারা পলায়ন করিয়াছিল দেশ বিদেশে, আবার কংস বধের সংবাদে ফিরিয়া আসিয়াছে তাহারা সকলে। আসিয়া পরিত্যক্ত সম্পদ যার যা ছিল সবই পুনরায় লাভ করিল "দিষ্ট্যাস্তৈর্লব্ধ-সর্ব্বার্থৈঃ"। এখন আর আত্মীয়-স্বজনদের স্বচ্ছন্দতা বিধানের জন্য কৃষ্ণের উদ্বেগ নাই। নিজে অত্যন্ত কুশলী বলিয়াই অত্যল্পকালমধ্যে রাজ্যকে সর্ব্বসুখপূর্ণ ও শান্তিময় করিয়া তুলিয়াছেন।

যখন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র আমাদের সঙ্গে এই ব্রজে ছিলেন, তখনও কত উদ্বেগ পাইয়াছেন, কংসপ্রেরিত দৈত্যগণের দৌরাত্ম্যে। এখন সে ভয়ও গেল। এই ভগবানই আমাদের পরম সুখদ।

মথুরা হইতে ফিরিবার কালে নন্দবাবাকে বলিয়াছিলেন নন্দনন্দন, "জ্ঞাতীন্ বো দ্রষ্টুমেষ্যামঃ বিধায় সুহৃদাং সুখম্" (১০।৪৫।২৩)—"পিতঃ! সুহৃদ্ যাদবগণের সুখ সম্পাদন করিয়া আপনাদিগকে দেখিতে যাইব।" এই সংবাদে বোঝা গিয়াছে যে সুহৃদ্‌গণের সুখবিধান তখন শ্রীকৃষ্ণের একটি বিশেষ-ভাবে চিন্তার বিষয় হইয়া রহিয়াছে। ঐরূপ উদ্বেগজনক চিন্তায় তিনি কদাপি অভ্যস্ত নয়। তাই আমাদের অন্তরে কত ভয় হইতেছিল। এখন নারায়ণের অনুগ্রহে সকল চিন্তার হস্ত হইতে তিনি অব্যাহতি পাইয়াছেন।

আমাদিগকেও বলিয়াছিলেন তিনি ব্রজ হইতে যাইবার সময়।

মথুরার রাজা কংসকে বধ করিয়া আমি শীঘ্রই আসিব "আয়াস্যা-ম্যাশু হত্বা তমধিমধুপুরম্"। আমি বৎসাসুর, অঘাসুর বধ করিয়াছি, কংস বধ আমার পক্ষে খুব কঠিন কার্য্য নয়।

এই কথা শুনিয়া আমরা বলিয়াছিলাম, হে প্রিয়তম, সেই দেশে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিবে তুমি কংসরাজকে বধ করিয়া। আর তখন কোন সম্ভাবনাই থাকিবে না এই গরু চরাইবার মাঠে ফিরিয়া আসিবার।

—দয়িত ভোঃ কংসবধং বিধায়

স্বীকর্ত্তুং রাজতাং তৎ কথমথ ভবতাদাগতিস্তে ব্রজায়।
তদপেক্ষা একটি কাজ করিও আমাদের জন্য তুমি।

অনেক তীর্থ আছে মথুরায়। সেই সব তীর্থে তিন অঞ্জলি জল দিয়া তর্পণ করিও, গতপ্রাণা ব্রজাঙ্গনাদের কথা মনে স্মরণ করিয়া।

"তীর্থে সর্বার্থদে নঃ স্মৃতিমনুদদতামঞ্জলীনাং ত্রয়াণি।"

এই কথার উত্তরে শ্যামসুন্দর বলিয়াছিলেন, আমার অন্তরে রাজ্যলিপ্সা নাই একটি বিন্দুও। কংসকে বধ করিব, যদুগণের সুখ সম্পাদন করিব, তারপর এই বৃন্দাবনে ফিরিয়া আসিব—নিশ্চয় আসিব, যেন আসিয়াছি এইরূপ বিশ্বাস কর "কংস হত্বা যদূনাং সুখমাভবলয়ন্নস্মি চায়াতকল্পঃ।" তখনও যদুবীর যদুগণের সুখ সম্পাদনের কথা বলিয়াছিলেন। এখন তাহাদের সুব্যবস্থা হইয়া গিয়াছে, তিনি এখন নিশ্চিন্ত, নিরুদ্বিগ্ন, এই চিন্তাই আমাদের পক্ষে পরম সুখের আকর। তাঁহাকে দুঃখ দিয়া যে সুখ তাহা অন্য কেহ চাহিতে পারে, আমরা কখনও চাহি না।

এই সকল কথা বলিতে বলিতে শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক বিলাসবিশেষের কথা গোপীগণের অন্তরে জাগিয়া উঠিল। এক গোপী বলিলেন—উদ্ধব, তোমাদের গদাগ্রজ সরস-দৃষ্টি-কুসুমে মধু নাগরীগণের অর্চ্চনায় কৃতকার্য্যতা লাভ করিতেছেন তো? কী পরিতাপ! ব্রজে যিনি অর্চ্চিত হইতেন, মথুরায় তিনি অর্চ্চক হইয়াছেন!

"ক্বচিদ্‌গদাগ্রজঃ সৌম্য! করোতি পুরযোষিতাম্।
প্রীতিং নঃ স্নিগ্ধসব্রীড়-হাসোদারেক্ষণার্চ্চিতঃ॥"

ভাঃ ১০।৪৭।৪০

যদি বল ওহে সৌম্য উদ্ধব, ব্রজে তাঁহাকে কে অর্চ্চনা করিত? আমরাই করিতাম। নিত্য করিতাম। পুষ্প চন্দনে লৌকিক পূজা নয়। স্নিগ্ধ হাস্যে ও উদার চাহনীতে রসের পূজা করিতাম। আমাদের নিত্য পূজিত ঠাকুর এখন রাজধানীতে গিয়া পূজক ঠাকুর হইয়াছেন। এ সম্বন্ধে আমাদের প্রবল দুর্ভাগ্যকেই একমাত্র দায়ী করিব।

অপর এক ব্রজবধূ বলিলেন, নিজ সখীকে সম্বোধন করিয়া অয়ি মুগ্ধে! তুমি বড় অল্পবুদ্ধি। কী জিজ্ঞাসা করিতেছ? নাগররাজ মধুনাগরীর পূজায় কৃতকার্য্য হইয়াছেন কি না—এ প্রশ্ন নিরর্থক। তিনি যে ঐ অভিনয়ে সম্পূর্ণ কৃতকর্ম্মা এ বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ কি এখনও আছে?

তিনি যে প্রীতিস্থাপনবিদ্যায় সুপণ্ডিত "রতিবিশেষজ্ঞঃ"। সুতরাং স্বভাবতঃই পুরনারীগণের প্রিয়পাত্র হইয়াছেন "পুরযোষিতাং প্রিয়শ্চ"। অতএব তাহারা পরস্পর পরস্পরকে

রাগবিলাসভঙ্গী ও বিভ্রম দ্বারা পূজা প্রতি-পূজা করেন "তদ্বাক্যৈ-র্বিভ্রমৈশ্চানুভাজিতঃ"। ইহা নিশ্চয়ই করেন, এ সম্বন্ধে আবার জিজ্ঞাস্য কি থাকিতে পারে? আমরা গ্রাম্য পশুপালিকা। মধুপুরনাগরীদের মত কোন যোগ্যতাই আমাদের নাই। সুতরাং তাহাদিগকে তিনি মনের অনুকূল পাইয়া আমাদিগকে ত্যাগ করিয়াছেন।

"গ্রাম্য গোপবালিকা, সহজে পশুপালিকা,
হাম কিয়ে শ্যামসুখভোগ্য।
তারা রাজকুলসম্ভবা, ষোড়শী নবগৌরবা,
যোগ্য জনে মিলয়ে যেন যোগ্যা॥"

অপর এক ব্রজবধূ কহিলেন,—উদ্ধব, একটি কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হইতেছে। তুমি সাধু, নিশ্চয়ই মিথ্যা কথা বলিবে না। কৃষ্ণ আমাদিগকে ত্যাগ করিয়াছেন, করুন, মনের স্মৃতিভূমি হইতেও কি একেবারে মুছিয়া ফেলিয়াছেন? কখনও কি আমাদিগকে স্মরণ-পথে আনেন না? পুরস্ত্রীগণের মধ্যে বসিয়া স্বচ্ছন্দে কথাপ্রসঙ্গে কখনও কি আমাদের গুণ বা দোষ মনে করিয়া কোনও মন্তব্য করেন?

"অপি স্মরতি নঃ সাধো! গোবিন্দঃ প্রস্তুতে ক্বচিৎ।
গোষ্ঠীমধ্যে পুরস্ত্রীণাং গ্রাম্যাঃ স্বৈরকথান্তরে॥"

ভাঃ ১০।৪৭।৪২

পুরনারীগণের সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে কখনও কি শ্রীকৃষ্ণ অতর্কিতভাবে বলিয়া ফেলেন আমাদের নাম বা কোন দোষ-গুণের কথা? কখনও কি বলেন—"হে নাগরীগণ! তোমরা

যেমন গান করিতে পার, নৃত্য করিতে পার, আমার গোপীরাও সেইরূপ কিছু কিছু পারিত। অথবা তাহারা নিতান্ত গ্রাম্য বলিয়া তোমাদের মত নৃত্যগীত জানিত না। গুণাংশ বা দোষাংশ যাহা লইয়াই হউক আমাদের কোন প্রসঙ্গ কি তাঁহার মনোমধ্যে কুত্রাপি উদয় হয় না ?

অপর ব্রজাঙ্গনা কহিলেন,—উদ্ধব ! যোগ্যজনদের পাইয়া তিনি অযোগ্যজনদের ভুলিয়াছেন। ভুলিবেনই ত। সেজন্য ভাবি না। ভাবি, যে সকল অতুলনীয় রমণীয় রজনীগুলি আমাদের সঙ্গে তিনি কাটাইয়াছেন এই ব্রজধামে, সেগুলির কথা কি একেবারে ভুলিয়া গিয়াছেন ?

সেই যমুনার কূলে, শারদ জ্যোৎস্নায় পরিপ্লাবিত রাসের রজনী। তাও কি ভুলিয়া যাওয়া সম্ভব ! আহা সেই রজনী, যাহাতে কুন্দকুমুদমল্লিকাদি কুসুমচয় ফুটিয়াছিল, চাঁদ সেদিন নিজ ভাণ্ডারের সমস্ত জ্যোৎস্না উজার করিয়া ঢালিয়া দিয়া দশদিশি শুভ্রোজ্জ্বল করিয়াছিল। কর্পূরশুভ্র সুকোমল বালুকাময় যমুনা-পুলিনে আমরা নাচিয়াছিলাম শ্যামচাঁদকে ঘিরিয়া। নূপুরনিক্কণে দিঙ্মণ্ডল মুখরিত হইয়াছিল। উদ্ধব, সেই চাঁদও আর উঠিবে না, সেই ফুলও আর ফুঠিবে না, সেই নৃত্যগীতও আর ঘটিবে না। তাহা কি কাহারও ভুলিবার বিষয় !

সেই সময় আমরাই ছিলাম তাঁর প্রিয়তমা, আমারা করিতাম তাঁর মধুর নাচের প্রশংসা, তিনি করিতেন আমাদের মধুর গান-বাদ্যের প্রশংসা।—পরস্পর পরস্পরকে যোগ্যতার জন্য পারিতোষিক দিতাম। তিনি পণ ধরিতেন সাধের মুরলী,

আমরা পণ ধরিতাম আদরের দুলালী। উদ্ধব! একবারও কি মনে জাগে না তাঁর সেই সব রজনীর কথা?

তাঃ কিং নিশাঃ স্মরতি যাসু তদা প্রিয়াভি-
র্ব্ন্দাবনে কুমুদকুন্দ-শশাঙ্করম্যে।
রেমে ক্বণচ্চরণনূপুররাসগোষ্ঠ্যা-
মস্মাভিরীড়িতমনোজ্ঞকথঃ কদাচিৎ॥

ভাঃ ১০।৪৭।৪৩

আমাদের মনে হয়, উদ্ধব, আমাদের মত কৃষ্ণসেবা জানে এমন একজনও মথুরায় নাই। সেই জন্য রসরাজ শ্যামনাগরের অন্তরে আনন্দ নাই মনে ভাবিয়া আমরা দুঃখসাগরে নিমজ্জিত হই। তুমি উদ্ধব, যদি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পার যে, আছে সেখানে প্রিয়তমের অভিমত লোক, যারা জানে তাঁকে সুখ দিতে, যাদের সাধনাই তাঁকে সুখ দিতে, যাদের সাধনাই তাঁকে সুখ দেওয়া, যাদের সহিত তিনি রাসনৃত্য বেণীগীত-বিনোদে আছেন—তাহা হইলে নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি—তাঁর বিরহে আমরা সুখে থাকিতে পারি।

———

॥ সাতাইশ ॥

উদ্ধব! তুমি বুদ্ধিমান, তুমি প্রভুতুল্য। তুমি বিচার করিয়া বল, ব্রজে বাস করিয়া কেমন করিয়া ব্রজজীবনকে ভুলিয়া থাকা যায়। এই চিন্তামণি ভূমি তাঁহার শ্রীচরণ-চিহ্নে বিভূষিত! কঠিন পাষাণের গাত্রেও ধ্বজবজ্রাঙ্কুশযুক্ত পদচিহ্ন অঙ্কিত আছে। যখনই ভুলিতে চেষ্টা করি, ঐ পরম শোভাময় চরণের চিহ্নগুলি তাঁকে মনে করাইয়া দেয় "শ্রীনিকেতৈস্তৎপদকৈর্ব্বিস্মর্ত্তুং নৈব শক্নুমঃ।" আর একটি কথা বলি উদ্ধব। তুমি বলিয়াছ অনেকবার এবং বুঝাইতেও চেষ্টা করিয়াছ নানা প্রকারে যে আমাদের কৃষ্ণ পরমেশ্বর। কিন্তু আমাদের মন কিছুতেই ঐ কথা বুঝিতে চাহে না। এতদিন তাঁহাকে দেখিয়াছি। কত আদর যত্ন করিয়াছি। কত মান অভিমান করিয়াছি! একটু ভালও বাসিয়াছি। কিন্তু তিনি যে ভগবান্ ইহা কোন প্রকারেই বুঝি নাই। আজও বুঝি না।

কৃষ্ণ নন্দরাজের পুত্র, মা যশোদার দুলাল, আমাদের প্রাণ-সর্ব্বস্ব জীবিতেশ্বর ইহাই জানিয়াছি। ইহাই বুঝিয়াছি। অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে ইহাই বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে। তিনি ভগবান্ পরমেশ্বর এবম্বিধ তোমাদের সহস্র উপদেশ, যুক্তি বিচার তর্ক কিছুতেই আমাদের অন্তর হইতে দূরে করিতে পারিতেছে না—নন্দসুত এই অনুভবটি।

"পুনঃ পুনঃ স্মারয়ন্তি নন্দগোপসুতং বত।"

যদি বিশ্বাস করিতে পারিতাম, "কৃষ্ণ ভগবান্" তোমাদের ঐ কথাটি, তাহা হইলে মনে হয় উদ্ধব, দূর হইয়া যাইত এই তীব্র বিরহ বেদনা। কেন না, ভগবানকে লাভ করিতে যাদৃশ সাধন ভজন যোগতপস্যা লাগে তাহার কোটী ভাগের এক ভাগও আমাদের ক্ষুদ্র এই জীবনের মধ্যে নাই। সুতরাং আমরা কিছুতেই ভগবান্ লাভ করিতে পারিব না, এই দৃঢ় প্রত্যয়ে বিরহের বেদনা অন্তর হইতে চলিয়া যাইত। যে বস্তুর প্রাপ্তি সম্বন্ধে আশার ক্ষীণতম রেখাও শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, সেই বস্তুর জন্য বিরহবেদনা থাকিতে পারে না। কিন্তু তিনি যে ভগবান্ ইহা কিছুতেই প্রাণ মানিতে চায় না। কেন যে চায় না, তাহাও তোমায় বলি, উদ্ধব।

ভগবান্ আছেন ইহা মানি, তিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান ও সর্বব্যাপী হইাও বিশ্বাস করি। কিন্তু আমাদের কৃষ্ণে ইহার কোন একটি লক্ষণও দেখিতে পাই না। যদি তিনি সর্বজ্ঞ হইতেন, জানিতে পারিতেন আমাদের অন্তরের বেদনা। জানিতে পারিলে না আসিয়া থাকিতে পারিতেন না।

তিনি সর্বশক্তিমান হইলে, যে কোন মুহূর্ত্তে ব্রজে আসিয়া তিনি আমাদিগকে দেখা দিতে পারিতেন। সর্বশক্তিমানের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়। তাহা যখন দেখিতে পাইতেছি না তখন তিনি নিশ্চয়ই সর্বশক্তিমান নহেন। তিনি সর্বব্যাপীও নহেন। সর্বব্যাপী হইলে তিনি যে সময় মথুরায় সেই সময়ই ব্রজে এবং যখন ব্রজে সেই সময়ই মথুরায় থাকিতে পারিতেন। তাহা হইলে বিরহতাপে আমরা দগ্ধীভূত হইতাম না। সুতরাং

আমাদের কৃষ্ণ কিছুতেই ভগবান্ হইতে পারেন না, অন্ততঃ আমাদের কাছে। তোমাদের কাছে, মথুরাবাসীদের কাছে তিনি ভগবান্ হইলে হইতে পারেন কিন্তু আমাদের হৃদয়ের মর্মস্থলে শ্রীকৃষ্ণ, নন্দ নামক গোপরাজের পুত্র—এই মহাসত্যে দৃঢ় নিষ্ঠা হইয়াছে। এই নিষ্ঠা আমাদের জীবনসত্তা যতদিন আছে ততদিন অক্ষুণ্ণ রহিবে তাঁহাকে ব্রজেন্দ্রনন্দন, চিরসুন্দর বলিয়াই অনাদিকাল ডাকিব, জানিব, ভালবাসিব।"

উদ্ধব মহারাজ শ্রবণ করিতেছেন গোপীদের কথা। বিচারপূর্ণ যুক্তি দ্বারা কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব খণ্ডন অনেক শোনা আছে, কিন্তু এবম্বিধ বেদনাপূর্ণ প্রীতি দ্বারা তাঁহার ঈশ্বরত্ব খণ্ডন ইতঃপূর্বে কেহ শোনে নাই। এই ব্যথার বিচারের কাছে উদ্ধবের শাস্ত্রবিচার মূক হইয়া রহিল। উদ্ধব কী যেন মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন।

গোপীগণ উদ্ধবের চিন্তা অনুমান করিয়া কহিলেন, যদি বল উদ্ধব, বুদ্ধি দ্বারা মনকে অন্যত্র স্থাপনপূর্বক, কৃষ্ণবিষয়ক সকল বিস্মৃত হইয়া একেবারে ভুলিয়া গেলে এই বেদনা ঘুচিয়া শান্তি আসিতে পারে, এই কথা যদি বল, তাহা হইলে উত্তরে বলিব যে, ঐরূপ কিছু করিবার মত বুদ্ধিই আমাদের নাই। ঐ বুদ্ধি বস্তুটি তোমাদের ভগবান্ সর্বাগ্রেই আমাদের নিকট হইতে হরণ করিয়া লইয়াছেন। কী উপায়ে হরণ করিয়াছেন তাহাও বলিতেছি, শোন।

শ্রীকৃষ্ণের লালিত্যপূর্ণ গতিভঙ্গি, তাঁহার লীলায়িত কটাক্ষ চাহনী, তাঁহার মর্ম্মস্পর্শী প্রাণহর হাসি, তাঁহার মধুময় বাণী—

এই সকল নিত্যসঙ্গী সঙ্গে মহাশক্তিশালী হইয়া তিনি আমাদের সবটুকু বুদ্ধি হরণ করিয়া লইয়াছেন "হৃতধিয়ঃ।" সুতরাং কোন বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা মনকে সংহত করিয়া অন্যত্র অভিনিবেশ স্থাপন আমরা কিরূপে করিতে পারি? কিরূপেই বা তাঁহাকে ভুলিয়া যাইতে সক্ষম হই?

"গত্যাললিতয়োদারহাসলীলাবলোকনৈঃ।
মাধ্ব্যা গিরা হৃতধিয়ঃ কথং তদ্ বিস্মরামহে ॥"
(ভাঃ ১০।৪৭।৫১)

এইরূপে কৃষ্ণ কথা বলিতে বলিতে গোপীগণ পূর্ণভাবে প্রেমাবিষ্ট হইয়া পড়িলেন। নিকটে যে উদ্ধব আছেন সেজন্য যে কিছু সমীহ করা, লজ্জা সংকোচ থাকা উচিত এই লোকাপেক্ষা তাঁদের অন্তর হইতে একেবারেই চলিয়া গেল। তাঁহারা সকলে "হা কৃষ্ণ" "হা কৃষ্ণ" বলিয়া হাহাকার করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন মথুরার দিকে মুখ করিয়া। রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন আকুলকণ্ঠে।

নানাভাবমাধুর্য্যপূর্ণ শ্রীকৃষ্ণের নামমালা উচ্চারণ করিয়া তাঁহারা ব্যথাভরা কণ্ঠে কহিতে লাগিলেন—হে কৃষ্ণ, হে রমানাথ, হে ব্রজনাথ, হে আর্ত্তিহারী—গোকুল উদ্ধার কর, ডুবিয়া মরিতেছে, বাঁচাও।

হে কৃষ্ণ, তুমি পরম চিত্তাকর্ষক। ঐ গুণেই আমরা তোমার দাসী হইয়াছি। আমাদের কোন যোগ্যতাই নাই। তোমরা মাধুর্য্যে রমা পর্য্যন্ত আকৃষ্ট। আমরা ক্ষুদ্র জীব কোন্ ছার। তুমি আমাদের সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া এখন মথুরায় গিয়া রমাপতি

হইয়াছ। রাজ্যলক্ষ্মী এখন তোমার অঙ্কগতা। লক্ষ্মীপতি হইয়াছ হও তাহাতেও আমাদিগকে একেবারে ত্যাগ করিতে পারিবে না, কেন না নারীমাত্রই লক্ষ্মীর অংশসম্ভূতা। সুতরাং, রমানাথ তুমি, তোমারও আমরা উপেক্ষণীয়া নহি।

আর রমানাথ বলিয়া কি একেবারেই ত্যাগ করিতে পারিবে এই ব্রজভূমিকে ? যদি পার কর, কিন্তু ব্রজের জন তো তোমাকে ছাড়িবে না। ব্রজকে তুমি মন হইতে মুছিয়া ফেলিলেও ব্রজজন তোমাকে ব্রজনাথ বলিয়াই ডাকিবে। নিখিল ব্রজবাসীর তুমিই একমাত্র কামনার ধন। একমাত্র তোমাকে পাইলেই তারা সনাথ। তোমাকে হারাইলেই তারা অনাথ।

জীবের আৰ্ত্তি দূর করা তোমার এক অনন্যসাধারণ গুণ বলিয়া জানি। সে গুণে তুমি এখনও গুণী বিশ্বাস করি ! ব্রজজনের আর্ত্তিনাশ তো তোমার চিরব্রত। নিজমুখেই বলিয়াছিলে—

তস্মান্মচ্ছরণং গোষ্ঠং মন্নাথং মৎপরিগ্রহম্।
গোপায়ে স্বাত্মযোগেন সোঽয়ং মে ব্রত আহিতঃ॥

(ভাঃ ১০।২৫।১৮)

আমার শরণাগত, আমার প্রতিপাল্য, আমার পরমাত্মীয় এই গোষ্ঠবাসিগণকে আমি আত্মশক্তিপ্রভাবে রক্ষা করিব। শরণাগত-প্রতিপালনই আমার জীবনে মহাব্রত। এই কথা তুমি বলিয়াছিলে। শুধু বল নাই কার্য্যেও দেখাইয়াছিলে। গোবৰ্দ্ধন ধারণ করিয়া ইন্দ্রকৃত ব্রজজনের আৰ্ত্তি দূর করিয়াছিলে। ঐ বাক্যে গোকুলবাসীকে তুমি নিজজন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছ। তোমার ব্রতরক্ষার প্রতিজ্ঞার কথা মনে করিয়া বলিতেছি,

একটিবার গোকুলে আসিয়া নিজচক্ষে গোকুলবাসীর দশা দর্শন করিয়া যাও।

তুহুঁ সে রহিল মধুপুর।
ব্রজকুল আকুল, দুকুল কলরব,
কানু কানু করি ঝুর॥
যশোমতী নন্দ, অন্ধ সম বৈঠই,
সাহসে উঠই না পার।
সখাগণ ধেনু, বেণুরব না শুনিয়ে,
বিছুরল নগর বাজার॥
কুসুম ত্যজিয়া অলি, ক্ষিতিতলে লুটত,
তরুগণ মলিন সমান।
ময়ূরী না নাচিত, কপোতী না বোলত,
কোকিলা না করতহি গান॥
বিরহিণী রাই, বিরহজ্বরে জর জর,
চৌদিকে বিরহ হুতাস॥
সহজে যমুনা জল, আগি সমান ভেল,
কহতহি গোবিন্দ দাস॥

সমগ্র ব্রজ ডুবিয়া যাইতেছে মহাশোকের সাগরে। ইন্দ্রকৃত ঝড়-বর্ষণে ব্রজ ডুবিয়া যাইতেছিল জলপ্লাবনে। তাহা হইতে তুমিই বাঁচাইয়াছিলে। আজ তোমার নিজকৃত বিরহ-বেদনে গোকুল মগ্ন হইতেছে শোকের প্লাবনে। এস অবিলম্বে। আসিয়া দুঃখময় গোকুলকে উদ্ধার কর।

"মগ্নমুদ্ধর গোবিন্দ ! গোকুলং বৃজিনার্ণবে"

(ভাঃ ১০।৪৭।৫২)

গোবিন্দ হে, তুমি ভিন্ন আর কেহই নাই বেদনার পাথারে নিমজ্জমান গোকুলবাসীদিগকে রক্ষা করিতে। তোমার দূতমুখে প্রেরিত বাণী অতি সুন্দর। কিন্তু বিরহসমুদ্রে পতিত ব্রজ-জনকে উদ্ধার করিবার সামর্থ্য ঐ উপদেশ বাণীর নাই। ক্ষুদ্র দীপশিখা বাতাস নিভাইতে পারে। মহাগ্নিকে বাতাস নিভাইতে পারে না, আরও বাড়াইয়া তোলে। তোমার মূল্যবান উপদেশ দূর করিতে পারে অতি সাধারণ ছোট দুঃখ। আজ তোমার অভাবে ব্রজবাসিগণের যে দুর্ব্বিষহ মহাদুঃখ তাহা দূর করিতে পারে না, বরং বাড়াইয়া তোলে।

ব্রজবাসী জীবনে মরণে শয়নে স্বপনে তুমি ছাড়া জানে না, এই মহাবিপদে যদি তাহাদের পার্শ্বে না দাঁড়াও তাহা হইলে তারা দাঁড়াইবে কোথায়? কৃষ্ণ, তোমার রমানাথ, ব্রজনাথ, আর্ত্তিনাশন নামগুলি ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইবে এই বেদনার সায়র হইতে ব্রজজনকে উদ্ধার না করিলে। এই কথা বলিতে বলিতে গোপীগণের মহাবেদনার বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল।

বসিয়াছিলেন তাঁরা, উঠিয়া দাঁড়াইলেন। উর্দ্ধদিকে হাত তুলিলেন। মথুরার দিকে মুখ ফিরাইলেন। মুক্তকণ্ঠে ব্যথা-ভরা সুরে "হা কৃষ্ণ" "হা ব্রজনাথ" বলিয়া মর্মভেদী আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন তাঁহারা। অশ্রুধারা তাঁহাদের গণ্ড বক্ষ ভাসাইয়া বসন তিতাইয়া ভাদ্রের স্রোতস্বিনীর মত বহিতে লাগিল। তাঁহাদের তপ্ত নিঃশ্বাসে ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে মহাক্ষোভ

উপস্থিত হইল। ব্রজের বৃক্ষলতা পশুপক্ষিকুল ব্যাকুল হইল। যমুনার জল সন্তপ্ত হইয়া উঠিল। জলমধ্যচারী মৎস্য মকর জলজন্তুগণও আর্ত্তিমাখা ক্রন্দন করিল। দেববৃন্দের শরীরে ঘর্ম্মপাত হইতে লাগিল, বৈকুণ্ঠস্থিতা লক্ষ্মীদেবীরও অশ্রুপাত হইল।

অবাক্ বিস্ময়ে উদ্ধব গোপীকাগণের উদ্‌ঘূর্ণা অবস্থা দর্শন করিতে লাগিলেন। এমন বেদনভরা কণ্ঠ, এমন বুকফাটা কথা, হরিবিরহে এমন নিরর্গল অশ্রুবৃষ্টি, উদ্ধব কেন বিশ্বজগতে কেহ কোনও দিন কোথাও দেখে নাই। দেখা দূরের কথা, শোনেও নাই। দেখিতে দেখিতে নিজ অজ্ঞাতসারে উদ্ধবের নয়নযুগল দরবিগলিত ধারা বর্ষণ করিতে লাগিল। উত্তরীয়ের অঞ্চলে মুছিয়া ফেলিবার ব্যর্থ প্রয়াস কয়েকবার করিয়া উদ্ধব "ভবতীনাং বিয়োগো মে ন হি সর্ব্বাত্মনা ক্বচিৎ" হইতে আরম্ভ করিয়া এই পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণকথিত শ্লোকসমূহ মহামন্ত্রের মত বারংবার আবৃত্তি করিতে লাগিলেন।

"অনুস্মরন্ত্যো মাং নিত্যমচিরান্মামুপৈষ্যথ"

(ভাঃ ১০।৪৭।৩৬)

———

॥ আটাশ ॥

ব্রজাঙ্গনাগণের অবস্থা দর্শন করিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন উদ্ধব মহারাজ। কী উপায়ে নিভাইবেন তিনি এই ভীষণ বিরহ-দাবানলকে। একটি মাত্র সুস্নিগ্ধ বস্তু তার পুঁজি আছে যাহা দ্বারা সম্ভব ঐ অগ্নির নিৰ্ব্বাপণ। সে বস্তু হইল শ্রীকৃষ্ণের বাক্যামৃত। ঐ অমৃত ছাড়া আর কোন স্নিগ্ধতর বস্তু তাঁহার করায়ত্ত নাই, যদ্দ্বারা ঐ দাবাগ্নি নিৰ্ব্বাপিত হইতে পারে তাই, শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখোক্তি অমৃতময় বাক্যাবলী পুনরায় উচ্চারণ করিতে লাগিলেন শ্রীমান উদ্ধব।

"ভবতীনাং বিয়োগো মে ন হি সর্বাত্মনা ক্বচিৎ।"

হইতে আরম্ভ করিয়া "অলব্ধরাসাঃ কল্যাণ্যো মাপুর্ম্মদ্বীর্য্যচিন্তয়।" পর্য্যন্ত পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিতে লাগিলেন, শ্রীউদ্ধব মহারাজ।

বিরহ কমিল। শুধু কমিল না, উপশম হল। শ্রাবণের ধারায় যেমন করিয়া নির্বাপিত করে দাবানল, সেইরূপ নিভিয়া গেল গোপীগণের তীব্র বিরহের দুর্বিষহ জ্বালা। শ্রীশুকদেব তাই বলিয়াছেন,

"ততস্তাঃ কৃষ্ণসন্দেশৈঃ ব্যপেতবিরহজ্বরাঃ"

শ্রীকৃষ্ণের সন্দেশে বিরহজ্বর দূরীভূত হইল। দূর হইল বলিতে সর্ব্বতোভাবে দূর হইল এমন নহে। বিরহের যে অংশ একমাত্র মিলনেই বিনাশ্য, তাহা অবশ্য নাশ হইল না। যাহা, বা বিরহের যে অংশ, কৃষ্ণসন্দেশে নাশ্য, তাহাই নাশ হইল।

শ্রীকৃষ্ণের উক্তির যে অর্থ শ্রীকৃষ্ণের অন্তরে ছিল, অর্থাৎ নিত্যলীলাপর অর্থ, তাহাই এইবারে গোপীগণের হৃদয় ভরিয়া জাগিয়া উঠিল। নিত্যলীলায় নিত্যকাল তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যুক্তই আছেন। এই প্রকট প্রকাশেই মাত্র তাঁহাদের বিচ্ছেদ, এই অনুভব তাঁহাদের প্রাণ ভরিয়া উদিত হইল, এই অর্থ-ভাবনায় তাঁহাদের আরও মনে হইল যে, তাঁহারা ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে নিত্য যুক্তই আছেন। শ্রীকৃষ্ণ ব্রজেই আছেন। তাঁহাদের সঙ্গে পূর্ব্ববৎ মিলিতই আছেন। তবে যে মথুরায় গিয়াছেন বলিয়া মনে হয় উহা ভ্রান্তি মাত্র।

স্বপ্নদর্শনকালে অলীক স্বপ্ন সত্য বলিয়া মনে হয়। সেইরূপ তাঁহাদের কৃষ্ণ সঙ্গে মিলনই যথার্থ। বিরহই স্বাপ্নিক। কিছু সময়ের জন্য এই দৃঢ় বিশ্বাস তাঁহাদের বিচ্ছেদ-বেদনা দূর করিয়া দিল। ব্যপেতবিরহজ্বরাঃ।

বিরহজ্বর উপশম হইলে তাঁহারা ক্ষণেকের জন্য প্রকৃতিস্থ হইলেন। কৃষ্ণ-দূত উদ্ধবকে কটূক্তি না বলিয়া মধুর বাক্যে ও ব্যবহারে আপ্যায়ন করা তাঁহাদের কর্ত্তব্য—ইহা মনে হইল। তখন তাঁহারা উদ্ধবকে শ্রীকৃষ্ণতুল্য ভাবিয়া যথাসাধ্য সম্মাননা ও পূজার্চ্চনা করিলেন।

"উদ্ধবং পূজয়াঞ্চক্রুর্জ্ঞাত্বাত্মানমধোক্ষজম্"

১০।৪৭।৫৩

ব্রজে বাস করিয়াছিলেন শ্রীমান উদ্ধব প্রায় দশ মাস কাল। এই থাকাকালে ব্রজজনের বিরহবেদনা অনেকাংশে উপশম করিয়াছিলেন তিনি। "গোপীনাং বিনুদন্ শুচঃ", গোপীদের

শোককে অপনোদন করিয়া উদ্ধব ছিলেন ব্রজে।

যখন বাহ্যানুসন্ধানে তাঁহাদের বিরহ-বেদনা জাগিয়া উঠিত, উদ্ধব তখনই উচ্চারণ করিতেন শ্রীকৃষ্ণের বাণী, অতীব সুমধুর স্বরে। উহা শ্রবণ মাত্র তাঁহারা অন্তর্ম্মুখীন হইতেন। অন্তরে যে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে কত আপন করিয়া পাইয়াছে, তাহা প্রবলভাবে মানসে জাগিত। বিরহের মধ্যে যে একটা পূর্ণ প্রাপ্তি আছে, সেই প্রাপ্তির আনন্দে তাঁহারা ডুবিয়া থাকিতেন। নিত্যলীলায় যে চির-মিলনানন্দ আছে তাঁহার প্রত্যক্ষময় আবেশে তাঁহাদের বিরহ-শোক দূর হইয়া যাইত।

এই প্রকারের শ্রীমান উদ্ধব, শ্রীনন্দরাজ ও যশোমতীর নিকটেও গমন করিয়া তাঁহাদের সম্মুখে শ্রীকৃষ্ণের রূপগুণাদি কীর্ত্তন করিতেন। উহা শ্রবণ করিয়া তাঁহাদের হৃদয়ের তাপ শান্তভাব ধারণ করিত এবং অন্তরে আনন্দতরঙ্গ খেলিত। ভক্তশ্রেষ্ঠ উদ্ধব যখন শ্রীকৃষ্ণগুণ গাইতেন, তখন তাঁহাদের নিকট ঐ লীলা সাক্ষাৎকারের মত অনুভব হইত।

যতদিন উদ্ধব ব্রজধামে ছিলেন, নিরন্তর কৃষ্ণকথা-প্রসঙ্গেই কাটাইতেন। এইজন্য দীর্ঘ সময়ও ক্ষণকাল মনে হইয়াছিল।

ব্রজৌকসাং ক্ষণপ্রায়াণ্যাসন্ কৃষ্ণস্য বার্ত্তয়া।

১০।৪৭।৫৫

এইরূপ হইবার কারণ এই, দুঃখানুভূতি অল্প সময়কেও দীর্ঘ মনে করায় আর তদ্বিপরীত সুখানুভূতি দীর্ঘ সময়কে অল্প বলিয়া মনে করায়।

যতদিন ব্রজে ছিলেন হরিদাস উদ্ধব, ব্রজজন-সঙ্গে ব্রজমণ্ডল ভরিয়া বেড়াইয়া বেড়াইতেন। কখনও শ্রীকুণ্ডতটে, কখনও শ্রীকুঞ্জবনে, কখনও গোর্দ্ধনশিখরে, কখনও গিরিগহ্বরে, কখনও বা কালিন্দীর তীরে তীরে—সর্ব্বত্র বিচরণ করিয়া পুষ্পভারাক্রান্ত বৃক্ষরাজির (কুসুমিতান্ দ্রুমান্) শোভা দর্শন করিতেন। যেখানে যেখানে শ্রীকৃষ্ণ যে যে লীলা করিয়াছেন, সেই সেই স্থানে গিয়া সেই সেই লীলা মধুর কণ্ঠে অভিনব সুরে তালে গান করিতেন। উদ্ধবের কণ্ঠ-মাধুর্য্য ও অনুভব-গভীরতায় লীলা প্রকট হইয়া উঠিত। সকলেই যেন দর্শন করিতেন, শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবিহার করিতেছেন। অন্তরে আস্বাদনের তরঙ্গ উঠিত।

শ্রীমান উদ্ধবকে শ্রীশুকদেব "হরিদাস" এই পরম বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছেন। উদ্ধব আজ প্রকৃত হরিদাসের কার্য্যই করিতেছেন বটে। শ্রীহরি-বিরহী ভক্তের প্রাণে শ্রীহরিকথা কহিয়া আনন্দ দান—ইহাই ত শ্রীহরিদাসের মুখ্য কার্য্য। প্রতিটি দিন, প্রতিটি ক্ষণ, তাহাই করিতেছেন উদ্ধব। শ্রীঠাকুরমহাশয় ঈদৃশ হরিদাসের জীবনের ভাগ্যই লালসা করিয়া বলিয়াছেন—

"অবিরত অবিকল, তুয়া গুণ কলকল,
গাই যেন সতের সমাজে ॥"

॥ ঊনত্রিশ ॥

উদ্ধবের দৌত্য শেষ হইল। দশ মাসকাল ব্রজে বাস করিয়া আজ তিনি মথুরায় যাত্রা করিবেন। এই দশ মাস উদ্ধব নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমাতুরাগণকে দর্শন করিয়াছেন। উদ্ধব দেখিয়াছেন স্বচক্ষে "কৃষ্ণাবেশাত্মবিক্লবম্—শ্রীকৃষ্ণাবেশে আত্ম-সম্বিৎহারা—সর্ব্বস্ব অর্পণে সর্ব্বহারা। যাদৃশভাব-মহিমা কেহ কোথাও কোন দিন দেখে নাই বা শুনেও নাই, ব্রজে তাহার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইল শ্রীমান উদ্ধবের।

উদ্ধব তাঁহাদের মহাভাবময়ী অবস্থা দেখিয়াছেন, মহাভাবময়ী চেষ্টা দেখিয়াছেন, মহাভাবময়ী ভাষা শুনিয়াছেন। ইহার ফলস্বরূপ তাঁহার অন্তর্হৃদয়ে উপস্থিত হইয়াছে ব্রজাঙ্গনাগণের পাদপদ্মে মহাচমৎকারী ভক্তি, তাঁহাদের দিব্যোন্মাদ অবস্থা সন্দর্শন করিয়া মহাভাগ্যবান্ মনে করিয়াছেন নিজেকে উদ্ধব।

অন্তরে নিভৃতে তাঁহার লালসা জাগিয়াছে, কায়মনোবাক্যে শ্রীগোপিকাদের শ্রীপাদপদ্মে লুটাইবেন। কিন্তু হায়! কায় দ্বারা প্রণাম ত তাঁহারা গ্রহণ করিবেন না। কাজেই আপাততঃ মন ও বাক্যের দ্বারা প্রণাম জানাইতে হইবে। তাই উচ্চারিত বাক্যের সঙ্গে সঙ্গে অন্তর মিলাইয়া কহিতে লাগিলেন শ্রীউদ্ধব মহারাজ। উহা শ্রবণ করিয়া আমাদিগের গোচরীভূত করিতেছেন শ্রীল শুকদেব।

"উদ্ধবঃ পরমপ্রীতস্তা নমস্যন্নিদং জগৌ।"

(ভাঃ ১০।৪৭।৫৭)

প্রণাম জানাইবার পূর্বে মনে মনে ভাবিতেছেন শ্রীল উদ্ধব মহারাজ। কেহ হয়ত আমাকে বলিয়া উঠিবেন, আমি ক্ষত্রিয় জাতি, সুতরাং একমাত্র ব্রাহ্মণ-দেহই আমার প্রণম্য। এই সকল ব্রজবাসিগণ বৈশ্য জাতি। তাহাতে আবার নারী জাতি, ইঁহারা আমার প্রণাম পাইবার যোগ্য নহেন। সুতরাং অশাস্ত্রীয় প্রণাম করিয়া অপরাধজনক কার্য্য করিতেছি। এই জিজ্ঞাসার যথাযথ উত্তর আমাকে দিতেই হইবে।

জগতে ব্রজগোপীরাই যে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রণম্য ইহা সর্বাগ্রে স্থাপনীয়। তাই বলিলেন—

এতাঃ পরং তনুভৃতো ভুবি গোপবধ্বো
গোবিন্দ এবমখিলাত্মনি রূঢ়ভাবাঃ।
(ভাঃ ১০।৪৭।৫৮)

জগতে ভগবান্ আবিভূ`ত হইয়াছেন। সাধক ভক্ত, সিদ্ধ ভক্ত, রসিক ভক্ত, নিত্য পার্ষদ প্রভৃতি অসংখ্য ভক্ত অবতরণ করিয়াছেন শ্রীভগবানের সঙ্গে। ইঁহারা সকলেই বিশ্বের গৌরবর্দ্ধন করিয়া বিদ্যমান আছেন। এই সকল ভক্তগোষ্ঠীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কে, এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইলে দৃঢ়নিশ্চয়তা সহকারে অকুতোভয়ে বলিব—শ্রীনন্দ-ব্রজবাসিনী কৃষ্ণভামিনী গোপকামিনীগণই সর্বশ্রেষ্ঠা, বিশ্বের তনুধারী জীবের মধ্যে ইঁহারাই সর্বোত্তমা। যদি বলেন, যথাযথ কারণ না দেখাইলে এই কথা আমরা স্বীকার করিব না, তবে শুনুন কারণ বলি—

যাঁহাদের পরমাত্মাস্বরূপ শ্রীগোবিন্দে এতাদৃষ গাঢ় ভাব, সেই গোপীগণের জন্মই জগতে সর্বশ্রেষ্ঠ। কেননা মোক্ষাকাঙ্ক্ষী

মনিগণ এবং শ্রীচরণ-সেবাকাঙ্ক্ষী ভক্তগণ সর্বদাই এই ভাব প্রার্থনা করিয়া থাকেন। কিন্তু কাহারও ভাগ্যে এই ভাব-প্রাপ্তি সম্ভব হয় না।

রূঢ়ভাব হইল মহাভাবের একটি বিশেষ অবস্থা। একমাত্র গোপীদেহ ভিন্ন মহাভাবের আধেয় হইবার সামর্থ্য আর কোন দেহেরই নাই। একমাত্র গঙ্গাধরই গঙ্গা ধারণ করিতে পারেন। ব্রজগোপীগণই মহাভাববতী হইতে পারেন। মহাভাব ধারণ করিতে বিশুদ্ধ চিদ্দেহের প্রয়োজন। একমাত্র গোপাগণেরই উহা আছে। দ্বারকাবাসী মহিষিগণের পক্ষেও উহা সুদুর্লভ।

"মুকুন্দমহিষীবৃন্দৈরপ্যসাবতিদুর্লভঃ"

মোক্ষাকাঙ্ক্ষী মুনিগণ বা সেবাকাঙ্ক্ষী ভক্তগণের ত কথাই নাই, বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীগণের পর্য্যন্ত মহাভাবটি দুর্লভ সামগ্রী। ব্রজাঙ্গনাগণের চিন্ময় দেহই মহাভাবের একমাত্র আধার। চিন্ময় দেহ সর্বদা প্রেমপূর্ণ। ভোগময় জড়দেহ কামপূর্ণ। কামের দেহ ত্যজ্য। প্রেমের দেহ পূজ্য, অন্য সকল জড়ীয় দেহ ত্যজ্য। প্রেমের ঘনীভূত বিগ্রহ গোপীদেহ। সুতরাং বিশ্বের দেহধারী জীবের মধ্যে গোপীগণই সর্বশ্রেষ্ঠা। অতএব গোপীগণের সম্বন্ধে তাঁহাদের গোপজাতিত্ব বা তাঁহাদের নারীদেহত্ব-ভাবনা নিতান্ত অপরাধজনক।

গোপীগণের অপরিসীম প্রীতির পাত্র যিনি, তিনি নিখিল আত্মার আত্মা। তিনি বিশ্বের সকলের নিরুপাধি প্রীতির পাত্র। অন্য সকল বস্তু বা ব্যক্তির প্রতি প্রীতির কারণ আছে, আত্মার প্রতি প্রীতির কোন হেতু নাই। আত্মা নিরুপাধি প্রেমের পাত্র।

শ্রীকৃষ্ণ নিখিল আত্মার আত্মা। এই হেতু তিনিই নিরুপাধি প্রেমের পাত্র। এই প্রীতির বস্তুর শ্রেষ্ঠত্ব হইতেও গোপীগণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হয়।

গোপীগণ কেবল পরমাত্মাকেই ভালবাসেন না, পরমাত্মার শ্রীগোবিন্দ মূর্ত্তিই তাঁহাদের প্রেমের প্রকৃষ্ট বিষয়। পরমাত্মার রসঘন মূর্ত্তিই শ্রীগোবিন্দ। বেদশাস্ত্র সর্বরস, সর্বগন্ধ, সর্বস্পর্শ, সর্বশব্দ, সর্বরূপ বলিয়া যে অখণ্ড তত্ত্বের সন্ধান দিয়াছেন, তিনিই শ্রীগোবিন্দ। রূপমাধুর্য্য, বেণুমাধুর্য্য, প্রেমমাধুর্য্য ও লীলামাধুর্য্য এই চারি মাধুর্য্যে যিনি অনন্যসাধারণ, তিনি শ্রীগোবিন্দ। সেই অখিলাত্মাস্বরূপ গোবিন্দে গোপীগণের অধিরূঢ় মহাভাব—"গোবিন্দ এবাখিলাত্মনি রূঢ়ভাবাঃ।"

প্রেমের প্রগাঢ়তম অবস্থা রূঢ়ভাব। শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে যাঁহারা সেই ভাব বহন করেন তাঁহাদের ভাবের স্বরূপের অনুভব করিবার ক্ষমতাও অন্য কাহারও নাই। কেবলমাত্র এই ভাবের মহিমাংশ অন্য মনের গোচর হইতে পারে। মুমুক্ষু এবং মুক্ত মহাপুরুষগণ এবং শ্রীকৃষ্ণের নিত্যসঙ্গী দাসভক্তগণ আমরাও এই অধিরূঢ় মহাভাবের মহিমা বুঝিতে পারি না। এই পরম বস্তু আমরা প্রার্থনা করি, কিন্তু পাই না।

"বাঞ্ছন্তি যদ্ ভবভিয়ো মুনয়ো বয়ঞ্চ"

আমাদের অন্তরে সাধ জাগে—ব্রজগোপীদের যাদৃশ ভগবৎ-প্রেমাবেশ, তাহার কিঞ্চিন্মাত্র লাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হই। কোথাও কোনও দিন দেখি নাই এমন প্রেমাতুরতা। জলমগ্ন মানুষ যেমন চারিদিকে জলই দেখে, আর কিছু দেখে না, শ্রীকৃষ্ণ-

প্রেমমগ্ন ব্রজবালাগণ কার্য্যে, বাক্যে, মনে প্রাণবল্লভ ছাড়া আর কিছুই জানেন না। ইঁহাদের দেহেন্দ্রিয়, বাক্য, চিন্তা সবই শ্রীকৃষ্ণময়। সাধারণ ভক্ত দূরের কথা, অতি অসাধারণ ভক্তেরাও উহাদের অবস্থা কামনা করেন, কিন্তু উহার কিয়দংশও কেহ লাভ করিতে পারে না।

লাভ করিতে না পারিবার একটি গূঢ় কারণ আছে। কারণটি হইল শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যবিশেষের অনুভব। শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে একটি এমন অনন্যসাধারণ মাধুর্য্য আছে যাহার আস্বাদনে মানুষ সব ভুলিয়া উন্মাদ হইয়া যায়। ব্রজগোপীরা যে উন্মাদিনী হইয়াছেন তাহার একমাত্র কারণ শ্যামসুন্দরের মোহন মাধুর্য্যে তাঁহাদের নিবিড় আবেশ। এই মাধুর্য্য আস্বাদনে এইরূপ ক্ষমতা আর কাহারও নাই।

সুতরাং এ জগতে শ্রীকৃষ্ণকথা আস্বাদনে যাহারা অরসিক তাহাদের ব্রাহ্মণ-জন্মও ব্যর্থ। আর শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্যে যাঁহারা রসিক তাঁহাদের ব্রাহ্মণজন্মের কী প্রয়োজন থাকিতে পারে? যে কোন কুলে জন্মগ্রহণেই তাঁহাদের জীবন সার্থক। ব্রাহ্মণজন্মের আবশ্যকতা তাহাদের নাই।

"কিং ব্রহ্মজন্মভিরনন্তকথারসস্য"

শ্রীকৃষ্ণরস আস্বাদনের যোগ্যতা অতি দুর্লভ। তাহাতে তন্ময়তা দুর্লভতর। অধিরূঢ় মহাভাববতী ব্রজগোপীগণের শ্রীকৃষ্ণে নিবিড় আবিষ্টতা দুর্লভতম।

যদি কেহ বলেন ইহারা স্ত্রীজাতি, বনবাসিনী, তাহাতে আবার ব্যভিচারদুষ্টা—সুতরাং ইহাদের চরণরজঃ প্রার্থনা, উদ্ধব,

তোমার মত ব্যক্তির সাজে না, তবে বলি শুনুন। স্ত্রী হইলেই যে দূষণীয় হইল বা পুরুষ অপেক্ষা হীন হইল এমন কোনও কথা নাই। লক্ষ্মী প্রভৃতি ভগবৎপার্ষদগণ স্ত্রীজাতি, তাঁহারা সকলের পূজ্যা। বনবাসিনী হইলেও যে হীনা হইবে এমন কোন কারণ নাই। দেখিতে হইবে কোন্ বনে বাস করে।

ইঁহারা বাস করেন শ্রীবৃন্দাবনে। যে বন হইতে শ্রেষ্ঠ বন আর ত্রিভুবনে নাই। এই ব্রজবনে যে কোন জন্ম ব্রহ্মজন্ম হইতে উৎকৃষ্টতর এই কথা বলিয়াছেন স্বয়ং ব্রহ্মা।

তদ্ভুরিভাগ্যমিহ জন্ম কিমপ্যটব্যাম্।
যদ্ গোকুলেহপি কতমাঙ্ঘ্রিরজোভিষেকম্॥

সেই ব্রজবনবাসিনী কৃষ্ণপ্রিয়াগণ নিশ্চয়ই সংসারের দেব, মনুষ্য, ঋষি, মুনি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠা। ইঁহারা সকলের ঊর্দ্ধে বিরাজমানা। জ্ঞানযোগাদি সাধনে পুরুষের কিছু উৎকর্ষ থাকিতে পারে, কারণ ঐ সকল ভজন-পথ কঠোর এবং ক্লেশকর। প্রীতিজগতে নারীজাতিরই সর্ব্বাধিক অধিকার। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রকৃষ্ট বার্ত্তাই হইল এই যে, শ্রীভগবানকে শুদ্ধ প্রীতিরসে লাভ করা যায়। নারীর প্রাণে ঐ প্রীতিরসের আধিক্য। সুতরাং ভাগবতশাস্ত্র মতে ব্রজনারীরা সর্বাধিক অধিকারসম্পন্না।

॥ ত্রিশ ॥

তারপর ব্যভিচারদুষ্টতার কথা। ঐ কথা বলে, যাহারা বহির্ম্মুখ, যাহাদের বুদ্ধি অতি স্থূল, দৃষ্টি অতীব সীমাবদ্ধ। বিচার করা যাউক ব্যভিচারদুষ্ট কাহাকে বলিব। বিপরীত অভিমুখে বিচরণ করার নাম ব্যভিচার। যে দিকে উপাস্যতম প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ বিদ্যমান আছেন, তাঁহার বিপরীত মুখে যাহারা বিচরণ করে তাহারাই ব্যভিচারী। আর এই ব্রজাঙ্গনাগণকে দেখুন, ইঁহারা কৃষ্ণ ভিন্ন আর সকল বিষয় সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিয়াছেন, আর গাঢ় অনুরাগে শ্রীকৃষ্ণকে ভজন করিতেছেন—সুতরাং ইঁহারা কি প্রকারে ব্যভিচারদুষ্টা হইতে পারেন ?

নিখিল ধর্মশাস্ত্রের উপদেশ—জড়বস্তুর প্রতি কামনা পরিত্যাগ করিয়া অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব শ্যামসুন্দরের ভজনানুষ্ঠান। সকল সাধক ভক্তগণ, যাঁহারা শাস্ত্রপথে চলেন—তাঁহারা নিরন্তর চেষ্টা করেন ঐ উপদেশ পালন করিতে, কৃষ্ণভিন্ন তৃষ্ণা ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণে নিষ্ঠতা লাভ করিতে। কিন্তু এই ব্রজদেবীগণের মত আর কে পারিয়াছে সর্বস্ব ত্যাগ করিতে, কৃষ্ণে এমন প্রগাঢ় আবেশে লাভ করিতে ? আর সেই পরমারাধ্য অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্ববস্তুই নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ।

অতএব এই গোপীগণ কোন প্রকারেই ব্যভিচারদোষদুষ্টা হইতে পারেন না। তবু লোকে বলে বলুক। তাহাদের একটিবার দেখা উচিত—কোথায় বা বনচরী ব্যভিচারদুষ্টা রমণী, আর কোথায় বা পরমাত্মাস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণে অধিরূঢ় মহাভাব।

কেমাঃ স্ত্রিয়ো বনচরীর্ব্ব্যভিচারদুষ্টাঃ

কৃষ্ণে ক্ব চৈষ পরমাত্মনি রূঢ়ভাবঃ। ভাঃ ১০।৪৭।৫৯

গোপীগণের উপরে যাহারা ব্যভিচার-দোষ (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ ইঁহাদের উপপতি, তাঁহার সেবা করা অন্যায় এই দুষ্টভাব) অর্পণ করে, সেই সকল দোষারোপকারী ব্যক্তিগণ, অক্ষয় নরক ভোগ করিবার উপযুক্ত পাত্র—

"তত্রাস্তু ব্যভিচারদোষবলকাঃ যে হন্ত তে নারকাঃ।"

গোপীগণ যে সকলের বিস্ময়জনক প্রেমলাভ করিয়াছিলেন (পরমস্মদদ্ভুতকরং প্রেমাশ্রিতা গোপিকা) তাঁহাদের সন্ধান ব্যতীত ব্রহ্মারূপ জন্মগ্রহণও বৃথা। "বার্ত্তাং যস্য বিনা বৃথা ভবন্তি তদ্ব্রহ্মাত্মানা জন্ম চ" শ্রীকৃষ্ণ ত পরমাত্মা, তাঁহাকে জানাতেই ব্রহ্মার ব্রহ্মত্ব। সকলের সকল ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা শ্রীকৃষ্ণ। সকলের আত্মার আত্মাও শ্রীকৃষ্ণ। গোপীগণের পতিম্মন্যগণের ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতৃরূপেও শ্রীকৃষ্ণ পতি। আবার তাঁহাদের আত্মার আত্মা-রূপেও শ্রীকৃষ্ণই পতি।

"গোপীনাং তৎ পতিনাঞ্চ সর্বেষাঞ্চৈব দেহিনাম্।
যোঽন্তশ্চরতি সোঽধ্যক্ষঃ ক্রীড়নেনেহদেহভাক্॥"

গোপীদের, তাঁহাদের পতিদের, সকল দেহধারীদের বাহিরে ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতৃরূপে, অন্তরে অন্তরাত্মারূপে যিনি নিত্য বিচরণ করেন, সেই পরমাত্মাই লীলাবিহারের জন্য কৃষ্ণরূপে বিদ্যমান। সুতরাং ব্যভিচার দোষের সম্ভাবনা কোথায়? যাহারা সর্বত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ভজন করে না, (সর্বত্যাগপূর্বক ভজনাভাব) তাহারাই প্রকৃত ব্যভিচারী।

পূর্বপক্ষী আপত্তি তুলিতেছেন। আপনি যাহা বলিতেছেন তাহা বুঝিলাম—তত্ত্বদৃষ্টিতে গোপীগণ ব্যভিচারদুষ্টা নহেন। ব্রজজন ছাড়া অন্যেরা—যাহারা কৃষ্ণভজন করে না, তাহারাই প্রকৃত ব্যভিচারী। ইহা বুঝিবার পরও সংশয় মিটিতেছে না। কারণ তত্ত্বদৃষ্টি ও ব্যবহারদৃষ্টিকে এক মনে করিতে পারিতেছি না। গোপীগণের অন্য পতি আছে বলিয়া যখন শোনা যায়, তখন বাহ্যদৃষ্টিতে তাঁহারা ব্যভিচারদুষ্টা বলিয়া বিশেষিত হইবেনই। তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা ইহা ঠেকাইতে পারিবে না। উত্তরে বলিব—না, ব্যবহারিক দৃষ্টিতেও কোন দোষারোপ করিবার অবকাশ নাই। তাঁহাদের অন্য পতি আছে বলিয়া যে শোনা যায় ওটি যোগমায়াকল্পিত। কারণ তাহা না হইলে ব্রজবধূগণের রূঢ় মহাভাবের প্রকাশটি পূর্ণাঙ্গ হয় না।

প্রবলতম দুঃখও শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির সম্ভাবনায় যদি পরম-সুখকর বলিয়া প্রতিভাত হয়, তাহা হইলে সেই প্রণয়ের নাম রূঢ়মহাভাব হয়। অনুরাগটি পরিপূর্ণরূপে প্রকটিত না হইলে রূঢ়মহাভাব ব্যক্ত হইতে পারে না। মর্য্যাদাশালিনী কুলবধূগণের লজ্জাত্যাগ, পাতিব্রত্য-ত্যাগ, অগ্নিতে দগ্ধীভূত হওয়া বা বিষধর সর্পের বিষের জ্বালায় মরা অপেক্ষাও অধিকতর বেদনার হেতু। গোপীগণ কৃষ্ণপ্রেমে সেই লজ্জা ও পাতিব্রত্য ত্যাগ করিয়াছেন বলিয়াই তাঁহাদের অনুরাগ রূঢ়মহাভাবের ভূমিকায় আরোহণ করিয়াছে। সুতরাং যোগমায়া ঐরূপ একটি কল্পিত পতিভাব ঘটাইয়া মহাভাবের আসনটি রচনা করিয়াছেন মাত্র।

আর যদি বলেন ব্রজাঙ্গনাগণ ত শ্রীকৃষ্ণকে পরমাত্মা বলিয়া জানেন না, ব্রজরাজনন্দন বলিয়াই জানেন্। তাহা হইলে তাঁহাদের জারত্ব দোষ কী করিয়া নিরসন করেন? উত্তরে উদ্ধব বলিতেছেন,

নন্বীশ্বরোঽনুভজতোঽবিদুষোপি সাক্ষা-
চ্ছ্রেয়স্তনোত্যগদরাজ ইবোপযুক্তঃ॥

ভাঃ ১০।৫৭।৫৯

প্রকৃত অগদরাজ (ঔষধের রাজা—অমৃত) না জানিয়া পান করিলেও সর্বব্যাধিদোষ দূর করিয়া দিব্যদেহ প্রাপ্ত করায়। সুতরাং পুরুষোত্তমকে পুরুষোত্তমবোধে না জানিয়া যদি কেহ ভজনা করে, তাহা হইলেও ধর্মবিরুদ্ধতা বা রসবিরুদ্ধতা সব দোষই দূর হইয়া যাইবে এবং সর্বপ্রকার মঙ্গলের উদয় হইবে। ইহাতে বিন্দুমাত্র সংশয়ের অবকাশ নাই। ফল কথা শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্যের পরমোৎকর্ষ একমাত্র ব্রজাঙ্গনাগণই অনুভব করিয়াছেন এবং উহার আস্বাদনে ইঁহারাই পরমতম অভিনিবেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

এই পরম সৌভাগ্য বিশ্বে কেহই পায় নাই। অধিক কি, নারায়ণবক্ষোবিলাসিনী শ্রীলক্ষ্মীদেবীও নহেন। তিনি বৈকুণ্ঠেশ্বরী নারায়ণের প্রিয়তমা। কিন্তু শ্রীনন্দনন্দনের যে অনন্যসাধারণ মাধুর্য্য, তাহার অনুভবে তিনিও সমর্থ হন নাই।

শ্রীলক্ষ্মীদেবী স্বর্ণকমলের মত কান্তি-বিশিষ্টা। শ্রেষ্ঠ ধাম-সকলের শিরোমণি শ্রীবৈকুণ্ঠধামের তিনি সম্রাজ্ঞী। ভূ, লীলা, প্রভৃতি শক্তিবর্গের মধ্যে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠা। কিন্তু ব্রজাঙ্গনার

মত কৃষ্ণমাধুর্য্য আস্বাদনে তাঁহারও অধিকার হয় নাই। শ্রীলক্ষ্মী-দেবীরই যখন হয় নাই তখন স্বর্গের অন্য কোন দেবীর হয়ই নাই। শ্রীউদ্ধব তাই বলিয়াছেন—

নায়ং শ্রিয়োহঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ
স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোহন্যাঃ।

ভাঃ ১০।৪৭।৬০

শ্রীনারায়ণ ও শ্রীকৃষ্ণে স্বরূপতঃ অভিন্নতা, কিন্তু রসতঃ বিশেষ ভিন্নতা। মাখন ও ছানা দুই-ই দুগ্ধের সার, স্বরূপতঃ একই। কিন্তু আস্বাদনগত তারতম্য আছেই। আকৃতিতে নারায়ণ চতুর্ভুজ, শ্রীকৃষ্ণ দ্বিভুজ। শ্রীনারায়ণে নিয়ত ঈশ্বরাবেশ, শ্রীকৃষ্ণে নিয়ত গোপাবেশ। "কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্ব্বোত্তম নরলীলা।" মনুষ্যাবেশে লীলা শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বোত্তম লীলা। নারায়ণের ঈশ্বরভাব হইতে শ্রীকৃষ্ণের মনুষ্যভাবের মাধুর্য্য অধিকতর। রসের বিষয়েতে রসগত পার্থক্য থাকায়, রসের আশ্রয়েতেও ঐ জাতীয় পার্থক্য বিরাজমান। অর্থাৎ ব্রজ-দেবীগণ ও লক্ষ্মীদেবীর মধ্যে তত্ত্বগত ভেদ না থাকিলেও রসগত ভেদ দৃষ্ট হয়। এই জন্যই বলিয়াছেন—

রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠ-
লব্ধাশিষাং য উদগাদ্ ব্রজসুন্দরীণাম্।

ভাঃ ১০।৪৭।৬০

শ্রীরাসোৎসবে নিখিল মাধুর্য্য প্রকর্ষণকারী শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের ভুজদণ্ড দ্বারা আলিঙ্গিত হইয়া ব্রজাঙ্গনাগণ যে আনন্দলাভ করিয়াছিলেন, শ্রীলক্ষ্মীদেবী স্বয়ং তাহা লাভ করিতে পারেন

নাই। তিনি শ্রীনারায়ণের অঙ্কবিলাসিনী হইলেও ব্রজদেবীগণের মত প্রেমময়ী আকুল পিপাসা নাই বলিয়া তাঁহাতে গোপীদের আস্বাদনের চমৎকারিতা ও গভীরতা প্রকাশ পাইতেছে না। শ্রীলক্ষ্মীদেবীর শ্রীনারায়ণে ঈশ্বরবুদ্ধি থাকায়, প্রীতি রসটি কিঞ্চিৎ সংকোচপূর্ণ। ব্রজগোপীগণের শ্রীকৃষ্ণে ঈশ্বরবোধ না থাকায়, তাঁহাদের প্রীতি সংকোচহীন। এই হেতু উহা উজ্জ্বলতর।

শ্রীলক্ষ্মীদেবীর শ্রীনারায়ণে তদীয়তাবুদ্ধি। আমি প্রাণবল্লভ শ্রীনারায়ণের সেবিকা দাসী—এই বোধ তাঁহার অন্তর জুড়িয়া বিদ্যমান। অধীনতায় কিঞ্চিৎ দুর্বলতা থাকে। দুর্বলতায় প্রীতি চরম গাঢ়তা প্রাপ্ত হইতে বাধা পায়। লক্ষ্মীদেবীর প্রকট মূর্ত্তি শ্রীরুক্মিণীদেবী শ্রীকৃষ্ণের উপহাস বাক্যে মূর্চ্ছিতা হইয়াছিলেন। প্রীতিরসে পূর্ণ গাঢ়ত্বের অভাব হেতুই ঐ মূর্চ্ছা সম্ভব হইয়াছিল।

"কৃষ্ণ যদি রুক্মিণীকে কৈল পরিহাস।
কৃষ্ণ ছাড়িবেন জানি রুক্মিণীর হৈল ত্রাস॥"

পক্ষান্তরে শ্রীব্রজদেবীগণের শ্রীকৃষ্ণে মদীয়তাময় প্রেম—"শ্রীকৃষ্ণ আমারই" এই অনুভবে অন্তর পূর্ণ।

"সো কাহা যাওব, আপহি আওব,
পুনহি লোটায়ব চরণে।"

—এই গভীর বিশ্বাসে প্রাণ পূর্ণ। তাই তাঁহারা মানবতী হইতে পারেন। শ্রীকৃষ্ণের তাঁহারা অপেক্ষা করেন না। শ্রীকৃষ্ণই তাঁহাদের অপেক্ষা করেন। তাহাই বলিয়াছেন, রাসের দিন সকলে সকলের হাত ধরাধরি করিয়া নাচিয়াছেন, হঠাৎ প্রেমের

আবেগে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই গোপিকাগণের কণ্ঠ জড়াইয়া ধরিলেন "অস্য ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠ"। কেন ধরিলেন ? বোধ হয় তাঁহার নিজের প্রেমের বেগ অপেক্ষা গোপীগণের প্রেমের বেগ তীব্রতর বলিয়া পাছে নিজে ভাসিয়া যান এই আশঙ্কায়। নিজ অপেক্ষা গোপীগণের প্রীতির শ্রেষ্ঠত্ব—"ন পারয়েঽহং নিরবদ্য-সংযুজাং" ইত্যাদি শ্লোকে স্বীকার করিয়াছেন। "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে" গীতায় এই ঘোষণা অনুসারে ভগবান্ সর্ব্বত্রই ভক্তের অনুরূপ ভজনা করিয়া থাকেন। "এই নিয়ম ভঙ্গ হইল গোপীর ভজনে।"

অর্থাৎ ভক্তের প্রতি ভগবানের ও ভগবানের প্রতি ভক্তের অনুরাগ সমান হইবার কথা। সর্বত্রই হয়। কিন্তু ব্যতিক্রম একদিন মাত্র হইয়াছে। রাসের দিন গোপাদের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেমের প্রবলতা শ্রীকৃষ্ণের গোপীদের প্রতি প্রবলতা অপেক্ষা তীব্রতর হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণ ঋণী হইয়াছেন। ঋণের স্বীকৃতি বা রসিক মহাজনদের ভাষায় "খত" উক্ত "ন পারয়েঽহং" শ্লোকে বিদ্যমান রহিয়াছে। গোপীপ্রেমের প্রবল প্রবাহে পাছে ভাসিয়া উজানে চলিয়া যান—এই ভয়ে ভুজদণ্ড দ্বারা তাঁদের কণ্ঠদেশ গাঢ়ভাবে জড়াইয়া ধরিয়াছেন। এই অপূর্ব্ব সৌভাগ্য অনন্ত বিশ্বে আর কাহারও হয় নাই। ভক্তগণ তাই বলিয়াছেন—

"রাসলীলা জয়ত্যেষা জগদেকমনোহরা।
যস্যাং শ্রীব্রজদেবীনাং শ্রীতোঽপি মহিমা স্ফুটঃ॥"

রাসলীলার জয় হউক, যাহাতে শ্রীলক্ষ্মীদেবী হইতেও ব্রজদেবীগণের মহিমা যে অধিকতর তাহা সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইয়াছিল।

এতাদৃশ, মহামহিমান্বিত ব্রজদেবীগণের শ্রীচরণে প্রণত হইয়া ধূলিস্নাত হইতে কাহার না সাধ হয়? আমি উদ্ধব, শ্রীকৃষ্ণের সখা বলিয়া হয়তো গোপীগণ আমাকে পদধূলি দিবেন না। তাই আমি মনে মনে এক পরামর্শ করিয়াছি। শুনিয়াছি, যে সংকল্প লইয়া মানুষের দেহত্যাগ হয় পরজন্মে তাহা লাভ হয়। আমি এই সংকল্প করিতেছি এবং আমরণ এই সংকল্প অন্তরে জাগ্রত রাখিব যে, আমার এই উদ্ধব-জন্ম শেষ হইয়া গেলে পরজন্মে শ্রীবৃন্দাবনে পথিপার্শ্বে গুল্মলতা হইয়া যেন জন্মগ্রহণ করি। তাহা হইলে ব্রজগোপীগণ যখন শ্রীকৃষ্ণের বংশীর ডাক শুনিয়া দিগ্‌বিদিগ্‌শূন্য হইয়া অভিসার করিয়া উধাও হইয়া ছুটিয়া যাইবেন, তখন পথিপার্শ্বে যে আমি উদ্ধব গুল্মলতা হইয়া পড়িয়া আছি তাহা জানিতে না পারিয়া আমার উপর দিয়া শ্রীচরণ অর্পণ করিতে করিতে ছুটিয়া যাইবেন। তখন দুর্লভ চরণরজঃ পাইয়া কৃতকৃতার্থ হইতে পারিবে।

“আসামহো চরণরেণুজুষামহং স্যাং
বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাম্।”

ভাঃ ১০।৪৭।৬১

শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের একটি অপূর্ব্ব প্রার্থনার পদ স্মরণে জাগে—

“বিধি যদি গুল্মলতা করিত রে কুঞ্জবনে,
সাজিতাম ব্রজগোপীর পদরজঃ আভরণে।
নিত্য নিকুঞ্জ মাঝারে, সখীসনে অভিসারে,
এসে কিশোরী আমারে দলিতেন শ্রীচরণে।

হাতে বাঁশী কালশশী, নিকুঞ্জ কানন পশি,
সুখে রহিতেন বসি মমোপরে প্যারী সনে।
ক্রীড়াশ্রমে রাধাশ্যাম, ঘামিতেন অবিরাম,
অমনি পদের ঘাম লইতাম সযতনে।
বন্ধু বলিছে কাতরে, কবে রাধাদামোদরে,
সাজাব হৃদয় ভরে হেরিব প্রেমনয়নে।"

———

॥ একত্রিশ ॥

মহাদৈন্যের সমুদ্রে ডুবিয়া গেলেন শ্রীমান্ উদ্ধব, ব্রজসুন্দরী-গণের মহামহিমার কথা ভাবিতে ভাবিতে। একান্ত ইচ্ছা জাগিল তাঁহাদের পাদপদ্মে প্রণাম করিতে, কিন্তু সাহসী হইলেন না নিকটবর্ত্তী হইতে। কিছু দূরে থাকিয়াই বলিলেন—

"বন্দে নন্দব্রজস্ত্রীণাং পাদরেণুমভীক্ষ্ণশঃ।
যাসাং হরিকথোদ্‌গীতং পুনাতি ভুবনত্রয়ম্ ॥"

ভাঃ ১০।৪৭।৬৩

—নন্দব্রজের রমণীগণের শ্রীচরণের প্রতিটি ধূলিকণাকে প্রতিক্ষণে বন্দনা করি। দূর হইতেই বন্দনা করি। নিকটে যাইবার ভাগ্য যেদিন হইবে সেইদিনই যাইব। যেদিন বৃন্দাবনের পথের পার্শ্বে তৃণগুল্মলতা হইয়া জন্মগ্রহণ করিব, সেদিনই বুকে ধরিতে পারিব তাঁহাদের শ্রীচরণধূলি, যখন তাঁহারা

ছুটিয়া যাইবেন অভিসারে, শ্যামসুন্দরের বাঁশীর তান শুনিয়া দিগ্বিদিক্-জ্ঞানহারা হইয়া।

উদ্ধব মহারাজের অন্তরে প্রবল সাধ, বৃন্দাবনের পথের পার্শ্বে তৃণগুল্ম হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। ব্রজবধূগণ যখন কৃষ্ণবিরহে কাতরা হইয়া কৃষ্ণকথা বলিতেন, বিরহব্যথিত কণ্ঠে কৃষ্ণনাম গুণ গাহিতেন, তখন তাহা উদ্ধবের কর্ণে মধু বর্ষণ করিত। তাঁহার মনে হইত, তাঁহাদের কণ্ঠোচ্চারিত হরিগুণগানে বিশ্বভুবন পবিত্র হইতেছে (পুনাতি ভুবনত্রয়ম্)। কেবল তাহাই নহে, উদ্ধবের মনে হইত, হরিবিরহে কাতরা গোপীকাগণের মহাভাব-সম্পদের কথাও যাঁহারা কীর্ত্তন করেন, তাঁহারাও ত্রিভুবন পবিত্র করেন। গোপীরা ধন্যাতিধন্য, তাঁহাদের কথা যাঁহারা বলেন, তাঁহাদের পদধূলি যাঁহারা গায়ে মাখেন তাঁহাদের জীবনও কৃতকৃতার্থ।

শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তগণের মধ্যে উদ্ধব শিরোমণি, এ কথা একাদশ স্কন্ধে শ্রীভগবান্ নিজেই বলিয়াছেন—"তং তু ভাগবতেষ্বহম্"—হে উদ্ধব নিখিল বিশ্বের সমস্ত ভাগবতগণের মধ্যে "তুমিই আমি", এই শ্রীমুখবাক্য প্রমাণে উদ্ধবের সর্বশ্রেষ্ঠত্ব সুষ্ঠুভাবেই স্থাপিত হইয়াছে। এতাদৃশ উদ্ধবের ব্রজগোপীগণের পদরেণু পাইবার স্পৃহা বিশেষভাবেই চমৎকৃতিকর। দ্বারকার পট্টমহিষীগণের আশেপাশেই উদ্ধব অনেক বৎসর বাস করিয়াছেন কিন্তু তাঁহাদের সম্বন্ধে উদ্ধবের এতাদৃশ দৈন্য কুত্রাপি দৃষ্ট হয় নাই। উদ্ধব যে ভক্তশ্রেষ্ঠ, কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ, তাহার যত কারণ এইটিই—তিনি ব্রজের তৃণলতা হইয়া গোপীর পদরেণু অঙ্গে লইবার কামনা

করিয়াছেন। এই সর্ব্বোৎকৃষ্ট লালসার জন্য জগতের ভক্তসমাজ উদ্ধবকে প্রণাম করিয়া বলিয়াছেন—

"তং শ্রীমদুদ্ধবং বন্দে কৃষ্ণপ্রেষ্ঠবরোঽপি যঃ।
গোপীপদাব্জধূলিস্পৃক্ তৃণজন্মাঽপ্যযাচত॥"

—কৃষ্ণপ্রিয়গণের মধ্যে সর্ববরেণ্য শ্রীমৎ উদ্ধবকে প্রণাম করি। কেন না তিনি গোপীপাদপদ্মধূলি কামনা করিয়া ব্রজের তৃণগুল্ম হইবার বাঞ্ছা করিয়াছেন।

দশ মাস ব্রজে বাস করিয়াছেন, তৎপরে মথুরায় যাইবার সময় উপস্থিত হইল। জনে জনের নিকটে যাইয়া অনুমতি প্রার্থনা করিলেন সর্বাগ্রে গোপীকাগণের, তৎপরে যশোদার, তৎপরে নন্দরাজার অনুমতি লইলেন, পরে, অন্যান্য গোপগণকে সম্ভাষণ করিলেন। উদ্ধবের বিদায় লইবার ক্রমটি দেখিলেও মনে হয় তিনি ব্রজজনের মধ্যে কৃষ্ণপ্রেমের উৎকর্ষের তারতম্যের ক্রমানুসারেই পর পর বিদায় যাচ্ঞা করিয়াছিলেন।

"অথ গোপীরনুজ্ঞাপ্য যশোদাং নন্দমেব চ।
গোপানামন্ত্র্য দাশার্হো যাস্যন্নারুরুহে রথম্॥"

ব্রজাঙ্গনাগণের মধ্যে শ্রীরাধিকার প্রেমই গরীয়ান্। সর্বাগ্রে উদ্ধব শ্রীরাধিকার নিকট বিদয়ানুমতি প্রার্থনা করিতেছেন। শ্রীউদ্ধব বলিতেছেন—হে কৃষ্ণপ্রেয়সী শ্রীরাধিকা। আপনার শ্রীচরণ-সমীপে বাস করা আমি সর্বশ্রেষ্ঠ লাভ মনে করি, কিন্তু আপনার প্রিয়তম আপনাদের সংবাদ জানিবার জন্য উৎকণ্ঠিত-চিত্তে কালাতিপাত করিতেছেন। তাঁহার উদ্বেগ নিবারণ ও চিত্তবিনোদনের জন্য আমার মথুরায় যাওয়া উচিত

অতি সত্বর, আপনার নিকট বিদায় অনুমতি প্রার্থনা করিতেছি। আর শ্রীকৃষ্ণচরণ-সমীপে যদি কিছু বলিবার থাকে, এই দাসের প্রতি আদেশ করুন।

উদ্ধবের বাক্যে ছিল দৈন্য-বিনয় ভরা, কণ্ঠের স্বর ছিল বিদায়-বেদনামাখা। অতি কাতর কণ্ঠে শ্রীরাধা কহিলেন—উদ্ধব, একটি মাত্র কথা বলিবার আছে। তুমি আমাদের কাছে কৃষ্ণকথা বর্ণনাকালে পুনঃ পুনঃ কহিয়াছ তিনি আমাদের বিরহে কাতর। ঐ কথায় আমাদের কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা হইবে ইহা মনে করিয়াই হয়তো বলিয়াছ, কারণ প্রাকৃত জগতে যে যার বিচ্ছেদে কাতর, সেও তার বিরহে বেদনাহত এই সংবাদ তার কথঞ্চিৎ সুখের কারণ হয়। যাঁহার অভাবে আমি কাঁদিতেছি তিনিও আমার অভাবে অশ্রুবর্ষণ করিতেছেন এই সংবাদ বিরহিণীর কথঞ্চিৎ সুখের কারণ হয়। কিন্তু উদ্ধব, ব্রজজনের কৃষ্ণানুরাগের সংবাদ তুমি কিছুই জান না, কৃষ্ণের কাতরতার সংবাদে আমাদের সুখ হওয়া অসম্ভব, দুঃখের জ্বালাই শতগুণে বর্দ্ধিত হয়। কৃষ্ণ সুখে আছেন জানিলে আমরা অধিকতর সুখী হইতাম। ব্রজ-প্রেমের স্বরূপতত্ত্বে সম্পূর্ণ অজ্ঞ বলিয়াই তুমি পুনঃ পুনঃ আমাদিগকে ঐ কথা শুনাইয়াছ। এখন যাইবার সময় তোমাকে যাহা বলিয়া দেই তাহা মনে রাখিও—

শ্রীকৃষ্ণ আমাদের বিরহে কাতর এই কথা আমাদের কাছে বলিয়াছ তুমি যেরূপভাবে, সেরূপভাবে আমরাও তাঁহার বিরহে কাতর এ কথা কখনও তাঁহাকে বলিও না, কেন না আমাদের হৃদয় বজ্রতুল্য কঠিন, শ্রীকৃষ্ণ কাতর শুনিয়াও বিদীর্ণ হইয়া

যায় নাই। যদি বজ্রকঠিন হৃদয় না হইত তাহা হইলে ঐ সংবাদে ফাটিয়া খণ্ড খণ্ড হইত। শ্রীকৃষ্ণের হৃদয় আমাদের মত বজ্রময় নয় সতত নবনীতের মত কোমল, আমাদের দুর্দ্দশার কথা শুনিলে তিনি কিছুতেই পারিবেন না ধৈর্য্যধারণ করিতে। তাঁহার পক্ষে প্রাণ রাখা দায় হইতে পারে।

"যথা মাং সহসাবাদীস্তথা ত্বং মা তমুদ্ধব!
অহং বজ্রময়ী শশ্বন্নবনীতময়ঃ স তু॥
কিন্তু স্নেহত্যাগশিক্ষাং তং বদ প্রান্তকক্ষয়া।
ক্রমেণ হি বহিঃ কার্য্যা জীর্ণবস্ত্রার্দ্রতা বুধ!"॥

উত্তর-চম্পু ১২।৮২

যদি বল আমাদের কথা তাঁহাকে কি শুনাইবে তবে শোন—আমাদের দুর্দ্দশার কথা একেবারে শুনাইবে না, ধীরে, অতি ধীরে বলিবে—দুই দশ দিন অন্তর অন্তর এক একটা কথা শুনাইবে। আর তার ফাঁকে ফাঁকে প্রত্যেক দিন এমন সব বিষয় শুনাইবে যাহাতে আমাদের প্রতি তাঁহার স্নেহ ত্যাগ হইয়া যায়। জীর্ণ বস্ত্র হইতে নিঙড়াইয়া জল বাহির করিতে হইলে তাহা ধীরে ধীরে করিতে হয়। একেবারে সবটা করিতে গেলে বস্ত্র ছিঁড়িয়া যায়। এই কথা বলিবার কালে এক অনির্বচনীয় শোকময়ভাবে শ্রীরাধা অধীরা হইয়া পড়িলেন। কম্পিত হস্তে একখানি মুদ্রিত পত্র উদ্ধবের হস্তে অর্পণ করিলেন শ্রীরাধা। ঐ পত্র-খানিতে লেখা ছিল—

"ব্রজশশধরতা ব্রজগাস্ত্যাজ্যা
ন কলঙ্কশঙ্কয়া ভবতা।

ন শশী কলঙ্কতনুমপ্যুজ্ঝতি
শশকং স্বমাশ্রিতং জাতু ॥

উত্তর-চম্পু ১২।৮৪

—হে ব্রজচন্দ্র, তুমি বৃন্দাবন অন্ধকার করিয়া বর্ত্তমানে মথুরার আকাশে উদিত হইয়াছ, তথাপি কলঙ্ক আশঙ্কায় ব্রজাঙ্গনাগণকে পরিত্যাগ করিও না। শশধর তাহার অঙ্কাশ্রিত, কলঙ্কমূর্ত্তি শশককে কখনও পরিত্যাগ করে না, বুকে লইয়াই গগনপথে বিচরণ করে। তাহাতে কেহ তাহার উপর দোষারোপ করে না। আমরাও তোমার অঙ্কাশ্রিত, বক্ষে রাখিলে কলঙ্ক হইবে না।

তখন শ্রীউদ্ধব মহাশয় পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনার প্রাণবল্লভকে একবার ব্রজে আসিবার জন্য অনুরোধ করিব কি? উত্তরে শ্রীরাধা অতি গম্ভীর কণ্ঠে কহিলেন—'না'। যতদিন পর্য্যন্ত তিনি নিশ্চিত হইয়া না আসিতে পারেন ততদিন পর্য্যন্ত না আসিলেই ভাল। আমরা শুধু তাঁহাকে পাইলেই সুখী হই না, তাঁহার মুখে হাসি দেখলেই সুখী হই। অনুরোধময় মিলন সুখদ নহে।

অতঃপর সকলের কাছে বিদায় লইয়া উদ্ধব রথ সাজাইলেন। রথে উঠিবার জন্য ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া ব্রজের বহির্দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সকল ব্রজজন রথ পর্য্যন্ত তাঁহার অনুগমন করিলেন। শ্রীব্রজরাজ নন্দ, ব্রজেশ্বরী যশোদা ও অন্যান্য ব্রজবাসিগণ প্রত্যেকেই প্রগাঢ় অনুরাগের সহিত নানাপ্রকার উপায়ন শ্রীকৃষ্ণের জন্য অর্পণ করিলেন উদ্ধবের হাতে। ঐ

সকল উপহারের মধ্যে ছিল নবনীত ও ছানার তৈয়ারী নানা-প্রকার দ্রব্যাদি জননীগণ প্রধানতঃ খাদ্যদ্রব্যই দিলেন। সখাগণ দিলেন বনফুল, ময়ূরপুচ্ছ, নানাবিধ ফলমূল, ব্রজদেবীগণ দিলেন গুঞ্জাহার ও নানা সূচিশিল্পযুক্ত বস্ত্রখণ্ডাদি। এ সকল উপহারের প্রত্যেক দ্রব্যের উপরে এমন কোন চিহ্নাঙ্কিত ছিল যাহা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ বুঝিতে পারিবেন কে কোন্‌টি দিয়াছেন। নন্দরাজ, বসুদেব, দেবকী ও উগ্রসেন প্রভৃতির জন্য দুগ্ধ ও ঘৃতাদি দিলেন। কেহ কেহ নানাবিধ বস্ত্রালঙ্কার উদ্ধবকেও দান করিলেন।

নন্দবাবাকে প্রবোধ দেওয়াকালে উদ্ধব অনেকবার তাঁহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কৃষ্ণ কাহারও পুত্র নয়, স্বয়ং ভগবান্—"ন মাতা ন পিতা তস্য ন ভর্ত্তা ন সুতাদয়ঃ।" নন্দরাজ সে কথা কিছুতেই বোধগম্য করিতে পারেন নাই। বিদায়কালে কি যেন কি মনে করিয়া উদ্ধবকে কহিলেন—

"মনসো বৃত্তয়ো নঃ স্যুঃ কৃষ্ণপাদাম্বুজাশ্রয়াঃ।
বাচোঽভিধায়িনীর্নাম্নাং কায়স্তৎপ্রহ্বণাদিষু॥
কর্ম্মভির্ভ্রাম্যমাণানাং যত্র ক্বাপীশ্বরেচ্ছয়া।
মঙ্গলাচরিতৈর্দানৈ রতির্নঃ কৃষ্ণ ঈশ্বরে॥"

ভাঃ ১০।৪৭।৬৬-৬৭

বিয়োগময় পিতৃবাৎসল্যে তীব্র বিষাদে ব্রজরাজ বলিলেন—হে উদ্ধব, তোমার মতে শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বর; আচ্ছা তাহাই হউক। সেই কৃষ্ণাকার পরমেশ্বরের উপর আমার মনের সকল প্রকার বৃত্তি যেন লাগিয়া থাকে। সে আমার পুত্রই হউক আর ঈশ্বরই

হউক, যেন তাঁর প্রতি মন উদাসীন না হয়। আর বাক্য যেন তাঁহার নাম কীর্ত্তন করে, দেহ যেন তৎ সেবায় রত থাকে। আর নিজ কর্ম্মফলে যে কোন স্থানেই জন্মাই না কেন, এমন শুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠান যেন তিনি করান যার ফলে রতিমতি তাঁর পাদপদ্মেই স্থির থাকে।

এ কথা বলিবার কালে নন্দরাজ বস্ত্র দ্বারা মুখ আচ্ছাদন করিয়া (বস্ত্রেণ মুখমাস্তীর্য্য) নয়ন হইতে তীব্রভাবে প্রবাহিত অশ্রুধারা (অশ্রুলোচনাঃ) সম্বরণ করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। নন্দরাজের এই প্রবল কাতরতা হইতেই বুঝা যায় যে, তাঁহার ঐ উক্তি শ্রীকৃষ্ণে ঐশ্বর্য্যবুদ্ধিবশতঃ নয়। পুত্রবাৎসল্যে নিমজ্জিত অবস্থায় অত্যন্ত দুঃখে কাতর হইয়া "জানি না কি দোষে প্রাপ্ত কৃষ্ণ হারাইলাম" এই নিদারুণ ব্যথা হইতে ঐরূপ উক্তি হইয়াছে। শ্রীশুকদেবও বলিয়াছেন,—"নন্দাদয়োঽনুরাগেণ প্রাবোচন্" নন্দরাজ অনুরাগভরেই কহিয়াছিলেন, ঈশ্বরবুদ্ধিতে কহেন নাই। অনুরাগেই যদি বলিয়াছেন তাহা হইলে দাস্যভাবে ঈশ্বরবাচক শব্দ প্রয়োগ করিলেন কেন? তাহার কারণ এই—

"কৃষ্ণপ্রেমার এক অদ্ভুত স্বভাব।
গুরু, সম, লঘুকে করায় দাস্যভাব॥
আনের কা কথা ব্রজে নন্দ মহাশয়।
সেই কৃষ্ণপদে রতি মতি যে মাগয়॥"

—চরিতামৃত

কৃষ্ণপ্রেমের এক অপূর্ব্ব বৈচিত্র্য এই যে পরম গুরুজনের চিত্তেও সময় সময় লঘুজনোচিত দাস্যভাবে উদয় করায়। ইহা

সকল সময় হয় না, প্রবল বিরহ অবস্থায় নিজপ্রতি কৃষ্ণের ঔদাসীন্য বুঝিতে পারিলে তখন এক বলিষ্ঠ দৈন্য দেখা দেয় এবং ক্ষণিকের জন্য গুরুজনকেও দাস্যভাব গ্রহণ করায়। "বিরহবৈবশ্যেন বিষয়ালম্বনস্য স্বস্মিন্নৌদাসীন্যজ্ঞানেন চ জনিতে মহাদৈন্যে-স্বস্বভাববিচ্যুতির্দাস্যভাবগ্রহণঞ্চ।" (শ্রীবিশ্বনাথ)।

উদ্ধবের অনুগমন করিয়াছিলেন নন্দরাজ এইভাবে গোষ্ঠীবর্গ সহিত। রথের ঘোড়াও ধীর পদক্ষেপে চলিতেছিল যাহাতে হাঁটিয়া চলিতে পারেন সঙ্গে সঙ্গীগণ। অনেক দূর গিয়া উদ্ধব রথ হইতে অবতরণ করিলেন এবং প্রত্যেককে প্রগাঢ় আলিঙ্গন ও যথোচিত অভিনন্দন করিয়া নিবৃত্ত হইতে অনুরোধ করিলেন। গমনে নিবৃত্ত হইয়া সকলে দণ্ডায়মান হইলেন এবং যতক্ষণ রথের ধূলি দৃষ্টিপথে রহিল ততক্ষণ পর্য্যন্ত সকলে চিত্রপুত্তলিকার মত বিরাজমান রহিলেন।

উদ্ধব চলিয়াছেন মথুরার পথে। বৃন্দাবনে তৃণলতা হইয়া থাকিবার কামনা করিয়া আবার ব্রজ ছাড়িয়া মথুরা অভিমুখে চলিতেছেন কেন? এই প্রশ্ন যে-কোন ব্যক্তির মনে জাগিতে পারে। শ্রীশুকদেব তার উত্তর দিয়াছেন—তিনি মথুরার বিশেষণ দিয়াছেন "কৃষ্ণপালিতাম্।" মথুরা এখন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক প্রতিপালিত। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ এখন মথুরাতেই বিরাজমান। এমতাবস্থায় উদ্ধবের মত প্রিয়জনের পক্ষে শ্রীমথুরাতে যাওয়াই একান্তভাবে কর্ত্তব্য। মাধুর্য্যগৌরবে ব্রজধাম সর্ব্বশিরোমণি হইলেও প্রকটলীলায় যেখানে প্রভু সাক্ষাৎভাবে বিরাজমান, ভৃত্যের কর্ত্তব্য সেইখানেই তাঁহার পদপার্শ্বে অবস্থান। শ্রীবিশ্বনাথ

চক্রবর্ত্তিপাদ "কৃষ্ণপালিতাম্" পদে অন্য একটি আশয় অনুসন্ধান করিয়াছেন। উদ্ধব চলিতে চলিতে যেন ইহাই মনে ভাবিতেছেন—গিয়া প্রিয়সখা শ্রীকৃষ্ণকে বলিব যে, তিনি এত যত্ন করিয়া মথুরাবাসীদের পালন করিতেছেন, আর ব্রজবাসীদের প্রতি ঔদাসীন্য দেখাইতেছেন কেন? মথুরার ভক্ত হইতে ব্রজের ভক্তের কৃষ্ণপ্রীতি সহস্র গুণে গভীর ইহা কি তিনি জানেন না? মথুরার জন প্রতিপালিত হইবে আর ব্রজের জন কাঁদিয়া মরিবে এই অবিচার আমি আর তাঁহাকে করিতে দিব না। ব্রজ-প্রেমে ভাবিত-মনপ্রাণ উদ্ধব চলিয়াছেন মথুরার পথে।

—):—:(—

॥ বত্রিশ ॥

শ্রীমান্ উদ্ধবকে ব্রজে পাঠাইবার পর হইতে পরম উৎকণ্ঠায় কালযাপন করিতেছেন শ্রীকৃষ্ণ। দিন গণিতে গণিতে পক্ষ, পক্ষ গণিতে গণিতে মাস, মাস গণিতে গণিতে দশ মাস অতিবাহিত হইয়াছে—"ধৃততৃষ্ণতয়া বাসরপক্ষমাসান্ ক্রমগণনয়া গণয়ন্" আজ ধৈর্য্য-সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছে। তাই অত্যুন্নত অট্টালিকার উপরে চিলাকোঠার ছাদে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন, যতদূর দৃষ্টি যায় ব্রজের পথ দর্শন করিবেন—এই লালসায়। "ব্রজবিলোক-নয়া মনোরথপালিকামত্যুন্নত-চন্দ্রশালিকাং বিন্দমানঃ।"

অকস্মাৎ দেখিলেন উদ্ধব আসিতেছেন। তাঁহাকে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের মনে হইল যেন প্রিয় গোকুলনগরী উদ্ধবরূপে মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আসিতেছে "গোকুলং সাক্ষাদয়মিতি।" অট্টালিকা হইতে অবতরণ করিয়া দ্রুতগতিতে বহুদূর অগ্রসর হইলেন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। উদ্ধবের নিকট পৌঁছিয়া তিনি তাঁহাকে গভীর ভাবে আলিঙ্গন করিলেন। তাহাতেই যেন গোকুল দর্শন ও স্পর্শনের সুখ অনুভব করিলেন। একবার আলিঙ্গন করিয়া সাধ মিটিল না, তাই "মুহুরালিঙ্গনাদিভিরাবৃত্য" শত শত প্রগাঢ় আলিঙ্গনের দ্বারা তাঁহার শরীরকে যেন আচ্ছাদন করিয়া ফেলিলেন। তারপর তাঁহার হাত ধরিয়া লইয়া গেলেন এক নিভৃত গৃহে "নিভৃতস্থানমানিনায়।"

উদ্ধবের কাছে ব্রজের বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করা চলে না বহুজনের সমক্ষে। উদ্ধবের পৌঁছানমাত্র মথুরার বিশিষ্টজন সকলেই

আসিয়াছেন তাঁহাকে দর্শন করিতে। তাঁহাদের সঙ্গে কোন আলাপ করিবার সুযোগ না দিয়াই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে টানিয়া লইয়া গেলেন নিজ কক্ষে। সকলেই বুঝিলেন গোপনে রহস্যালাপ হইবে।

শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবের বদনের ঘর্ম অপনোদন করিলেন নিজ পীত-বসনের অঞ্চল দ্বারা, ব্যজন করিলেন নিজ হস্তে ব্যজনী লইয়া। পথশ্রম কাটিল। কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বে ভগবান্ তাকাইয়া রহিলেন উদ্ধবের মুখের দিকে, দেখিলেন মুখের দিকে, দেখিলেন মুখের প্রসন্নতা। প্রসন্নতা দর্শনেই "মুখপ্রসাদং দৃষ্ট্বা" চিত্তের উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগ অনেকখানি কাটিয়া গেল। তারপর জিজ্ঞাসা করিলেন কুশলবার্ত্তা।

প্রথম জিজ্ঞাসা করিলেন সামান্যভাবে সকলের কুশল, তারপর পিতা নন্দ প্রভৃতির, শ্রীদামাদি বন্ধুগণের, রক্তকপত্রকাদি অনুগতজনের এবং ধেনুসমূহের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু যশোদাজননীর বিষয় প্রশ্ন করিতে সমর্থ হইলেন না "প্রসূপ্রশ্নে-নাসীৎ পটুঃ।" ইহা না পারিবার কারণ নেত্রসম্ভূত জলরাশি "দৃগম্ভঃ সমুদয়ঃ।" নয়নে জলধারা আছে। তাহাতে কথা বলিতে বাধা কি? বাধা আছে। ঐ জলরাশি "কণ্ঠ বিবরং মুহুঃ কুণ্ঠং কুর্বন্নুদয়তি" গোবিন্দের কণ্ঠবিবরকে পুনঃ পুনঃ কণ্ঠীত করিয়া উদ্‌গত হইতে লাগিল। উদ্ধব ও গোবিন্দ উভয়ে উভয়ের বদনপানে চাহিয়া রহিলেন নীরবে। উভয়ের ব্রজপ্রেমে বিভোর। একের অন্তরে দীর্ঘ বিরহদুঃখ। তাহাই ভাষা পরাহত। যত কথা দৃষ্টিবিনিময়ের মধ্যে পর্য্যাপ্ত।

উচ্ছ্বাস কথঞ্চিৎ উপশম প্রাপ্ত হইলে উদ্ধব কহিলেন—

"অর্দ্ধং ভবৎপ্রভাবেণ ময়া তত্র সমাহিতম্।
ভবৎপ্রয়াণপর্য্যন্তমর্দ্ধং পর্য্যবসীয়তে॥"

চম্পূঃ ১২৯৫

ব্রজে গিয়া আমি তথাকার বিরহক্লিষ্ট প্রিয়গণের বেদনার অর্দ্ধ পরিমাণ সমাধান করিয়াছি, তথায় এখন তোমার গমন পর্য্যন্ত অর্দ্ধ সমাহিত হইবে অর্থাৎ তুমি ব্রজে গেলে যেইরূপ হইত আমি তাহার অর্দ্ধেক সমাপন করিয়াছি। এখন তদ্বিষয়ে যাহা আশু কর্ত্তব্য তাহা তুমি স্থির করিবে। এই কথা বলিতে বলিতে উদ্ধব ব্রজ হইতে আনীত উপায়নসমূহ—নবনীত, লড্ডুক, অলংকার, বনফুল, মুক্তাহার, গুঞ্জামালা প্রভৃতি পরপর শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে স্থাপন করিতে লাগিলেন। কোন্‌টি কে দিয়াছেন তাহা বিশেষ বিশেষ চিহ্ন দ্বারাই বুঝিতে পারিতেছিলেন।

মাতৃ-দত্ত একটি দ্রব্য একটু দূরে রহিয়াছে, কৃষ্ণ হস্ত প্রসারণ-পূর্বক সেইটি দেখাইয়া—"এইটি বুঝি মা দিয়াছেন", ইহা বলিতে সাহসী হইলেন না। কেন? নেত্রজল-ক্ষরণে অতীব ভীত হইয়া। বাষ্পাম্বুপাতাদ্ভীতস্তত্তদ্বিদূরার্পিতনয়নতয়া বস্তু তত্তদ্দ-দর্শ। নেত্রজলক্ষরণে ভীত হইয়া দূর হইতে নেত্রার্পণপূর্ব্বক মাতৃদত্ত দ্রব্যটি দর্শন করিতে লাগিলেন। কোন শব্দ শ্রীমুখে ফুটিতে পারিল না।

শ্রীকৃষ্ণের কাছে ব্রজের কাহিনী, শ্রীমান উদ্ধব একদিনে সব বলেন নাই, বহুদিবসে বলিয়াছিলেন। (অহোভির্ব্বহুভিরেব ব্যাহরিষ্যতে)। একদিন বলিলেন—"ব্রজজনের যে প্রেম ও

প্রেমচেষ্টা দর্শন করিলাম তাহা আর কোথাও কোম ভক্তের আছে বলিয়া জানি না বা কাহারও মুখে শুনি না।" এই কথা শ্রবণমাত্র শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখমণ্ডল অনুরাগে রাঙ্গা হইয়া উঠিল। অবস্থা দেখিয়া উদ্ধব নীরব হইলেন।

অপর একদিন সভার মধ্যে কোনও এক কথার প্রসঙ্গে উদ্ধব হঠাৎ বলিলেন—গোকুলের নন্দবাবার যে অনুরাগময় ভাবের আবর্ত্ত তাহা বুঝিতে তুমি ছাড়া আর কে সমর্থ আছে। আসিবার সময় তিনি বলিলেন, "তোমাদের ঈশ্বর কৃষ্ণে আমার মন, বাক্য ও দেহের যাবতীয় বৃত্তি যেন অক্ষুণ্ণ থাকে।" তোমার মা যশোমতী বাৎসল্যস্নেহে গদ্‌গদকণ্ঠ হইয়া চিত্রের মত রথের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া অঝোরে ঝুরিতে লাগিলেন—আর কিছুই বলিতে পারিলেন না। এই কথা শুনিবামাত্র শ্রীকৃষ্ণ ধৈর্য্যহীন হইয়া সভার মাঝেই উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিলেন।

অপর একদিন নির্জ্জন স্থানে পাইয়া উদ্ধব ব্রজসুন্দরীগণের দিব্যোন্মাদ ও চিত্রজল্পের কথার কিঞ্চিৎ আভাসমাত্র প্রকাশ করিলেন।

"ভ্রমতি ভবনগর্ভে নির্নিমিত্তং হসন্তী
প্রথয়তি তব বার্ত্তাং চেতনাচেতনেষু!
লুঠতি চ ভুবি রাধা কম্পিতাঙ্গী মুরারে
বিষমবিরহখেদোদ্‌গারিবিভ্রান্তচিন্তা॥"

(উজ্জ্বলনীলমণিঃ)

শোন মুরারি! তোমার শ্রীরাধার অবস্থা—তোমার বিষম বিরহ হইতে এমন অবস্থা উদয় হইয়াছে যে রাধা ঘূর্ণিতচিত্ত হইয়া

পড়িয়াছেন। কখনও গৃহের মধ্যে ভ্রমণ করিতেছেন, কখনও অন্ধকারের মধ্যে হাস্য করিতেছেন, কখনও চেতন অচেতন বস্তুমাত্রকেই তোমার বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতেছেন। আবার কখনও ভীষণভাবে কাঁপিতে কাঁপিতে ধূলায় গড়াইতেছেন।

আবার কখনও বিনা কারণে অট্টঅট্ট হাসি হাসিতেছেন। (অট্টহাসপটলং নির্মাতি) কখনও স্বেদজলে ভিজিয়া যাইতেছেন (ঘর্মাম্বুভাক্) কখনও বা চমৎকৃতা হইয়া স্বরভেদযুক্ত ঘর্ঘর মহাধ্বনি করিয়া (ঘর্ঘরঘয়নাদ্‌ঘোষং) রোদন করিতেছেন।

ঐ কথা কর্ণগত হইবামাত্র 'হা' রাধে! হা চিত্তভ্রমরের চূতমঞ্জরী!' বলিতে বলিতে বাহ্যজ্ঞানহারা হইয়া পড়িলেন। পরে অনেকক্ষণে অর্দ্ধ বাহ্যদশা লাভ করিয়া 'হা ভানুনন্দিনী' বলিতে বলিতে বহু বিনিদ্ররজনী অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

কত অনুরাগ, কত গভীর প্রেম, কত নিবিড় বিরহ বেদনা বুকে চাপিয়া যে নন্দনন্দন মথুরায় বাস করিতেছেন ইহা কিঞ্চিৎ উপলব্ধি করিয়া শ্রীমান উদ্ধব মহারাজ বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া গেলেন। কৃষ্ণের জন্য ব্রজের আর্ত্তি, ব্রজের জন্য শ্রীকৃষ্ণের আর্ত্তি—এতদুভয়ের অনুভবে উদ্ধব এক মিলন-বিরহময় অনির্ব্বচনীয় রসের পাথারে ডুবিতে লাগিলেন। আসুন আমরাও ডুবিয়া যাই!

কি অপূর্ব্ব দৃশ্য! বিরহে কাতর অথচ কেহ কাহারও অদৃশ্য নহেন। ব্রজজন মানস-নয়নে দর্শন করিতেছেন শ্রীকৃষ্ণকে, আর শ্রীকৃষ্ণ দর্শন করিতেছেন ব্রজজনকে।

"তস্যাহং ন প্রণশ্যতি স চ মে ন প্রণশ্যতি।"

যেন গীতার এই মন্ত্রের প্রকটমূর্ত্তি। গীতার বাণী ভাগবতেই জীবন্ত। তাই শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দর লিখিয়াছেন—

"ভক্তিশাস্ত্র ভাগবত,
সার কর অবিরত রে।
অনাসক্তি শুদ্ধাভক্তি,
ভাব সুনির্ম্মল রে॥"

সমাপ্ত

চণ্ডীচিন্তা সম্বন্ধে পত্রিকা কি বলে—

যুগান্তর

চণ্ডীচিন্তা—ডক্টর মহানামব্রত ব্রহ্মচারী প্রণীত। মূল্য ৪'০০ টাকা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—মহাউদ্ধারণ মঠ। ৫৯, মানিকতলা মেইন রোড, কলিকাতা—৫৪।

চণ্ডীচিন্তা প্রকাশিত হইবার অল্প কয়েক মাস পরেই ইহার দ্বিতীয় সংস্করণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেওয়ায় ইহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না যে, সুধীপাঠকবৃন্দ কর্তৃক গ্রন্থটি আদৃত হইয়াছে। হাঁ, হইবারই কথা। চণ্ডীচিন্তা চণ্ডী সম্বন্ধে একখানা অপূর্ব্ব গ্রন্থ। মাতৃতত্ত্ব বুঝিবার পক্ষে এইরূপ আর কোন গ্রন্থ আছে কি না আমরা অবগত নহি। এইরূপ হইবার কারণ হইল, গ্রন্থকার শুধু পণ্ডিত নহেন, মহাসাধক। সাধনা ব্যতীত ঋষিগ্রন্থ—শাস্ত্রগ্রন্থের মর্মাবধারণ করা যায় না। গ্রন্থকার সেই সাধনার আলোতেই চণ্ডীগ্রন্থের মহামায়া তত্ত্বের অন্তর্নিহিত সত্য উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন—তাই চণ্ডীচিন্তা এত মনোরম ও প্রাণবান হইয়াছেন।

বাঙ্গালী মাতৃভক্ত, মাতৃসাধনার পীঠস্থান বাংলা—বাংলার আদরের দুলাল—মায়ের পূজায় সিদ্ধ-মনোরথ রামপ্রসাদ, সর্ব্বানন্দ, কমলাকান্ত, বামাক্ষেপা, ঠাকুর পরমহংসদেব। মাতৃপূজা বাঙ্গালীর জাতীয় উৎসব। মায়ের নাম শ্রবণে সন্তানমাত্রেরই হৃদয়ে আনন্দের বান ডাকে। সেই জজ্জননী মাকে, তাঁহার স্বরূপ কি, কিভাবে ও কি উপচারে পূজিলে সংসারকূপে নিপতিত

সন্তান মাকে লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারে তাহারই উপায় গ্রন্থে সুস্পষ্টরূপে নির্দ্দেশিত হইয়াছে। মাকে, জানিতে, বুঝিতে হইলে, পাইতে হইলে এই গ্রন্থ যে পরম সহায়ক হইবে এমন কথা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। গ্রন্থ মহাসাধকের লেখা তাই ইহার ভাষা মন্ত্রের ন্যায় শক্তি-সম্পুটিত, গ্রন্থপাঠে এই কথা মর্মে মর্মে উপলব্ধি হইয়া থাকে। মাতৃ-সাধকের পক্ষে এই গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য্য। গ্রন্থে ব্যাখ্যাত মাতৃতত্ত্ব শুধু ব্যক্তি-জীবনেই নহে সমষ্টি-জীবনেও পরম কল্যাণ সাধন করিবে। তাই আমরা বলিতে চাই জাতির এই চরম দুর্দ্দিনে, জাতীয় জীবনের কল্যাণকামী ব্যক্তিমাপই— এই গ্রন্থ-পাঠে উৎসাহ দান করিবেন।

আনন্দবাজার—

চণ্ডীচিন্তা—মহানামব্রত ব্রহ্মচারী। মহানাম সম্প্রদায়, মহাউদ্ধারণ মঠ, ৫৯, মানিকতলা মেইন রোড, কলিকাতা—৬, হইতে প্রকাশিত।

চণ্ডী ধর্মপ্রাণ হিন্দুমাত্রেরই নিকটে মহা মূল্যবান গ্রন্থ। শক্তি-স্বরূপিণী মহামায়ার আবাহন ও উদ্বোধন স্তোত্র গীত হয়েছে এই মার্কণ্ডেয় পুরাণের অংশীভূত চণ্ডীর মধ্যে। দেবীমাহাত্ম্য ও দুর্গা-সপ্তশতী নামেও ইহা অভিহিত হয়ে থাকে।

আলোচ্য এই মহান্ গ্রন্থে তত্ত্বজ্ঞ সাধক মহানামব্রত ব্রহ্মচারী ভোগমোক্ষের ফলদাতা মহাশক্তির যে বিভব অন্তর্হিত

আছে, তার তত্ত্ব বিশ্লেষণ করেছেন অত্যন্ত নৈপুণ্য সহকারে গ্রন্থখানির মূল বিষয়গুলির উপর তাঁর যুক্তি, বিচার ও অনুভূতি ভক্তমাত্রের নিকটেই একটি মহামূল্য সম্পদ হিসাবে সমাদৃত হবে, কেবলমাত্র সমাদৃতই হবে না, চণ্ডীর ইতিহাস, মাহাত্ম্য ও নিগূঢ় তত্ত্বসমূহ অবগত হয়ে পাঠক কৃতার্থ বোধ করবেন।

এই চণ্ডীচিন্তার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে ব্রহ্মচারী মহারাজ উনিশটি বিভিন্ন পরিচ্ছেদে গ্রন্থখানিকে বিভক্ত করেছেন। পরিচ্ছেদগুলির নাম যথাক্রমে—অর্জ্জুনের দুর্গাস্তব, তন্ত্র-বিজ্ঞান, শক্তিবাদ, দেবীসূক্ত, রাত্রিসূক্ত, মহামায়া কে? চণ্ডিকার ত্রিমূর্ত্তি, শ্রীশ্রীকালিকার স্বরূপ, অষ্টশক্তি, নবদুর্গা, নবপত্রিকা, দশমহাবিদ্যা, শ্রীশ্রীচণ্ডীর স্তুতিচতুষ্টয়, পূজাতত্ত্ব, অকাল-বোধন, মহাপূজার উপচার, বরদাত্রী, প্রস্থানত্রয় ও দেবীমাহাত্ম্য এবং শক্তিবাদ ও মহাপ্রভু।

এই গ্রন্থের একটি মূল্যবান জ্ঞানগর্ভ ভূমিকা রচনা করেছেন গোরক্ষপুর মহারাণা প্রতাপ ডিগ্রী কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ শ্রীঅক্ষয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। এমন সাবলীল তত্ত্বালোচনা কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। চণ্ডী পাঠের পূর্ব্বে দেবীসূক্ত পাঠের বিধির ন্যায় "চণ্ডী-চিন্তা" পাঠের পূর্ব্বে এই ভূমিকাটি পাঠেই পাঠক গ্রন্থস্থ বিষয়বস্তু সম্বন্ধে তো বটেই এমন কি বর্ত্তমান বিজ্ঞান-ভিত্তিক মন ও চৈতন্যময়ী মহাশক্তির অস্তিত্ব সম্বন্ধে জ্ঞাত হবেন, আস্থাশীল হবেন। ভক্ত ও চণ্ডীতত্ত্ব-জিজ্ঞাসু ব্যক্তিদের মধ্যে ঈদৃশ গ্রন্থের বহুল প্রচার অবশ্যম্ভাবী।

———